মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

ঢাকা থেকে বালাকোট

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাসা-৮৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
✆- ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

ঢাকা থেকে বালাকোট

করাচী
বালাকোট
পেশোয়ার
আখুড়াখটক
ইসলামাবাদ
রাওয়ালপিন্ডি
মারী
লাহোর
গুজরানওয়ালা

প্রভৃতি স্থানের কেবল সফর নয়,
সুখপাঠ্য ইতিহাসও।

প্রকাশকাল
মহররম ১৪২৯ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ
প্রিন্ট মিডিয়া

অক্ষর বিন্যাস
আর রাশাদ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, লালবাগ, ঢাকা

বিনিময়
২০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক
আর রাশাদ পাবলিকেশন্স, ১২/ডি-ই, পল্লবী, ঢাকা
আল কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dhaka Theke Balakot
(From Dhaka to Balakot) by Moulana Mohammad Salman,
Published by Al Irfan Publications, Dhaka, Price- Tk 200.

উৎসর্গ

শুহাদায়ে
বালাকোটের
উদ্দেশ্যে

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও মাসিক মদীনা সম্পাদক
হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখিত

মুখবন্ধ

ঢাকা থেকে বালাকোট একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভ্রমণ কাহিনী। ব্যতিক্রমধর্মী এজন্য যে, প্রখ্যাত আলেম ঢাকার দারুর রাশাদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান একান্তই দীনী ও ইলমী উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এই সুদীর্ঘ সফর করেছেন। দর্শনীয় স্থানে বেড়ানো এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল না।

উপমহাদেশের আলেম সমাজ, বিশেষতঃ যাঁরা ইলম ও রুহানিয়াত চর্চার সাথে কিছুটা হলেও জড়িত, তাঁদের চেতনার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের পর্বতঘেরা এক দর্শনীয় উপত্যকা পাকিস্তান থেকে চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সিল্করোডের পাশে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী কুমার তীরের ঐতিহাসিক ময়দান বালাকোট এবং ঐ 'শহীদী ঈদগাহ'তে যাঁরা চিরনিন্দ্রায় শায়িত আছেন তাঁদের পূণ্যস্মৃতির প্রতি এক দূর্বার আকর্ষণ অনুভব করেন। সেই অজানা আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে মাওলানা সালমানও ছুটে গিয়েছিলেন যুগের মুজাদ্দেদ আমিরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের স্মৃতিধন্য বালাকোটের পথে। এই মহান 'দিলীর' কলিজার খুন ঢেলে পরবর্তী যুগের সত্যপথ অনুসন্ধানকারীগণের জন্য সে পথের দিশা রচনা করে গেছেন।

হযরত সৈয়দ শহীদের এক যথার্থ উত্তরসূরী হযরত আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী র. তাঁর অমর রচনা 'যখন ঈমানের বসন্ত এলো' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ র. যখন ডাক দিলেন, তখন আফগান সীমান্ত থেকে শুরু করে পূর্বে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত ঈমানদীপ্ত নর-নারীর মধ্যে বসন্তের আমেজ সৃষ্টি হয়েছিল।

অতঃপর বালাকোটের ময়দানে (৬ মে ১৮৩১) শহীদ হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম উইলসন হান্টার লিখেছেন, জীবন্ত সৈয়দ আহমদ নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এক

ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু মৃত সৈয়দ আহমদ এশিয়ার বুকে ইংরেজ আধিপত্যের জন্য আরও অনেক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

বলতে কি প্রায় পৌণে দু'শ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রই বালাকোটের আকর্ষণ অনুভব করে থাকেন।

প্রিয়জনদের প্রিয় প্রসঙ্গ সবসময়ই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। বালাকোটের পথে রওয়ানা হয়ে মাওলানা সালমান পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার করাচী থেকে শুরু করে লাহোর, পিন্ডি, ইসলামাবাদ, আকুড়াখটক, মানসেরা প্রভৃতি সফর করে সৈয়দ শহীদের রূহানী আওলাদগণের বহুমুখী দীনী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর লেখা সেসব বিবরণ একাধারে যেমন সুখপাঠ্য অন্যদিকে অতৃপ্ত আত্মার প্রকৃষ্ট খোরাক নিঃসন্দেহে।

আমি এই বইয়ের লেখককে মোবারকবাদ জানাই এবং দুআ করি, আল্লাহ পাক তাঁর এই বইটিকে এ দেশের নতুন প্রজন্মের আলেমগণের জন্য প্রেরণার উৎসে পরিণত করুন।

খাকছার
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক
মাসিক মদীনা, ঢাকা

তারিখ
০৮.০১.২০০৮

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

বালাকোট। খুনে রাঙ্গা বালাকোট। জিহাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদসহ শত শত মুজাহিদের শাহাদতগাহ এ বালাকোট। এ পাহাড়ী প্রান্তরে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুভ সূচনা করেছিলেন এসব মুজাহিদ। আজো তাই বালাকোট আন্দোলন উপমহাদেশীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। ছোটবেলায় স্কুলের বইয়ে এবং হযরত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর সোহবতে রায়বেরেলী হাযির হয়ে হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের পূর্বপুরুষ ও তাঁর জিহাদী আন্দোলনের প্রথম সূতিকাগার (তাকিয়াকেলা) দেখে মনে বড় আশা জেগেছিল এ মুজাহিদদের শহীদগাহ বালাকোটে হাযিরা দেয়ার।

১৯৮৭ সাল হতে একাধিকবার পাকিস্তান সফরের সুযোগ হলেও তা লাহোর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। তখনও পর্যন্ত ইসলামাবাদ ও সীমান্ত প্রদেশের বালাকোট সফরের সুযোগ ঘটেনি।

২০০৬ সালের ৫ জুলাই লন্ডনের ইব্রাহিম কলেজের অধ্যক্ষ মাওলানা মুশফিকউদ্দীন এর মাধ্যমে পরিচয় ঘটে মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের সাথে। পরিচয়ের সুবাদে জানতে পারি তিনি ইসলামাবাদের অদূরে মারী হাইওয়েতে ইদারায়ে উলূমে ইসলামী নামে দীনী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ঢাকাতে এ ধরনের একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকি। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আপনার সকল প্রশ্নের অবসান হবে যদি ইসলামাবাদে এসে আমাদের প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

প্রায় দু'মাস লন্ডনে অবস্থানকালে তার সাথে মাঝে মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ হয় এবং হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি ইসলামাবাদে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমাকে তার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কনভেনশনে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে দাওয়াত দেন। সাথে সাথে মাওলানা মুশফিকউদ্দীন ও তার সাথী সঙ্গীরা এ সফরের কামিয়াবীর জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এটাই ছিল এ সফরের মূল অনুঘটক। সে মোতাবেক ২০০৬ সালের ১৬ নভেম্বর হতে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ সপ্তাহের এ ভ্রমণ শুরু হয়। করাচী, লাহোর, গুজরাওয়ালা, ইসলামাবাদ,

আকুড়াখটক, বালাকোটসহ পাকিস্তানের খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখার সুযোগ হয় এ সফরে।

যাত্রার শুরুতেই এ সফরনামা প্রস্তুত করে বাংলাদেশী ভাইবোনদের খেদমতে পেশ করার আশা ও আবেগ ছিল। ঢাকায় ফিরে আমাদের মাদরাসা দারুর রাশাদের মুখপত্র মাসিক আর রাশাদে 'ঢাকা থেকে বালাকোট' শিরোনামে ধারাবাহিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে থাকি। পাশাপাশি জোগাড় করতে থাকি আরো বিস্তারিত তথ্যাদি। গ্রন্থখানি নিছক কোন ভ্রমণ কাহিনী নয়। বরং এতদঞ্চলের সাথে জড়িত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মুসলিম জাগরণের মহান নেতৃবৃন্দের ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোচিত নানান বিষয় স্থান পেয়েছে এতে।

সফরে সার্বিক সহযোগিতাকারী ইবরাহীম কলেজের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুশফিক উদ্দীন আহমদ, ইসলামাবাদের মাওলানা ফয়যুর রহমান, করাচীতে বসবাসরত বাংলাদেশী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মাদ নোমান ও মাওলানা আব্দুল গফুরসহ সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের সহযোগিতায় আমার এ সফর অনেকটা সহজ হয়।

এ ছাড়া গ্রন্থের সার্বিক প্রস্তুতিতে এবং প্রকাশনায় আমাদের মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাসিক আর রাশাদের সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক মাওলানা লিয়াকত আলী, নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা জহির উদ্দিন বাবর, মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ফয়জুল্লাহ ও মাওলানা কামালুদ্দীন ফারুকী, মাওলানা আলী হাসান তৈয়বসহ সকল সহযোগীকে- যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এ গ্রন্থের প্রকাশনা ত্বরান্বিত করেছেন তাদের আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে খ্যাতনামা লেখকদের রচনাবলী হতে সাহায্য নিয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। বিশেষ করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও মাসিক মদীনা সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে এ অধমকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন। দু'আ করি আল্লাহ পাক হযরত খান সাহেবকে হায়াতে তৈয়বা দান করুন।

আশা করি গ্রন্থটি দেশ ও জাতির ইসলামী বিনির্মাণে আমাদের ওলামা, যুব সমাজ, চিন্তাবিদ ও সকল ইসলামপ্রিয় মানুষের জিহাদী প্রেরণা যোগাবে।

তারিখ : ০৮.০১.০৮ ঈসায়ী

বিনীত

মুহাম্মাদ সালমান

মাদরাসা দারুর রাশাদ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

পাকিস্তান পরিচিতি

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভারতের মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাহযীব তামাদ্দুন সংরক্ষণ, শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক আজাদীর লক্ষ্যে বিশ শতকের শুরুতেই রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ উদ্দেশ্যে জনাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে ঢাকায় এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনে সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একক রাজনৈতিক সংগঠন 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখা হয়।

স্যার সলিমুল্লাহর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান যা পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯০৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর যে মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয় তা বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সফল সোপানে এসে উপনীত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর অবদান ও ভূমিকা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক বলা হয়ে থাকে। ১৯১৩ সালে জিন্নাহ সাহেব যোগদান করেন মুসলিম লীগে। এরপর ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরের মুসলিম লীগের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। বাংলার কৃতি সন্তান এবং অন্যতম রাজনীতিক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এই অধিবেশনে লাহোর বা পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। এতে পাকিস্তান আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। এরপর ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান গঠিত হয়। পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম উদয় হয়েছিল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আল্লামা ইকবালের মনে। তিনি বলেছিলেন– **I like to see the Punjub, Beluchistan, Sind and North west Frontier amalgamated into a single state.** (আমি পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে দেখতে চাই একটি

রাষ্ট্র হিসেবে।) জাতীয় কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থেই নাকি এ প্রস্তাব করেছিলেন। ইকবালের স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা চলছিল দূর্বার। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে ইকবালের কল্পিত রাষ্ট্রের নামকরণ করেছিলেন পাকিস্তান। পাঞ্জাবের পি, আফগানের এ (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অর্থে), কাশ্মীরের কে, সিন্ধুর এস এবং বেলুচিস্তানের তান– এ নিয়ে হয় পাকিস্তান। পূর্ব বঙ্গের কোন অস্থিত্ব পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনায় ছিল না। মূলতঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদের সূত্রে গাঁথা হয়েছিলো পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে। এরপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় দেশটিকে মোটামুটি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ গঠিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশ পাকিস্তান। রাজধানী– ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্বতময়। দেশের সর্ব উত্তরে রয়েছে হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান একটি অন্যতম প্রধান শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশটি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহা ২৪ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৩৭ অক্ষাংশ এবং ৬১ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৭৫ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তানের উত্তরে আফগানিস্তান ও রুশীয় তুর্কীস্থান, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান অবস্থিত। সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত।

আয়তন ও জনসংখ্যা

পাকিস্তানের আয়তন ২,৯৭,৪৫৮ বর্গমাইল বা ৮,০৩,৯৪৩ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯,৯১,৯৯০০০ জন। দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষই মুসলিম। বাকী ৩ শতাংশ হলো হিন্দু, খৃস্টান ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ এবং দেশে শিক্ষিতের হার ২৬ শতাংশ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু। তাছাড়া আঞ্চলিকভাবে আরো চারটি ভাষা রয়েছে। সেগুলো হলো পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী এবং বালুচি।

✍ পাকিস্তান সফর আমার জন্য নতুন ছিল না। ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার করাচী এবং একবার লাহোর সফর করেছিলাম। ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পাইনি রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার, বালাকোট ইত্যাদি সফর করার। সে সুযোগটা এবার পুরোপুরি ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

পাকিস্তান আন্দোলন ও কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ

১৮৭৬ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর রবিবার করাচী নগরীতে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পুঞ্জা জিন্নাহর নিবাস ছিল কাথিয়া ওয়াড়ের অন্তর্গত রাজকোটে। করাচীতে তাঁর চামড়ার কারবার ছিল। বৈভব তাঁর খুব বেশি না থাকলেও ভদ্রভাবে জীবনযাপনের স্বচ্ছলতা তাঁর ছিল। পুঞ্জা জিন্নাহ তাঁর ছেলেকে বেশ ছোট বেলাতেই বোম্বাইয়ের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই অল্প বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গছাড়া হয়ে কে-ই বা থাকতে চায়? কিন্তু শিশু জিন্নাহর মনোবল আর সাহস ছিল অসাধারণ। তার পরিচয় দিলেন তিনি কয়েক বছর বোম্বাই শহরে একাকী কাটিয়ে। তারপর তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় করাচীতে। সেখানে তিনি খৃস্টান মিশনারী স্কুলে পড়তে থাকেন। এই বিদ্যালয় থেকে ষোল বছর বয়সে তিনি উত্তীর্ণ হন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। এই মিশন স্কুলে পড়বার কালেই তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ও পিতামাতার ইচ্ছানুসারে জিন্নাহকে আমাই বাঈ নাম্নী কাথিয়াওয়াড়ের এক খোজা বালিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।

সেকালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ব্যারিস্টারী পড়া যেতো। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তায় পিতার অগাধ আস্থা ছিল। তাই তিনি পুত্রকে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলেতে পাঠাতেন। ঐ সময়ই তাঁর তরুণী স্ত্রী আমাই বাঈ ইন্তেকাল করেন। এর কিছুদিন পর তাঁর মাতাও ইন্তেকাল করেন। বিলেতে তাঁকে চার বছর থাকতে হয়। খেলাধুলা বা অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পেছনে সময় নষ্ট না করে গভীর অভিনিবেশ সহকারে লেখাপড়ায় ডুবে থাকতেন তিনি। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ব্যারিস্টার জিন্নাহ দেশে ফিরলেন।

বিলেতে থাকাকালীন সমসাময়িক সবচেয়ে পরিশ্রমী ছাত্রদের অন্যতম হিসেবে জিন্নাহর খ্যাতি ছিল। তাঁর মার্জিত রুচি, সৌজন্যময় ব্যবহার সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সব সময়ই তিনি তাঁর বইপত্রগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন, পরতেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। কি তাঁর কাপড়-চোপড়, কি তাঁর পরবার সাজ-সরঞ্জাম কোনখানেই এক বিন্দু ময়লার অস্তিত্ব তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। এ অভ্যাস তাঁর সারা জীবনেই অটুট ছিল।

ইতোমধ্যে চামড়ার ব্যবসায়ে গুরুতর লোকসানের দরুণ জিন্নাহ পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। শুরু হলো তাঁদের অভাব-অনটনের

দিন। বিলেত থেকে ফিরে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বুঝতে বাকী রইলো না যে, পিতার দিক থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আর কোন আশা তাঁর নেই। এবার শুরুতেই নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে, পরিবারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশাকে রুখতে হবে।

করাচীতেই জিন্নাহ তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করুন–এই ছিল সকলের অভিমত। কিন্তু এতদিনের পোষণ করা উচ্চ আদর্শ আর মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে করাচী তাঁর কাছে ভালো লাগলো না। কেননা, আইন ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসেবে করাচীর গুরুত্ব তখন পরবর্তী জমানা বা এখনকার তুলনায় ছিল অনেক কম। সিন্ধু সে সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটা অংশ মাত্র। বোম্বাই ছিল সে আমলে ওসব অঞ্চলের মূল প্রাণকেন্দ্র। তাই সেখানে গিয়েই ভাগ্য পরীক্ষায় রত হবেন, চেষ্টা করবেন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে, এই সংকল্পই জিন্নাহর মনে জোরদার হয়ে উঠলো। অবশেষে পরিবারের প্রতিকূলতাকে হটিয়ে দিয়ে তিনি করাচী ছেড়ে চললেন বোম্বাই শহরে। জিন্নাহর চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংগ্রাম পিপাসার এ হল আর একটি উদাহরণ। কার্যক্ষেত্র বাছাই এর– ব্যাপারে জিন্নাহ যে ভুল করেননি, পরবর্তীকালের ইতিহাসই তার প্রকৃত প্রমাণ। সেই আমলেও বোম্বাই ছিল বিরাট শহর। বড় বড় নাম করা পেশাজীবীর বাস ছিল সেখানে। বহু বছরের নিরলস শ্রমের বিনিময়েই তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সেই ঝানু লোকের সাথে পাল্লা দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তদুপরি আইনজীবী হিসেবে জিন্নাহ ছিলেন একেবারে নতুন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিও ছিল নেহায়েৎ কাঁচা। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে পয়সা জমানো আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাই ওকালতির প্রথমদিকে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ গুরুতর অসুবিধে এবং বিরাট বিপদের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত, অধ্যবসায়ী এই মানুষটি হাজার বিপর্যয়ের মাঝেও দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। অপেক্ষা করার ধৈর্য্য তাঁর ছিল। সুকঠোর দুর্যোগের সাথে মোকাবিলা করার সাহসও ছিল তাঁর প্রচুর। তাই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চাইলেন তিনি। করলেনও।

রাজনীতির প্রতি জিন্নাহর আকর্ষণ ছিল সব সময়ই প্রখর। বিলেতে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এখানেই তিনি কংগ্রেসের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা দাদাভাই নওরোজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন।

সেকালে জাতীয় কংগ্রেসই ছিল ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেবে তিনি ফিরোজ শাহ মেহতার

মতো অভিজ্ঞ দেশনায়কদের সাথে এক যোগে কাজ করার সুযোগ পান। সততা সাহস ও দেশপ্রেমের বিচারে তিনি সহকর্মীদের হৃদয় জয় করেন। কংগ্রেস সে সময় সারা ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ছিল। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মুসলমানই এতে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাই ছিল কংগ্রেসের প্রধান সংগঠক। সংগঠনে তাঁদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই হিন্দু প্রাধান্যের সাথে মুসলিম স্বার্থের যে সংঘাত ঘটতে পারে, উদারমনা মুক্তবুদ্ধির অধিকারী মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তা গোড়ার দিকে কল্পনাও করতে পারেননি। হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য তাই তিনি ক্লান্তিহীন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সে কারণেই মিসেস সরোজিমী নাইডু তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে জিন্নাহ ভারতের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় থেকে তাঁর বাগ্মিতা, বুদ্ধিচাতুর্য এবং চিত্তের দৃঢ়তা সকলের মনেই দাগ কাটতে শুরু করে। একজন পাকা পার্লামেন্টারিয়ান রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসী নেতাদের কাছেও তিনি বিপুল শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

১৯০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের খবরদারি করা। দেশের শাসনতন্ত্রে, আইন পরিষদে, পৌরসভায় তাঁরা যাতে তাঁদের ন্যায্য আনুপাতিক হিস্যা পান, পৃথক নির্বাচন প্রথা যাতে চালু হয়– সেই উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগ আন্দোলন আরম্ভ করে। তখনকার প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় মুসলমানই মুসলিম লীগে যোগ দেন। কিন্তু জিন্নাহ থাকেন এর থেকে দূরে। তিনি মনে করতেন– হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের ভাই। সুতরাং তাঁর মতে, শুধুমাত্র মুসলমানের জন্যে আলাদা কোন সংগঠন করার দরকার পড়ে না।

১৯১৭ সালে মিসেস অ্যানি বেসান্ত হোম রূম লীগের গোড়াপত্তন করলে জিন্নাহ তাতে যোগ দেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই আজাদী হাসিলের জন্য উপযুক্ত যে কোন আন্দোলনে অংশ নিতে তিনি দ্বিধা করেননি কখনো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেজায় দায়ে ঠেকে বৃটিশ সরকার কথা দিয়েছিল লড়াই শেষে ভারত স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু সংকট উৎরে গেলে বৃটেন সেই ফাঁকা প্রতিশ্রুতির সামান্যতম ইজ্জতও আর রাখলো না। ভারতের মানুষ যেটাকে কালা কানুন নামে অভিহিত করলো, সেই রাউলেট আইনই তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হলো। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো

সমগ্র ভারতবর্ষ। সংঘটিত হলো জালিয়াওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় জারি হলো সামরিক আইন। এসব নির্মম অন্যায়ের প্রতিরোধে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মি. গান্ধী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে জিন্নাহ সমর্থন জানালেন। কিন্তু অভিষ্ট মনজিলে পৌঁছানোর পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি একমত হতে পারলেন না। অনিয়মতান্ত্রিক বিক্ষোভ নিশ্চয় ব্যর্থ হবে, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। কিন্তু সাথে সাথে ভারতববাসীর অসহনীয় দুর্ভাগ্যের কথাও তিনি কখনই বিস্মৃত হননি। তাই রাউলেট আইন পাশ করার প্রতিবাদে জিন্নাহ বড়লাটের পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

১৯১৬ সালে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ যখন দেখতে পেলেন– কংগ্রেস নেতাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে এবং কংগ্রেসে তাঁদেরই প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে, তখন তিনি বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে পুরোপুরিভাবে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। তবু তিনি হিন্দু-মুসলিম সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টায় কার্পণ্য করেননি। অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে জিন্নাহ মুসলিম লীগকে সুসংহত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

১৯১৮ সালের ১৯ শে এপ্রিল বোম্বাই এর– খ্যাতনামা পাশী নেতা স্যার দিনশা পেটিটের ১৮ বছর বয়স্কা অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা রতন বাঈ পিতার ঘোরতম আপত্তি সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুহাম্মাদ আলী জিন্নার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময় জিন্নাহর বয়স ছিল ৪২ বছর। তৎকালে রতন বাঈ 'অপরূপ সুন্দরী' পরম রমণীয়া, বুদ্ধিমতি, হাস্যরসিকা' নারী বলে সকল মহলে পরিগণিত হতেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই আগস্ট জিন্নাহর একমাত্র সন্তান দীনা জিন্নাহর জন্ম হয়। বিবাহিত জীবনেও কিন্তু জিন্নাহ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে একটুকুও বিচ্যুত হননি।

১৯২৪ সালে জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এরই মধ্যে কংগ্রেসী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি মতলব কার্যক্ষেত্রে খোলাসা হয়ে উঠেছিল। তাই মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানকে একটি মাত্র শিবিরে জমায়েত হতে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, সুদৃঢ় ও সর্বাঙ্গীণ ঐক্যের মারফতেই মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমান শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করা সম্ভব। অন্য কিছুর মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরকেও তিনি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদের ঐক্য কায়েম করে মুসলিম

লীগকে জোরদার করার অর্থ কিন্তু হিন্দুদের সাথে শত্রুতা করা নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের মতো মুসলিম সম্প্রদায়েরও সাংগঠনিক শক্তিমত্তা বাড়িয়ে আযাদী অর্জন ত্বরান্বিত করা।

১৯৩০ সাল। মুসলিম লীগের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বছর। এ বছরেই মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ঐতিহাসিক ভাষণে আল্লামা ইকবাল প্রস্তাব করেন যে, যে সকল প্রদেশে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি সেসব প্রদেশের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হোক। এই মৌলিক সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রস্তাব গড়ে ওঠে। অবশ্য গোড়ার দিকে এই সুচিন্তিত প্রস্তাবের ভাগ্যে শত্রুর বিদ্রুপই জুটলো কেবল। অনেকে এ পরিকল্পনাকে কোন পাত্তাই দিল না। শুধু উড়িয়ে দিল একে ভাববিলাসী কবির আজগুবী স্বপ্ন, অবাস্তব খেয়াল, অসম্ভব কল্পনা বলে। ভারত ভাগ হবে এক 'খেয়ালী' দার্শনিকের পছন্দ মোতাবেক অখণ্ড ভারতবর্ষের ধ্বজাধারীরা একথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারল না।

১৯৪০ সালে লাহোর বৈঠকে মুসলিম লীগ কায়েদে আযমের পরিচালনাধীনে পাকিস্তান হাসিলের শপথ নিল। লীগ নেতারা পাকিস্তান ছাড়া অন্য যে কোন পরিকল্পনা বাতিল করতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তাঁদের সেই অমোঘ প্রতিশ্রুতিকে বিপুল অভিনন্দন জানালো দশ কোটি মুসলমানের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর। দিকে দিকে আওয়াজ উঠলো, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। সে ধ্বনিতে সারা দেশের আকাশে-বাতাসে কাঁপন জাগলো। আনন্দের উত্তেজনায় শিহরিত হলো মুসলমানদের অন্তর মন। অনাস্বাদিত এক সুখের আশায় তারা বুক বাঁধল। তাঁদের অদৃশ্য বাসনার রশি, কতো শতো আদর্শের ছায়া অকস্মাৎ যেন কায়া পেলো পাকিস্তান রূপে। পাকিস্তান কায়েম তারা করবেনই, নিশ্চয়ই করবেন– এ হলো তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী পণ।

পাকিস্তান আন্দোলন তখন চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের সুদূর অভ্যন্তরে, অজ্ঞাততম গ্রামেও নতুন আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো। সেই নতুন শপথের অগ্নিকণা নুতন জীবনের আলো জ্বালালো মুসলমানদের চোখে। কায়েদে আযম যেখানে গেলেন সেখানেই উল্লসিত জনতা তাঁকে জানালো অভাবনীয় খোশ-আমদেদ। কায়েদে আযম যে তাদের কাছে পাকিস্তানের প্রতীক– পাকিস্তান আর কায়েদে আযম তাই এক হয়ে গেলেন।

কায়েদে আযমের বয়স তখন পয়ষট্টি। শরীর যথেষ্ট দুর্বল। তবুও তাঁর কর্মময় জীবনের চৌহদ্দিতে ক্লান্তির প্রবেশাধিকার নেই। সুবিস্তীর্ণ এলাকা

জুড়ে সফরের পর সফর। সর্বদাই বক্তৃতার আয়োজন, আলোচনার অনুষ্ঠান। পাকিস্তান দাবীর তাৎপর্য, পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ, এর অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধে–অর্থাৎ পাকিস্তান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সুষ্ঠু জনমত গঠনের কাজে, দাবীর পক্ষে সুদৃঢ় কথার গাঁথুনি দিয়ে এমন সব জোরালো যুক্তির তিনি অবতারণা করলেন যে, প্রতিপক্ষ তার জবাব দেয়ার পথই পেল না, ঠকানো তো দূরের কথা। বুদ্ধির যুদ্ধে জবরদস্ত কংগ্রেসীরাও তাঁর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। অবশেষে বৃটিশ সরকার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী না মেনে আর পারলেন না।

১৯৪৬ সালে সরেজমিনে অবস্থা তদারকের নিমিত্তে বিলেত থেকে একটি পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল ভারত ভ্রমণে এলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য। দেশের বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁরা আলাপ-আলোচনা চালালেন। পেশ করলেন ভারত সরকার গঠনের এক নয়া পরিকল্পনা। কায়েদে আযম তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনে বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ফরমানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলো। মুসলমানদের প্রাথমিক দাবী ছিল পুরোপুরিভাবে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান মিলিয়ে পাকিস্তানের পত্তন করা। কিন্তু বৃটিশ সরকার সেই প্রস্তাবের অঙ্গহানি ঘটালেন পাঞ্জাব আর বাংলাদেশ ভাগ করে। এ দুটো প্রদেশের প্রায় আধাআধি তাঁরা ভারতের হাতে ছেড়ে দিলেন। তারপর মানচিত্র পাল্টালো পৃথিবীর। খানিকটা জায়গায় লাল রঙ্গ মুছে গেল নিঃশেষে। সেখানকার দু'ধারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সবুজের ছাপ পড়লো। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পৃথিবীর ভূগোলের মানচিত্রে একটি নতুন নাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই নাম পাকিস্তান।

প্রকৃতপক্ষে, কায়েদে আযমের নিঃস্বার্থ দেশ সেবা, বিরামহীন সাধনার জীবন্ত কীর্তিস্তম্ভ। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কায়েদে আযমের নাম সোনার হরফে লেখা থাকবে। এত দিনের বেপরোয়া খাটুনির ফলে তাঁর শরীর ইতোমধ্যেই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার উপর আবার চাপ পড়লো নতুনতর এক কঠিনতম মেহনতের। স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করে দিনরাত খাটতে লাগলেন তিনি। এ অমানুষিক পরিশ্রমের শেষ ফল খুবই মারাত্মক হলো। ডাক্তাররা তাঁকে নিয়ে গেলেন বেলুচিস্তানের পাহাড়ঘেরা পর্যটনকেন্দ্রের স্বাস্থ্যনিবাসে। পরম প্রয়াসে রত থাকলেন তাঁরা কায়েদে আযমকে সারিয়ে তুলতে। কিন্তু দিন তাঁর শেষ হয়ে এসেছিল। অত্যন্ত

সংকটসঙ্কুল অবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে করাচীতে নিয়ে আসা হলো। সেদিনই জাতির জনক, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ সমগ্র দেশকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতবাসী হলেন।

মাজার

করাচী শহরের কেন্দ্রস্থলে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ রোডের মোড়ে এক নীরব নিস্তব্ধ সমাধির বুকে শ্রান্ত ক্লান্ত কায়েদে আযম চিরশান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করছেন। সমাধির উপর গড়ে উঠেছে সুউচ্ছ গোলাকৃতি এক বিরাট স্মৃতিসৌধ। সমুদ্র বক্ষ হতে পঁচাত্তর ফুট উচ্চে অবস্থিত রৌদ্রস্নাত ধূসর পাহাড়তুল্য স্মৃতিসৌধটি কায়েদে আযমের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসেবে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিম ও আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণে স্মৃতিসৌধটি নির্মিত। এর নকশা প্রস্তুত করেন বোম্বের বিখ্যাত স্থপতি জনাব ইয়াহিয়া–যিনি কায়েদে আযমের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আইয়ূব খান এই সমাধিসৌধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। মোট আশি লক্ষ টাকার পরিকল্পনা। এ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে শুনলাম। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে এখনও বেশ কিছুদিন লাগবে। রাজমিস্ত্রীরা কাজ করে চলেছে। পাহারায় পুলিশ মোতায়েন আছে। সৌধটি চারতলা ইমারতের ন্যায় উচ্চতা-বিশিষ্ট। সৌধের তিন দিকে উপরে উঠবার কয়েকটি সিঁড়ি আছে। উপরের প্লাটফর্ম হতে চারিদিকে চারটি দরজা দিয়ে সিঁড়ির সাহায্যে নিচে সমাধির কাছে নেমে যাওয়া যায়। নিচের কুঠরীতে মাটির বুকে পাতা সমাধি।

কায়েদে আযমের স্মৃতিসৌধের বাইরে ডান পার্শ্বে তাঁর সহকর্মী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদে মিল্লাত মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী খান এবং মুসলিম লীগ প্রধান জনাব সরদার আব্দুর রব নিশতার সাহেবের মাজার। মাজার দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। এদিক থেকে কায়েদে আযমের সমাধিসৌধের উপরের প্লাটফর্মে উঠবার কোন সিঁড়ি নেই। হয়তো শহীদে মিল্লাত ও সরদার নিশতারের সমাধিসৌধ নির্মাণকালে কোন অসুবিধা হতে পারে জন্যই এদিকে সিঁড়ি করা হয়নি। পাকিস্তানের সংগ্রামে এই মহান নেতৃত্রয় একই সঙ্গে কাজ করেছেন। আজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁরা এক সাথে পাশাপাশি শুয়ে আছেন।

করাচী শহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পাকিস্তানের বৃহত্তম বন্দর এবং একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। এটা সিন্ধু ব-দ্বীপের ঠিক উত্তর পশ্চিমে আবর সাগরের তীরে ২৪ ডিগ্রী ৫২ মি উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৭ ডিগ্রী ০৩ মি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এটা সিন্ধু প্রদেশের একটি জেলার নাম। বিভাগের রাজধানী, দেশের বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র এবং এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। শুধু শহরটির পরিধিই ২২৮ বর্গমাইল এবং বৃহত্তর করাচীর পরিধি ৫৬০ বর্গমাইল।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৩,৬০,০০০ জন। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে আদমশুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১০,৬৮,৪৫৭ জন। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯,১৩,৫৯৮ জন। গত দশকে প্রতিষ্ঠিত নগরের উপকণ্ঠকে অন্তর্ভুক্ত করে হিসাব করলে দেখা যায়, ১৯৭২ খৃস্টাব্দ নাগাদ (করাচীর জনসংখ্যা ৩ মিলিয়নের বেশি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮১ সালে এ সংখ্যা অতিক্রম করে ৫১,০৩,০০০ হয়েছে। ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত করাচী পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল। কিন্তু পরে রাজধানী রাওয়ালপিন্ডির কয়েক মাইল দূরে ইসলামাবাদে তা স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই পাকিস্তান সরকারের যাবতীয় অফিস আদালত স্থাপিত হয়।
করাচীর সাথে বাইরের জগতের পরিচয় দীর্ঘ দিনের নয়। শহরের জনগণের মধ্যে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, দু'শত বছর পূর্বে এটি ছিল মাছ শিকারীদের একটি বস্তি। 'কুলাচী' নামক জনৈকা মহিলা এখানকার শাসনকর্ত্রী ছিলেন, তারই নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নামকরণের কারণ এই যে, এখানে কুলাচী নামে বালুচদের একটি গোত্র বাস করত, তাদের নামানুসারেই সম্ভবত এ নামকরণ করা হয়। তারা ছিল রাজপুতদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত "ডেরা ইসমাঈল খা"র ছোট্ট একটি শহর কুলাচীর নামকরণের কারণও সম্ভবত এটাই। যাহোক, সিন্ধু ভাষায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী কুলাচী শব্দের **(L)** কে **(R)** এর সাথে বদল করে করাচী শব্দটি গঠন করা হয়েছে।
১৮৬১ খৃস্টাব্দের পর রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে করাচীকে কোটরীর সাথে এবং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪-১৮৮৪ এর মধ্যে করাচীর বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে

করাচী প্রাচ্যের বৃহত্তম রফতানী বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে ১৯১৪-১৯১৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মহাযুদ্ধ দুটি বন্দর উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে।
বর্তমানে শহরটির ব্যাপক উন্নতির কারণ এই যে, এটা পাকিস্তানের একমাত্র বন্দর, পাকিস্তান ব্যতীত আফগানিস্তান ও (আংশিক) ইরানের সামগ্রী অর্থাৎ গম, কার্পাস, তৈলবীজ, চামড়া ও খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম বিদেশে রফতানী হয়।
বৎসরের অধিকাংশ সময়ই করাচীর ঋতু মনোরম থাকে। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের মৌসুমী বায়ুর কোনটাই প্রবাহিত হয় না। সে কারণে এখানকার ঋতু কেবল দু'টি। যথা– শীতকাল নভেম্বর মাস হতে আরম্ভ হয়ে মার্চ মাসে শেষ হয়ে যায়। তাপমাত্রা হয় ৫৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট ১৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড; কখনও কখনও প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত কমে যায়। গ্রীষ্মকাল এপ্রিল মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত থাকে। তাপমাত্রা বেশির ভাগ সময়েই ৫৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট ৩৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কখনও কখনও ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বর্ষাকাল ঊর্ধ্বে জুন, জুলাই ও আগস্ট মাস পর্যন্ত থাকে এবং এ সময় প্রায় ৮ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। বায়ু প্রবাহের গতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় ঘণ্টায় ২৫ মাইলেরও অধিক বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। সাধারণত গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকের বায়ুর বেগ থাকে বেশি। সর্বাপেক্ষা অধিক শুষ্ক থাকে ডিসেম্বর মাস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা থাকে ৫০%। সর্বাধিক আর্দ্রতাপূর্ণ মাস আগস্ট। সে সময় করাচীতে আর্দ্রতার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪ %।

হাল আমলের প্রসার ও সমৃদ্ধি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর করাচীকে রাজধানী নির্ধারণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, করাচীকে অধিকতর সম্প্রসারিত করতে হবে এবং একে একটি কেন্দ্রীয় শহরে রূপান্তরিত করে বিশ হাজার একর পরিসীমায় বর্ধিত করতে হবে, যাতে এ অঞ্চলে একটি বৃহৎ ও বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী একটি জাঁকজমকপূর্ণ শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এ মহানগরীর চরম উন্নতি শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এখানে প্রাদেশিকতার ছাপ বিরাজ করছিল এবং ২৫ বৎসরের মধ্যেই জনসংখ্যা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে লারী নদীর দক্ষিণ উপকূলে নাজিমাবাদা ও লিয়াকতাবাদ এর– মত উপকণ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনুরূপ কোরাঙ্গীর ক্ষুদ্র শহর ও মালির নদীর বাম তীরে

অবস্থিত ল্যান্ডির নতুন শিল্প এলাকা কেবল শেষ দশকের দিকে নির্মিত হয়। স্লুইস গেট পদ্ধতির সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ নগরায়ন ও শিল্পায়নের এক পরিকল্পনা "করাচী ডেভেলপমেন্ট অথরিটী" কর্তৃক গৃহীত হয়। পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সরকারপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বন্দর রোডের উত্তর দিকে করাচীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ উম্মুক্ত রাজপথ। অন্যান্য বৃহৎ সড়ক করাচীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত, যা নির্মাণাধীন বৃহত্তর করাচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে দেশের রাজধানী ইসলামাবাদে (রাওয়ালপিন্ডি) স্থানান্তরিত করা হয় এবং করাচী কেবল সিন্ধু প্রদেশের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে থেকে যায়। তারপর হায়দারাবাদকে সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী নির্ধারণ করা হয়। এতদসত্ত্বেও করাচী শহরের প্রসার ও উন্নয়ন তৎপরতা বিঘ্নিত হয়নি।

করাচী শহরের চিত্র

করাচী একটি অতি সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর। মনোরা দ্বীপ, কিয়ামারী দ্বীপ ও ঝিনুক শিল্পের কারণে সামুদ্রিক ঝড় ও আক্রমণ হতে নিরাপদ। বন্দরের আশেপাশে একটি দীর্ঘ ভূমিস্তর শহরের উত্তর ও পূর্ব দিকে ক্রমান্বয়ে ৫ ফুট থেকে ১২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে গিয়েছে এবং এই প্রশস্ত মুক্তাঙ্গনেই করাচী শহরের বিস্তার ঘটেছে। উত্তর ও পূর্ব দিকে কিছু ছোট ছোট পাহাড়ও আছে। এগুলোর মধ্যে উচ্চতর পাহাড় হল সাংগোপীর (৫৮৫ ফুট) দুটি বৃষ্টিনির্ভর নদী; মালীর ও লারী যথাক্রমে শহরের পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত। করাচী শহরের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার চারটি বৃহৎ পাকা সড়ক, যথা– লরেন্স রোড, বন্দর রোড, ফেয়ার রোড, ম্যাকলিওড রোড "মেরী ওয়েদার টাওয়ার" হতে শুরু করে পরস্পর সমান্তরাল হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অতিক্রম করেছে এবং এর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সড়ক, যথা নেপিয়ার রোড, কাচারী রোড, গার্ডেন রোড উত্তর-দক্ষিণে ছেদ করেছে। এ সমস্ত সড়কের আশেপাশেই শহরকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। বন্দর রোডের উত্তরে বন্দরের সন্নিকটে পুরাতন শহরটি এক মাইল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত। এর পূর্বে ড্রিগ সেনানিবাস, সিভিল লাইন ও সদর এলাকা। এটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নির্মিত। আরও পরে শহরের উপকণ্ঠের কয়েকটি নতুন আবাসিক এলাকা, যথা– নাজিমাবাদ, দিল্লী কলোনী, সিন্ধু হাউজিং সোসাইটি, হায়দারাবাদ কলোনী, পীর ইলাহী বাখশ কলোনী অতিক্রম করত সড়কগুলো কোরাঙ্গীর দিকে চলে গেছে। মানচিত্রে করাচী শহরকে এমন মনে হয় যে, একটি বড় মাকড়সা চতুর্দিকে নিজের পা বিস্তার করে বসে আছে।

পরিবহন ও যাতায়াত

বিশ্বের মানুষ করাচীকে নিজেদের শহর বলে মনে করত। কিন্তু বর্তমানে শহরটি এমন আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে যে, এর ইতিহাসে তার নজির নেই। এই শহরে স্থল, জল ও আকাশপথে যাতায়াত করা যায়। পেশওয়ারগামী মহাসড়ক করাচীকে দেশের মধ্যস্থ অঞ্চলের সাথে এবং যাহাদানগামী সড়ক ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে শহরটিকে সংযুক্ত করেছে। শহরটির মধ্যবর্তী সড়কগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ মাইল এবং উপকণ্ঠ ১৬০০ মাইলেরও অধিক। করাচী পাকিস্তান রেলপথের সর্বশেষ স্টেশন। এ রেলপথ সিন্ধু উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত সকল দ্রব্যাদি এ রেলপথের সাহায্যে বন্দর দ্বারে এবং আমদানীকৃত দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেয়। কয়েক ডজন মালগাড়ি দৈনিক আসা-যাওয়া করে। দ্রব্যাদি পরিবহন ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ট্রাকও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত জাহাজগুলো কিয়ামারীতে নোঙ্গর করে থাকে। এর প্রকৃত কারণ এই যে, স্থানটি কিছু সমুদ্র পথের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যস্ততম সমুদ্রপথের নিকট করাচী বন্দর অবস্থিত বলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বহু ব্যবহৃত, বিশেষত যে সমস্ত ব্যবসা, একদিকে পারস্য উপসাগর "সুয়েজ খাল" ও "রাস উমেদ" এবং অন্যদিকে শ্রীলংকা, বার্মা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়। এই বন্দরে সারা বৎসরই বিভিন্ন ধরনের জাহাজ সুরক্ষিত থাকে; কারণ বন্দরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মনোরা দ্বীপ একটি অসাধারণ অবতরণ স্থল। বর্তমানে করাচীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। ১৯৭০-১৯৭১ খৃস্টাব্দে এখানকার বিশটিরও অধিক অঙ্গনে ৬৩ লক্ষ টন মালামাল অবতরণ করে এবং প্রায় ৩২ লক্ষ টন মাল ভর্তি করা হয়। এখানে বাৎসরিক ১৭শতেরও বেশি জাহাজ নোঙ্গর করে। তাছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে উপকূলীয় বাণিজ্যও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

করাচীর কায়েদে আজম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখানে দিনরাত ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে উড়োজাহাজের গমনাগমন সর্বদা অব্যাহত থাকে। আধুনিক উড়োজাহাজ অবতরণের জন্য এখানকার রানওয়েটি অত্যন্ত উপযুক্ত ও প্রশস্ত। এটি হাতের তালুর মত সমতল একটি বিশাল মাঠ। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এখানকার আবহাওয়া

শুষ্ক থাকে, সেই কারণেই করাচীর দুটি বিমানবন্দর 'ড্রিগ রোড' (সিভিল বা অসামরিক) এবং মৌরিপুর (ফৌজী) পুরোপুরি জমজমাট থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আন্তরাষ্ট্রে কোম্পানীগুলোর কারবারের জন্য এখানে দিনরাত খুব ধুমধাম থাকে। হাজার হাজার পর্যটক, ভারী ডাক এবং বাণিজ্যিক সামগ্রী প্রভৃতির গমনাগমন ও পরিবহন অবিরাম চলতে থাকে। জাম্বো জেট ও ভারী বিমান দিনরাত উড্ডয়ন ও অবতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। ভৌগোলিক কারণেও এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে করাচী একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। 'পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান পথ' (**P.I.A.**) করাচীকে তেহরান, বৈরুত, রোম, ফ্রাংকফুট, জেনেভা বা মস্কো হয়ে লন্ডনের সাথে সংযুক্ত করেছে। অবশ্য ঢাকা ক্যান্টন হয়ে করাচী সাংহাই নিয়মিত বিমান চলাচল করে।

শিল্প ও বাণিজ্য

করাচী পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে তিন হাজারেরও বেশি কারখানা চালু আছে, যেগুলোতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। বস্ত্র বয়ন ও পাদুকা প্রস্তুত শিল্পের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এখানে একটি বিরাট তৈল শোধনাগার আছে। বিভিন্ন প্রকার মেশিন, ঔষধপত্র, শিশি-বোতল, কৌটা, আসবাবপত্র, কাগজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও চামড়ার দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে বৃহৎ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রায় ৩০টি বৃহৎ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় দফতর এবং সেগুলোর শাখা কার্যরত আছে। দু' ডজনের বেশি বীমা কোম্পানী এবং দেশের বৃহত্তম স্টক একচেঞ্জ এখানেই প্রতিষ্ঠিত। বৃহত্তর করাচীর পৌর প্রশাসন পাঁচটি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়। যথা– করাচী মিউনিসিপাল করপোরেশন, কোরাঙ্গী ল্যান্ডি মিউনিসিপাল কমিটি, ড্রিগ-মালীর মিউনিসিপাল কমিটি, করাচী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং করাচী পোর্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি।

করাচীতে নিম্নলিখিত উৎস হতে পানি সরবরাহ হয়ে থাকে। যথা - ১. হালীজী হ্রদ, এটি করাচী হতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই হ্রদে সিন্ধু নদীর পানিও প্রবেশ করে। ২. মালীর নদীর শুষ্কখানে খননকৃত কূপ। ৩. করাচী হতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত কালরী হ্রদ। এ শহরে দৈনিক প্রায় ১০ কোটি গ্যালন পানি ব্যবহৃত হয়। এতদসত্ত্বে এর কতিপয় উপকণ্ঠে, বিশেষত ল্যান্ডি, মালীর এবং মৌরীপুরের পাশ্ববর্তী বস্তিসমূহ হতে পানির অপ্রতুলতার অভিযোগ পাওয়া যায়।

করাচীতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যামিক এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। করাচীর ভবিষ্যত খুবই সম্ভাবনাময়। ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে এখানে ৩০০ মাইলের অধিক দীর্ঘ সুঈ প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন বসানো হয়েছে। এটা শিল্প ও গৃহস্থালী উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। করাচীর বাণিজ্য সংক্রান্ত বর্তমান উন্নয়নের জন্য এবং পশ্চাদভূমিতে উৎপাদিক দ্রব্য সামগ্রীর গুরুত্বপূর্ণ রফতানী পথ হিসেবে এই বন্দর স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করে থাকে। যথা– তুলা, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, চামড়া ইত্যাদি। করাচী পাকিস্তানের বিরাট শিল্পকেন্দ্র। সম্প্রসারণমূলক লোহা গলাবার চুল্লী শিল্প, নবনির্মিত তৈল শোধনাগার, আধুনিক পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা, ঐতিহ্যবাহী পশম উৎপাদন প্রক্রিয়া, কাঠ, চামড়া, ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সিমেন্ট উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (আটা কল, মিষ্টি তৈরির কারখানা, মৎস্য টিনজাতকরণ ও সংরক্ষণ) এবং অন্যান্য কার্যক্রম; যেমন- হস্তশিল্প, সাবান তৈরি এবং প্লাস্টিক শিল্পকর্মের জন্য শহরটি কৃতিত্বের দাবীদার।

আরব সাগরের তীরে এই শহরটি এবং এর বন্দরের সমৃদ্ধি ইতিহাসে অতুলনীয়। অতীতকালেও এর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং যদি সঠিকভাবে শহরটির তত্ত্বাবধান ও প্রসারের জন্য সচেষ্ট থাকা যায়, তবে এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য বৃদ্ধিরও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

করাচীর পথে

✍ ২০০৬ সালের ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১২টা ৫০মিনিটে **PIA** এর ফ্লাইটে পাকিস্তানের ইসলামাবাদের ইদারায়ে উলূমুল ইসলামীর বার্ষিক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে করাচী রওয়ানা হই। ইদারায়ে উলূমুল ইসলামীর প্রিন্সিপাল মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের সাথে লন্ডনে দেখা হয়েছিল। লন্ডনে অবস্থানকালে ইবরাহীম কমিউনিটি কলেজের অধ্যক্ষ মাওলানা মুশফিক সাহেবের কাছে শুনেছিলাম যে, ইসলামাবাদের অদূরে মারি হাইওয়েতে আজ থেকে ২২ বছর পূর্বে মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব ইদারায়ে উলূমে ইসলামী নামক একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

এটাও শুনেছিলাম যে, এ প্রতিষ্ঠানে দীনী এবং সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে একই সাথে একজন ছাত্রকে ফাযেলে দরসে নেযামী ও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট করে দেয়া হচ্ছে। ইবরাহীম কলেজের কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যারা ইতঃপূর্বে পাকিস্তান সফরকালে এ প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের কাছে এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়। কিছুদিন পর যখন শুনলাম এ প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব লন্ডন আসছেন, তখন মনে মনে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গভীর আগ্রহ পোষণ করি। তাঁর কাছ থেকে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানতে লালায়িত হই। খবর রাখতে থাকি তিনি কবে আসছেন। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর মাওলানা মুশফিক সাহেব বললেন, মাওলানা ফয়যুর রহমান এখন মক্কা শরীফে ওমরা করছেন। ২/৩ দিনের মধ্যে লন্ডন আসবেন।

কয়েকদিন পর তিনি লন্ডনে আসেন এবং এডমনটন গ্রীন মসজিদে অবস্থান করতে থাকেন। মুশফিক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে একদিন মাওলানার সাথে দেখা করি। মুশফিক ভাই মাদরাসা দারুর রাশাদ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। অনেক আলাপ আলোচনা হয়। কিছুদিন পর ৫ জুলাই বুধবার ২০০৬ ইবরাহীম কলেজে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আমিও অংশগ্রহণ করি। দীনী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি যে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছেন আর সেটা যে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ চলছে এবং পাকিস্তানের ওলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দীন এ মাদরাসার কার্যক্রম পছন্দ করেছেন, তার ইতিহাস সেখানে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

এ ধরনের একটি মাদরাসার মডেল আমরা অনেকদিন যাবত তালাশ করে ফিরছিলাম। হঠাৎ করে কুদরতীভাবে এ ধরনের একটি মডেলের কথা শুনে এবং সাথে সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠাতার সাথে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি, এটা আল্লাহ পাকের একটি কুদরতী মহিমা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রায় দু মাস পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে একত্রে থাকার এবং মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। এ সময়ে তাঁর সাথে বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

আমি ঢাকাতে এ ধরনের একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করি এবং এর জন্য তাঁর সহযোগিতা কামনা করি। তাঁকে ঢাকায় আসার দাওয়াত দেই। নতুন এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে বিভিন্ন ধরনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। প্রতি জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলতেন, মাওলানা! আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে নতুন নতুন প্রশ্নের উদয় হবে। আপনার সকল প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে যদি আপনি ইসলামাবাদে এসে আমাদের প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তিনি ইসলামাবাদ রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমাকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেন তাঁর প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য। এ ব্যাপারে মাওলানা মুশফিক ও তাঁর সাথী সঙ্গীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

রোযার পূর্বে লন্ডন থেকে ফিরে এসে দিন গুনতে থাকি কবে ইসলামাবাদ থেকে দাওয়াতনামা আসবে। হঠাৎ করে নভেম্বর ২০০৬ ঈ. এর শুরুতে ইসলামাবাদ থেকে দাওয়াতনামা আসে। ১৯ নভেম্বর ২০০৬ রবিবার ইদারায়ে উলূমুল ইসলামীর বার্ষিক সভা। সভায় আমার সাথে মাদরাসা দারুর রাশাদের এডুকেশন ডাইরেক্টর মাওলানা লিয়াকত আলী, শায়খুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমানও আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভিসার জন্য ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশনে দৌড় ঝাঁপ শুরু হয়। আমার এবং শায়খুল হাদীস সাহেবের যেহেতু পূর্বের পাকিস্তানী ভিসা ছিল এজন্য ১৩ নভেম্বর আমাদের ২ জনের ভিসা হয়ে যায়। কিন্তু মাওলানা লিয়াকত আলীর নতুন পাসপোর্ট হওয়ার কারণে অনেক চেষ্টার পরও ভিসা হল না। ভিসা অফিস থেকে পরিষ্কার বলে দেয়া হল যে, ইসলামাবাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভিসার কাগজপত্র না এলে লিয়াকত আলী সাহেবের ভিসা দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। ইসলামাবাদে ফোন করে মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, সময় কমে গেছে, এখন আপনি চলে আসুন, এখানে এসে মাওলানা লিয়াকত আলীর জন্য চেষ্টা করা যাবে। মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের ভিসা হওয়া সত্ত্বেও লিয়াকত আলী সাহেবের জন্য তাঁকেও

রেখে আমি একাই ফ্লাই করি। পরামর্শ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর তড়িঘড়ি করে **PIA** এর- ফ্লাইট যোগে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটে বিকাল ৩.২০ -এ করাচী পৌঁছি। করাচী কায়েদে আজম এয়ারপোর্টে আমাকে নেয়ার জন্য এসেছিলেন বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ নোমান। মাওলানা মুহাম্মাদ নোমান বাংলাদেশের মাগুরার ছেলে। তিনি বর্তমানে করাচীতে বসবাস করছেন। এয়ারপোর্টের কাজ সেরে নোমান ভাইয়ের সাথে মাগরিবের পূর্বেই তাঁর নাযেমাবাদের পাপোশ নগরের বাসায় পৌঁছে যাই।

বাদ ফজর নোমান ভাইকে সাথে নিয়ে একটু হাঁটতে বের হই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাপোশনগরের বিখ্যাত কবরস্থানের দিকে চলতে থাকি। এ কবরস্থানে শুয়ে আছেন বড় বড় ওলামা এবং মাশায়েখে কেরাম। এদের মধ্যে বিখ্যাত তিনজন আলেমের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত যথাস্থানে তুলে ধরব। কবরস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বের একটি ছোট ঘেরাওয়ের মধ্যে শুয়ে আছেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী র., হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী র., হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী র.। আমরা তিনজনের মাজার যিয়ারত করি।

সফরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই একটি প্রোগ্রামসূচী তৈরি করেছিলাম। মূলত এ সফরটি ছিল একটি শিক্ষা সফর। সফরের লক্ষ্যই ছিল বিখ্যাত দীনী প্রতিষ্ঠানগুলো দেখা এবং বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করে মতবিনিময় করা। এ প্রোগ্রামসূচীর মধ্যে এক নম্বরে ছিল ইসলামাবাদের অদূরে মারি হাইওয়েতে অবস্থিত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইদারায়ে উলূমুল ইসলামী ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এ ছাড়াও ইসলামাবাদ শহরের পার্লামেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্ট হাউস, উজিরে আযম হাউস, বাদশাহ ফয়সল মসজিদ, মরহুম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মাযার যিয়ারত, ইসলামী ইউনিভার্সিটি দেখা এবং ইসলামী ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, সাবেক ধর্মমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার ডা. মাহমুদ আহমদ গাযীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি।

কর্মসূচীতে আরও ছিল সীমান্ত প্রদেশের বালাকোট শহরে গিয়ে শহীদে বালাকোট হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী র., মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ র. ও অন্যান্য শহীদদের মাযার যিয়ারত করা। সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী

পেশোয়ারের অদূরে হযরত মাওলানা আব্দুল হক র. সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জামেয়া দারুল উলূম হাক্কানিয়া দেখা, বিখ্যাত আলেমেদীন ও সিনেটর হযরত মাওলানা সামিউল হক সাহেবের সাথে সাক্ষাত করা। এরপর লাহোরের অদূরে পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমে দীন গুজরাওয়ালা শহরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও নুসরাতুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীস, শরীয়া একাডেমীর চেয়ারম্যান মাওলানা জাহেদুর রাশেদী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত। লাহোরের বাদশাহী মসজিদ দেখা ও আল্লামা ইকবালের মাযার যিয়ারত, বিখ্যাত মাদরাসা জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর দেখা, পাকিস্তানের বিখ্যাত পীর ও বুযুর্গ হযরত রায়পুরী র. এর– অন্যতম খলীফা হযরত শাহ্ নাফিসুল হুসাইনী সাহেবের সাহচর্য লাভ। পাকিস্তানের তাবলীগ মারকাজ রায়বেন্ড হাজির হওয়া, লাহোরের শিরাওয়ালা গেটে শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর খুদ্দামুদ্দীনে হাজিরা দেয়া এবং মিনারা-ই পাকিস্তান দেখা ইত্যাদি।

করাচীর প্রোগ্রামসূচী ছিল জামেয়া দারুর উলূম করাচী, জামেয়া উলূমুল ইসলামী, জামেয়া ফারুকিয়া, জামেয়াতুর রশীদ প্রমুখ বিখ্যাত মাদরাসাগুলো দেখা, সিদ্দীকী ট্রাস্ট, মজলিসে ইলমী, মজলিসে নশরিয়তে ইসলাম ইত্যাদি দেখা, সাপ্তাহিক পত্রিকা যরবে মোমেন ও দৈনিক ইসলাম এর অফিস দেখা, বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ শহীদ হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ সাহেবের মদীনাতুল হিকমত ও হামদর্দ ইউনিভার্সিটি যাওয়া। গুলশানে ইকবালের খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ায় যেয়ে আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের সাথে সাক্ষাত। বায়তুল মুকাররম মসজিদে শায়খুল ইসলাম মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের পিছনে জুমার নামায আদায় করা। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যায় করাচীর তাবলীগী মারকায মাদানী মসজিদে হাজিরা দেয়া। মেছালী মা, মেছালী বাপ, মেছালী উস্তাদ ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক মুফতী হানীফ আবদুল মজিদের সাথে দেখা করা। পাকিস্তানের জনক, কায়দে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী র.–এর মাযার যিয়ারত এবং বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে নতুন নতুন কিতাবপত্র ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ছিল প্রোগ্রামসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সে অনুযায়ী সফর শুরু করি।

১৭ নভেম্বর জুমার দিন দুপুর আড়াইটায় বুরাক এক্সপ্রেসের এয়ারকন্ডিশন কোচে আমার সিট বুক করা ছিল পূর্বেই। ট্রেন যোগাযোগ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের তুলনায় ভারতেই ভালো। ভারতের কলকাতা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস, ক্যালকা এক্সপ্রেস, পুরবা এক্সপ্রেস, পাঞ্জাব এক্সপ্রেস খুবই ভালো গাড়ি। করাচী থেকে রাওয়ালপিন্ডি দু একটি ট্রেন সরাসরি চলাচল করে।

অধিকাংশ ট্রেনই করাচী থেকে লাহোর। করাচী এক্সপ্রেস, বুরাক এক্সপ্রেস, কারারাম, তেজগ্রাম প্রভৃতি ট্রেনগুলো ১৬ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টায় লাহোর যায়। ৩৬ ঘণ্টার ট্রেনও আছে। শুধু বসে যাওয়া যায়। রাতে স্লিপারও আছে এমন টিকিটের মূল্য প্রায় ৮০০ রুপী। এয়ার কন্ডিশন হলে ১৯৯০ টাকা। বর্তমানে করাচী-লাহোর, করাচী-ইসলামাবাদ যাওয়ার জন্য ভালো কোচ সার্ভিস চালু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় লাহোর পৌঁছে দেয়। লাহোর থেকে ইসলামাবাদ চার পাঁচ ঘণ্টার জার্নি। মোটরওয়েতে আরো তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, করাচী হতে লাহোরের দূরত্ব প্রায় ৮০০ মাইল। লাহোর হতে রাওয়ালপিন্ডি ২৫০ মাইল। আর রাওয়ালপিন্ডি হতে পেশওয়ারের দূরত্ব ২০০ মাইল। ইসলামাবাদ রাওয়ালপিন্ডি হতে মাত্র বার মাইল।

করাচী থেকে ইসলামাবাদ বাই এয়ার দেড় ঘণ্টার পথ। পি. আই. এর ফ্লাইটে ভাড়া প্রায় দশ হাজার রুপী, অন্যান্য এয়ার লাইন্সের ভাড়া সাড়ে তিন হাজার থেকে সাড়ে চার বা পাঁচ হাজার রুপী। তবে ট্রেন জার্নি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য প্রায় সমান সমান। দুপুর আড়াইটার ট্রেন ধরার জন্য ১২টার পর নোমান সাহেবের বাসা থেকে খানা খেয়ে করাচীর প্রধান স্টেশন কোন্ট হাজির হয়ে স্টেশন মসজিদে জুমার নামায পড়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে হাজির হই। একটু পরই বুরাক ট্রেনটি প্লাটফর্মে এসে যায়। ঠিক আড়াইটায় ট্রেন চলতে শুরু করে। করাচী পৌঁছেই যোগাযোগের সুবিধার জন্য মোবাইলে পাকিস্তানী সিম ভরে ফেলেছিলাম। আমার করাচী আগমনের বার্তা পূর্বেই ইসলামাবাদে জানিয়ে দিয়েছিলাম। বুরাক ট্রেনে রওয়ানা হয়ে শনিবার আড়াইটায় পিন্ডি পৌঁছব একথাও জানিয়ে রাখি।

বুরাক ট্রেন ছুটতে থাকে। করাচী শহরের শুধুমাত্র লান্ডি স্টেশনে ট্রেন থামে। এর দু'ঘণ্টা পরে হায়দারাবাদ শহরে ট্রেন পৌঁছে। রাত হওয়ার কারণে বাহিরের দৃশ্যাবলী ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। অবশ্য আসার সময় দিন থাকার কারণে পুরো দৃশ্যাবলী দেখা সহজ হয়েছিল। করাচীর পর হতেই মরুভূমি শুরু হয়। হাজার হাজার বিঘা জমি পড়ে আছে। কিছু কিছু জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। রাত ৯ টায় গাড়ি রুড়ী স্টেশনে থামল। এরপর রাত আড়াইটায় খানেওয়াল, সাহিওয়াল ইত্যাদি স্টেশনে ধরে ফয়সলাবাদ হয়ে সকাল ৯টায় হাজির হই লাহোরে। আশি টাকা দিয়ে রাতের খানা খেলাম। সকালে চল্লিশ টাকা দিয়ে নাস্তা। আমাদের এয়ারকন্ডিশন রুমে ছয়টি সিট ছিল। দুটি সিটে দুই জন মহিলা তাদের বাচ্চা নিয়ে শুয়ে পড়ে। বাকী চারজনের ৩ জনই পাঞ্জাবী, করাচীতে চাকুরী করেন। সবাই শিক্ষিত, ভদ্র। ট্রেনের পুরো সময়টা রাতের শোয়া বাদে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনায় কেটে যায়। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি

শুনেও তারা বাংলাদেশ সম্পর্ক জানতে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করল না। যাক, পরের দিন শনিবার ১৮ নভেম্বর ঠিক আড়াইটায় আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে ট্রেন রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে পৌঁছে যায়।

আমাকে স্টেশন থেকে মাদরাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িসহ লোক পাঠানো হয়েছিল। ফোনে যোগাযোগ থাকার কারণে স্টেশনে আর দেরী হয়নি। আমি সামানপত্র নিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে বসি। কিছু দূর গিয়ে টেক্সী থামিয়ে পিন্ডির একটি মসজিদে যোহরের নামায পড়ে নিই। রাওয়ালপিন্ডি শহরের ওপর দিয়ে গাড়ি ইসলামাবাদের দিকে চলছে। রাওয়ালপিন্ডি ঢাকার মতই। জ্যামের কারণে ট্যাক্সী এগুতে পারছে না। পিন্ডি থেকে ইসলামাবাদে হাইওয়েতে প্রবেশ করতে প্রায় ২০ মিনিট কেটে যায়। এরপর আমরা ইসলামবাদের দিকে অগ্রসর হই। প্রশস্ত রাস্তায় ট্যাক্সী ছুটতে থাকে। আসরের নামাযের পর আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে সহী সালামতে ইদারায়ে উলূমুল ইসলামী হাজির হই। গেটে প্রবেশ করার পরপরই মাদরাসার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের সাথে দেখা হয়। মাওলানা আমাকে মোবারকবাদ জানান। তিনি তখন অন্যান্য মেহমানদের অভ্যর্থনার জন্য ইসলামাবাদের চাকলালা এয়ারপোর্টে রওয়ানা হচ্ছিলেন। আমাকে দায়িত্বশীলদের হাতে ন্যস্ত করে তিনি চলে যান। আমি মাদরাসার মেহমানখানায় গিয়ে আসরের নামায আদায় করি।

পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য প্রথমে ইদরায়ে উলূমে ইসলামীর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি-

ইদারায়ে উলূমে ইসলামী ইসলামাবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলামাবাদ কিংবা রাওয়ালপিন্ডি থেকে মারি যাওয়ার পথে সতরামিল টোল প্লাজা থেকে সোয়া কিলোমিটার পূর্বে মারি হাইওয়ের ডান পাশে ইদারায়ে উলূমে ইসলামী, ইসলামাবাদ এর প্রধান ক্যাম্পাস (**Main Campus**) নজরে পড়ে। যা ৭৪ বিঘা বিস্তৃত ও প্রশস্ত ভূখণ্ডে অবস্থিত। পুরোনো ধাঁচের মেহরাবে সজ্জিত একটি পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আকর্ষণীয় ইমারত, সেই রাজপথ অতিক্রমকারী প্রতিটি মুসাফিরের নজর আকৃষ্ট করে। মেইন গেট দিয়ে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন এক ভিন্ন জগতে এসে পৌঁছেছি। সীমানার দক্ষিণ পাশে শ্রেণীকক্ষের সারি। যার উপরই নজর পড়বে মনে হবে যেন তা কোন আধুনিক ধাঁচের মডেল স্কুল কিংবা কলেজ। কিন্তু হঠাৎ করে নজর যখন কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক পরিহিত, মাথার উপর পাগড়ী কিংবা

টুপিধারী শ্মশ্রুমণ্ডিত শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর পড়বে তখন ধারণা হবে এ যেন পুরোনো ধাঁচের কোন দীনী মাদরাসা।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **দীনী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় :** এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে দীনী ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, যতটুকু সময়ের মধ্যে একজন ছাত্র কেবল কুরআন হেফজ ও দীনী শিক্ষা সমাপ্ত করে ততটুকু সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র হাফেজে কুরআন, আলেমে দীন ও গ্রাজুয়েট হতে পারে।

২. **নেসাবে সমতা বিধান :** দীনী মাদরাসায় পড়ানো হয় এমন কিছু কিতাবের স্থানে তদপেক্ষা উপকারী কিতাবসমূহ পড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং নেসাব থেকে ইউনানী দর্শনকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে। অবশ্য মানতিককে প্রয়োজন অনুপাতে বাকী রাখা হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে নেসাবের মধ্যে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছে তা ফেকাহ, নাহব ও সরফ (ব্যাকরণ) এবং মানতিক ইত্যাদির মধ্যে সীমিত। তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে প্রায় সব কিতাবই পড়ানো হয়, যা অন্যান্য দীনী মাদরাসার নেসাবের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **আরবী কথোপকথন :** আরবী কথোপকথনের যোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য নেসাবের মধ্যে আলাদা কিতাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. **বক্তৃতা :** বক্তৃতা শিল্প এখানে পৃথক একটি বিষয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। তার জন্যে পড়াশুনার মধ্যখানে বিশেষ একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক জামাতে এ কাজের তত্ত্বাবধান বিভিন্ন শিক্ষকের জিম্মায় রয়েছে।

৫. **মুজাকারা (Group Study) :** শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানেই মুজাকারা করানো হয় এবং ধর্মীয় ও আধুনিক বিষয়ের মুজাকারার জন্যে আলাদা সময় নির্ধারিত রয়েছে। এভাবে কোন এক অংশ অন্য অংশের উপর প্রাধান্য বিস্তারের আশঙ্কা তদারকী করা হয়।

৬. **তারবিয়াত :** ছাত্রদের উন্নত তারবিয়াত এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। যার ভিত্তি হল তিনটি-

ক. কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সম্পর্ক : নেসাবে কুরআন ও হাদীসের জন্য তুলনামূলক অধিক সময় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

❀ প্রাথমিক স্তর ব্যতীত সকল ছাত্রদের জন্যে হাফেজে কুরআন হওয়া আবশ্যক করা হয়েছে। ❀ মাধ্যমিক স্তর থেকেই কুরআন ও হাদীসকে

নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ❀ নাহব ও সরফের অনুশীলনের জন্যে কুরআন ও হাদীসকে মাধ্যম বানানো হয়েছে।

খ. ব্যস্ত রাখা : ভোরে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের দিক-নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের সব সময় নেসাবী ও নেসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে ব্যস্ত রাখা হয়।

গ. মজলিসে তাযকীর : মজলিসে তাযকীর নামে এক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, যাতে শরীয়তের আদেশসমূহের অনুসরণ এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার পাঠ দেয়া হয়।

শাস্তি নয় সংশোধন : শাস্তির বিধানকে নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। যাতে সাজা সংশোধনের পরিবর্তে দণ্ডে পরিণত না হয়।

৭. **নিয়ম-শৃংখলা :** নিয়ম-শৃংখলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ পরিবেশ কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৮. **বিনা বেতনে শিক্ষা :** দীনী ও আধুনিক শিক্ষার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের থেকে শিক্ষা, আবাসন ও থাকা খাওয়ার পরিবর্তে কোন ধরনের ফিস গ্রহণ করে না। এতদসত্ত্বেও পৃষ্ঠপোষকদেরকে প্রতিষ্ঠানের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

৯. **মেধাবী গরীব ছাত্রদের সাহায্য :** উপযুক্ত ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বিনামূল্যে দেয়া হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটির ঈর্ষনীয় সাফল্য

১. ফেডারেল বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ইসলামাবাদ এর– অধীনে ২০০০ সালের মেট্রিক পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের দুই ছাত্র হাফেজ মুহাম্মাদ জুনায়েদ ও হাফেজ মুহাম্মাদ আজম ৮৫০ নাম্বারের মধ্যে ৬৩১ ও ৬২৫ নাম্বার পেয়ে মানবিক বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

২. ফেডারেল বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ইসলামাবাদের– অধীনে ২০০১ সালের মেট্রিক পরীক্ষায় হাফেজ মুহাম্মাদ এরফান ৮৫০ নাম্বারের মধ্যে ৬৬১ নাম্বার পেয়ে মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে।

৩. ফেডারেল বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ইসলামাবাদের অধীনে ২০০২ সালের এফ. এ পরীক্ষায় হাফেজ আব্দুল বাসেত ১১০০ নাম্বারের মধ্যে ৭৫১ নাম্বার পেয়ে মানবিক বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

<u>ইদারায়ে উলূমুল ইসলামীর বার্ষিক কনভেশনে বক্তারা</u>

ওলামায়ে কেরামকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সজ্জিত হতে হবে

(বার্ষিক কনভেনশনের ওপর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট)

১৯ নভেম্বর ২০০৬ ইদারায়ে উলূমে ইসলামী'র বার্ষিক সম্মেলন, দস্তারবন্দী অনুষ্ঠান ও সনদ বিতরণ উপলক্ষে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শায়খুল হাদীস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মাদ রফী ওসমানী, মাওলানা নাঈম আশরাফ, মুফতী আবু লুবাবা, মুফতী আব্দুল হামীদ বাংলাদেশ থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ সালমানসহ দেশী বিদেশী ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখেন। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান এর– কর্ণধাররা বলেন, ওলামায়ে কেরাম ইংরেজী শিক্ষা অর্জন করবে, কিন্তু দীনী শিক্ষাকে তার উপর প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। বেফাকুল মাদারিস তাদের সিলেবাসে এস এস সি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের পরিশুদ্ধি কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। ওলামায়ে কেরাম পাকিস্তানের (স্বদেশের) চিন্তা চেতনার মুহাফেজ ও ধারক বাহক। দেশে কাউকে কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করতে দেয়া হবে না। (কথিত) নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। তা পরিবর্তনের জন্যে আমরা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলব।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা পাকিস্তানের সভাপতি **শায়খুল হাদীস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান** তাঁর ভাষণে বলেন, জাগতিক শিক্ষার চেয়ে ধর্মীয় শিক্ষার মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিক। ইদারায়ে উলূমে ইসলামী উভয় শিক্ষাকে সমন্বিত করে পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে। ওলামায়ে কেরামই প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিবেন। দীনী শিক্ষার পাশাপাশি যারা জাগতিক শিক্ষা অর্জন করেন তাদের দীনী শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। ওলামায়ে কেরাম ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী নয়। বর্তমানে দেশে এ ধরনের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। তিনি আরও বলেন, বেফাকুল মাদারিসের সিলেবাসে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যক। এখন মেট্রিক পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করা হবে।

বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী **শায়খুল হাদীস মাওলানা যাহেদ রাশেদী** তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমানে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারা এক হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় মাদরাসার সিলেবাস কিভাবে সে ধারার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে পারে? পৃথিবীতে জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যত ধরনের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় সে সবের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ ও মানুষ সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান। অথচ মাদরাসাসমূহ এলমে ওহীরই শিক্ষা দিয়ে থাকে। মাদরাসাসমূহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও এলমে ওহীর আলোকেই বিচার করে থাকে। তেমনিভাবে আধুনিক কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানই পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে ওঠে কোন কথা বলে না। অথচ মাদরাসায় যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্যেই কল্যাণকর। তিনি আরও বলেন, মাদরাসা সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানেরই পক্ষপাতী যা উদ্দেশ্যপূর্ণ, উপকারী ও জীবন যাপনের জন্যে আবশ্যক। কিন্তু জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এসব বিষয় থেকে রিক্ত-শূন্য। ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা ও জ্ঞান পৃথিবীতে আসে নি। ধর্মীয় জ্ঞানই ব্যক্তি ও সমাজের জন্য আবশ্যক। পশ্চিমারা দু'শ বছর ধরে ঐশী জ্ঞানের দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজে ফিরছে। **মুফতী আব্দুল হামীদ** বলেন, ইসলামের স্থায়িত্বের জন্যে দীনী মাদরাসা সমূহের ভূমিকা নেহায়েত জরুরী।

ঢাকার মাদরাসা দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল **মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান** তাঁর সারগর্ভ আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশে এনজিওদের বিষোদগার ও অপতৎপরতার ফলে অসংখ্য মানুষ কাফের ও মুরতাদ হচ্ছে। এই তুফানকে রুখতে এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জসমূহের যথাযথ মোকাবেলার জন্যে ওলামায়ে কেরামকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের হাতিয়ারে সজ্জিত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর মত তিনিও ২০ বছর ধরে একই পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের **মহাসচিব মুহাম্মাদ হানিফ যালান্ধরী** তাঁর বক্তব্যে বলেন, সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুসলমানদের উত্তরাধিকার। মাদরাসার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হল-ছাত্রদের দীনদার হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের দ্বীনের মুহাফেজ ও ধারক বাহক বানানো। বর্তমানে অনেক মানুষ একথা বলে যে, আমরা মৌলভীদের ইসলামকে মানি না। কিন্তু, আমরা এতটুকু অবশ্যই বলব, আমরা ইসলামের ঠিকাদার নই, মুহাফেজ তো অবশ্যই। যারা আমাদেরকে ইসলামের ঠিকাদার বলে অপবাদ দেয় তাদেরকে বলি, তোমরাও পাকিস্তানের (স্বদেশের) ঠিকাদার হয়ো না। আমরা দেশের মতাদর্শেরও মুহাফেজ। এজন্যে জরুরী হল, মুহাফেজ নিজেই যেন চোরের

ভূমিকা না নেয়, ডাকাত হিসেবে আবির্ভূত না হয়। আর যদি সে চুরি করে কিংবা লুণ্ঠন করে তবে তাকে মুহাফেজ বলা যেতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মাদরাসার একটি উদ্দেশ্য এটিও যে, কেউ যদি ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করে তবে এহেন পরিস্থিতিতে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকরা ইসলামের হেফাজতের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াবেন। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি মাদরাসার সিলেবাস ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বের করার চক্রান্ত করছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে ধর্ম কেবল গীর্জার চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ হয়ে গেছে। অপরপক্ষে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ কথিত নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল পাশ করেছে। ১৫ নভেম্বরের সে দিনটি পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো দিন। এই বিল কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী এবং তা পাকিস্তানের মতাদর্শের সাথে সাথে সরাসরি গাদ্দারীর শামিল। অধিকন্তু তা নারী জাতির সাথে জুলুমেরই নামান্তর। সরকার আলেমদের কাছ থেকে সুপারিশ নেওয়ার পরও আমাদের সুপারিশকে সেই বিলে স্থান দেয়নি। আমরা কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী এই আইনকে পরিবর্তন ও রহিত করতে বাধ্য করব। আর এজন্যে আমাদের সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। পাকিস্তানের সংবিধানে কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হতে পারে না। এটি আইনের সাথে গাদ্দারী। আমরা প্রেসিডেন্ট মুশাররফকে বলেছি, তিনি যেন আমাদের কথা কানে নেন। আমরা আলোচনার জন্যে সবসময় প্রস্তুত। এই আইনকে পরিবর্তন করতেই হবে। নতুবা জনসাধারণ এই আইনকে কোনভাবেই মেনে নিবে না। আইয়ূব খানের প্রণীত কুরআন সুন্নাহ বিরোধী পারিবারিক আইন আজও পর্যন্ত জাতি গ্রহণ করে নি। আমরাও এই বিল মেনে নেব না।

সম্মেলনের বিশেষ মেহমান পাকিস্তানের **মুফতীয়ে আজম মুফতী রফী ওসমানী** বলেন, বর্তমান সরকার বিতর্কিত হুদূদ বিল পাশ করে আল্লাহর গযবকে দাওয়াত দিয়েছে এবং কুরআন সুন্নাহর হুকুমকে পরিবর্তন করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। মাদরাসার আলেমদের করণীয় হল, তারা বর্তমান যামানার সমস্যা সংকট থেকে উত্তরণ ও নিস্কৃতির জন্য জোরদার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে পরিচালিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাতিকে সময়মত অবহিত ও সতর্ক করবে। ওলামায়ে কেরামের জন্যে আবশ্যক হল তারা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞানেও পারদর্শিতা অর্জন করবে। জ্ঞান-গভীরতা অর্জনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক চাহিদা ও করণীয় সম্পর্কে

ধারণা রাখবে। ইদারায়ে উলূমে ইসলামী উভয় ধরনের জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে। যুগের ওলামায়ে কেরাম অনেক দিন পর্যন্ত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সন্ধানে ছিলেন- যেখানে উভয় ধরনের শিক্ষা একই সাথে প্রদান করা হবে এবং দীনী শিক্ষা জাগতিক শিক্ষার উপর প্রাধান্য পাবে। তিনি বলেন, ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর প্রিন্সিপাল, শিক্ষকগণ ও ছাত্ররা মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি দান করেন। সম্মেলনের শেষে মুফতী সাহেব বিগলিত হৃদয়ে দীনী মাদরাসাসমূহের হেফাজত, কাফের ও ইসলামবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিফলতা এবং শাসক শ্রেণীকে দুশমন ও ইসলামবিরোধী শক্তির গোলামী থেকে নিস্কৃতির জন্যে দুআ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বালাকোটের পথে

✍ বেলা ১১টায় আমরা ইসলামাবাদ থেকে মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের নিজস্ব গাড়িতে বালাকোট রওয়ানা হই। আমাদের সাথে সিলেটের মাওলানা আবুল হাসান ভাইও ছিলেন। তিনি লন্ডনের মাওলানা মুশফিক সাহেবের ফুফাতো ভাই। করাচীর বিন্নুরী টাউন মাদরাসায় গত বছর ইফতা শেষ করেছেন। এবার তিনি দেশে ফিরে আসার চিন্তা করছিলেন। মাওলানা মুশফিক সাহেবের পরামর্শে তিনিও কয়েকদিন ইদারায়ে উলূমে ইসলামী দেখার জন্যে গিয়েছিলেন। যা হোক, ড্রাইভারসহ আমরা মোট চারজন। ইসলামাবাদ থেকে হাইওয়ে ধরে আমরা রওয়ানা হই। ইসলামাবাদ হতে বালাকোট প্রায় ৬ ঘন্টার রাস্তা। ইসলামাবাদের পরে হরিপুর হয়ে দ্রুতবেগে ট্যাক্সী চলতে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা কোন সিএনজি স্টেশনে ওযু-এস্তেঞ্জা এবং চা বিরতি করতাম।

ঘণ্টাখানেক পর আমরা পাঞ্জাব প্রদেশের সীমানা পার হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমানায় প্রবেশ করি। এরপর এবোটাবাদ জেলা শুরু হয়। পাঞ্জাবের প্রশস্ত রাস্তা থেকে ছোট পাহাড়ী আঁকাবাঁকা রাস্তা শুরু হয়। এরপর হাজারা, মানছেরা শহর অতিক্রম করে গাড়ি ছুটতে থাকে। আসর নামায আদায় করার পর গাড়ির গতিবেগ আরো বেড়ে যায়। সন্ধ্যার পূর্বেই বালাকোট হাযির হওয়ার খুবই চেষ্টা চলছিল। কিন্তু মানছেরা থেকে বালাকোট পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই ছিল পাহাড়ী। কখনও বহু উঁচুতে উঠতে হচ্ছিল। আবার কখনও নিচে নামতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে শরীর শিউরে উঠছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, মনোরম দৃশ্য। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে মাগরিবের নামায আমরা বালাকোট গিয়ে পড়লাম।

বালাকোটের মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলভীর কথা ছোটকালে স্কুলের ইতিহাস বইয়ে পড়েছিলাম। সে সময় হতেই এ মুজাহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষ করে আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এবং রায়বেরেলীতে হাজির হওয়ার পর শুহাদায়ে বালাকোটের যিয়ারতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লালন করতে থাকি, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ১৯৮৭

সাল থেকে পাকিস্তান সফর শুরু হলে সুযোগ আসে। কিন্তু তখনও করাচী লাহোর পর্যন্ত সফর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে ইসলামাবাদের এ সফরের শুরুতেই বালাকোট হাজির হওয়ার পাক্কা এরাদা করেছিলাম। হযরত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবকে বলেছিলাম, আপনি কোন লোক দিয়ে আমাকে বাসে বসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি একাই বালাকোট সফর করে আসবো। তিনি বলেছিলেন, 'মাওলানা তা কি হয়! আপনি আমার মেহমান। আপনাকে আমি অন্য কারো হাতে ছাড়তে পারি না।' অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে তিনি সময় দিয়েছিলেন। বালাকোটের শহীদ হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং তাঁদের জিহাদী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী র.

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত সাইয়েদ আহমাদ বেরেলভী র. ১৭৮৬ সালের নভেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলার তাকিয়া কেলার দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর জীবিকার সন্ধানে রায়বেরেলী থেকে উনপঞ্চাশ মাইল দূরে লাখনৌ গমন করেন। এরপর তিনি দিল্লী গিয়ে হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভীর খেদমতে উপস্থিত হন। শাহ সাহেব তাঁকে তাঁর ভাই শাহ আব্দুল কাদিরের নিকট সোপর্দ করেন। এই দুই মনীষীর খেদমতে থেকে সাইয়েদ সাহেব ইলমী এবং রূহানী ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেন এবং ইজাজত ও খেলাফত পেয়ে রায়বেরেলী ফিরে আসেন। সাইয়েদ সাহেব ছোটকাল থেকেই জিহাদের আবেগ ও উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। ফলে দ্বিতীয়বার দিল্লী সফরের সময় তিনি শাহ আব্দুল আজীজের পরামর্শক্রমে নওয়াব আমীর খানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যুদ্ধের বাস্তব ট্রেনিং লাভ করেন। তিনি এ সেনাবাহিনীতে দু'বছর ছিলেন। এরপর তিনি দিল্লী থেকে ফিরে আসেন এবং রায়বেরেলী, লাখনৌ ও এর আশেপাশে তাবলীগী সফর শুরু করেন।

হজ্জের সফর

১৮২১ মালে চারশত সঙ্গী-সাথী নিয়ে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এলাহাবাদ, বানারস, পাটনা, আজিমাবাদ হয়ে তিনি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা পৌঁছেন। মাওলানা শাহ ইসমাঈল এবং

মাওলানা আব্দুল হাইসহ বহু আলেম ওলামা এবং তাঁর মুরীদানসহ প্রায় ৭৭৫ জন সফর সঙ্গী নিয়ে তিনি ১৮২২ সালের ১৬ই মে জাহাজযোগে জেদ্দা পৌঁছেন এবং প্রথম হজ্জের পর দ্বিতীয় হজ্জ করে ১৮২৪ সালের ৩০ এপ্রিল রায়বেরেলীতে ফিরে আসেন। ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত এক বছর দশ মাস তিনি রায়বেরেলীতে ছিলেন। এটাই ছিল রায়বেরেলীতে তাঁর জীবনের শেষ অবস্থান।

তাবলীগী সফর শুরু

এ সময় তিনি গোটা ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজ শক্তির আবির্ভাব এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপর শিখদের অমানবিক জুলুম-নির্যাতনে ব্যথিত হন এবং দেশ ও জাতির আযাদীর জন্য হিজরত ও জিহাদের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলীকে বিদায় জানিয়ে বিরাট এক কাফেলা নিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছার জন্য তিনি রাজপুতানা, মারওয়ার, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত, গিরিপথ, বন-জঙ্গল, নদী-নালা ও জলাভূমি অতিক্রম করতে থাকেন। এসব দুর্গম পথ অতিক্রম করাও ছিল এক ধরনের জিহাদ। এ কাফেলায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের ওলামা মাশায়েখ, আমীর-ওমারা, জিহাদী জোশে উদ্দীপ্ত যুবশ্রেণীসহ বিভিন্ন স্তরের লোক ছিল।

হিজরত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

প্রথম মনযিল ছিল দালাসু, এরপর ফতেহপুর, জালুন, গোয়ালিয়ার টুংক হাজির হন। এরপর টুংক থেকে আজমীর ও পালি গিয়ে মাড়োয়ারের দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে অবশেষে সিন্ধুর হায়দারাবাদে পৌঁছেন। পথিমধ্যে হাজার হাজার নারী পুরুষ তাঁর হাতে বায়াত হন এবং বহুলোক তাঁর সাথী হন। সিন্ধু প্রদেশের যুদ্ধবাজ লড়াকু মুসলিম শাসকের বাহিনীর সবাই হযরত বেরেলভীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সকল প্রকার সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

হায়দারাবাদে এক সপ্তাহ অবস্থানের পর তিনি পীরকোট, শিকড়পুর হয়ে জিহাদের দাওয়াত দিতে দিতে ছওরভাগ এবং চাটোর পৌঁছেন। এরপর তিনি দুর্গম পাহাড়ী এলাকা বোলান গিরিপথ অতিক্রম করে কোয়েটা হয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারে পৌঁছেন। ঐ সময় আফগানিস্তানের মুসলিম শাসনকর্তাদের মধ্যে বিরাট অনৈক্য ও পারস্পরিক কোন্দল লেগেছিল। সাইয়েদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল, এসব মতানৈক্য দূর করে এদেরকে

ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্দীপ্ত করে তুলবেন। তিনি গযনী উপস্থিত হয়ে কাবুলের আমীরকে পত্র লেখেন। তাতে এখানে তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। গযনীতে তিনি সুলতান মাহমুদ গযনভীর মাজারের নিকট ছাউনী ফেলেন। এখানেও তাঁর হাতে বহু মানুষ জিহাদের বায়াত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কাবুল রওয়ানা হন এবং দেড় মাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধি ও ইসলামের প্রসারে জিহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জনমত গঠন করতে থাকেন। আফগানিস্তানে অবস্থানকালে তিনি আফগান শাসকদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে পেশোয়ারে ফিরে আসেন।

প্রথম যুদ্ধ

১২৪২ সালে পেশোয়ারের নিকট আকুড়াখটকে শিখদের সাথে এক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী জয় লাভ করে। এরপর শায়দর পাঞ্জতার মায়দার মাযার যুদ্ধে জয়ের পর তিনি সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার জয় করেন। পেশোয়ার বিজয়ের মাত্র কয়েকদিন পর কাবায়েলী সর্দার সুলতান মুহাম্মাদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং শত শত মুজাহিদকে অতর্কিতে হামলা করে শহীদ করে। সাইয়েদ সাহেব সে সময় পাঞ্জেতার অবস্থান করছিলেন। এই পাশবিক গণহত্যার পর তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন এবং সেখান থেকে হিজরত করার নিয়ত করেন। এবারের হিজরত ছিল কাশ্মীরের দিকে। অবশিষ্ট জানবাজ সাথীদের নিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ জিহাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে কাশ্মীরকে বেছে নেন।

বালাকোট

সে সময় কাগান উপত্যকার অভিজাত ও এলাকাবাসীদের শাসন কর্তৃত্ব কিছু শিখদের হামলার ফলে আর কিছু পারস্পরিক তিক্ততার কারণে নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল। তারা সবাই ছিল সাইয়েদ সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী। তাদের রাজ্যগুলো কাশ্মীর যাবার পথে পড়ে। এ এলাকাগুলোকে সাইয়েদ সাহেব নিজের সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ দ্বিতীয় দফা সেদিকেই হিজরত করছিলেন। কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল বালাকোট শহর। এটি কাগান উপত্যকার দক্ষিণমুখে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে দেখেন উপত্যকাকে পাহাড়ী প্রাচীর বন্ধ করে দিয়েছে। কুনহার নদীর উৎসমুখ ব্যতীত বালাকোট প্রবেশের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। পাহাড়ের দু'ধারী সমান্তরাল রেখা এগিয়ে গেছে। মাঝখানে উপত্যকাভূমির প্রস্ত আধা মাইলের বেশি নয়। এর মাঝখান দিয়েই কুনহার

নদী বয়ে গেছে। বালাকোটের পূর্বদিকে কালু খানের সুউচ্চ চূড়া এবং পশ্চিমে মাটিকোট পর্বত শৃঙ্গ অবস্থিত।
হিজরতের এ দ্বিতীয় সফরটিও ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, দুঃসাধ্য ও বিপদজনক। পাহাড়ের শিখরদেশ এবং উপত্যকাভূমি ছিল বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত। রাস্তা ছিল আঁকাবাঁকা ও উঁচুনিচু। রাস্তায় রসদপত্র ও মালামাল বহনের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি পাঞ্জেতার থেকে বিভিন্ন স্থান হয়ে ১৮৩১ সালের ১৭ই এপ্রিল বালাকোটে প্রবেশ করেন।

শেষ যুদ্ধ ও শাহাদাত

লাহোরের শিখ রাজা রণজিৎ সিং সাইয়েদ সাহেবের বালাকোট আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজ পুত্র রাজকুমার শেরসিংকে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে কুনহার নদীর পূর্ব তীরে বালাকোট শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে ছাউনী ফেলে। এ কথা যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে শিখ সৈন্য বাহিনী মাটিকোটের পাহাড় থেকে অবতরণ করে বালাকোটোর উপর হামলা করবে তখন কার্যকর একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন সাইয়েদ সাহেব। ১৮৩১ সালে ৬ই মে শুক্রবার দুই পাহাড়ের মাঝখানে নিচু জমিতে ধান ক্ষেতে উভয় বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এলাকাটি মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধের অনুকূলে ছিল। প্রথম দিকে মুজাহিদ বাহিনী বহু শিখ সৈন্যকে কতল করতে সমর্থ হলেও পরবর্তী সময়ে শিখ সৈন্যরা পাহাড়ের উপর অংশে চলে যায়। মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থান থাকে নিচের দিকে। যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ইত্যবসরে সাইয়েদ আহমাদ আড়ালে হারিয়ে যান। অপর দিকে মাওলানা ইসমাঈল সাহেব শহীদ হয়ে যান। বহু মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। জুমার নামাযের পূর্বেই এ ঘটনা ঘটে যায়।
বহু ওলামা-মাশায়েখ ও মুজাহিদীন এ যুদ্ধে শহীদ হন। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত। সাইয়েদ সাহেবও শহীদ হন। বালাকোটের এই শহরে ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারীর সাইয়েদ সাহেবের জিহাদী আন্দোলনের যে সফর শুরু হয়েছিল আপাতত তার পরিসমাপ্তি ঘটে। দুররানীদের বিশ্বাসঘাতকতা, বিভিন্ন কাবায়েলী সরদারদের নিমকহারামী, অবিশ্বস্ততা ও নির্মম পাশবিকতার ফলে এই আন্দোলন বাহ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলেও পরবর্তীরা এ থেকে প্রেরণা নিয়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাইয়েদ সাহেব প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে নেমেছিলেন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ন।

মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ র.

জন্ম

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল ইবনে শাহ আবদুল গণী ইবনে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ১২ রবীউস সানী ১১৯৩ মোতাবেক ২৯ এপ্রিল ১৭৭৯ সালে মুজাফফর নগর জিলার 'ফলত' নামক স্থানে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কুরআন মজীদ ভিন্ন ছরফ ও নাহুর মামুলী পাঠ্যপুস্তক নিজ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। আট বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেজ হন। ১৬ রজব ১২০৩ মোতাবেক ১২ এপ্রিল ১৭৮৯ সালে পিতা শাহ আবদুল গণী ইন্তেকাল করলে তাঁর চাচা শাহ আবদুল কাদির ইয়াতীম ভাতিজাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর শিক্ষা ও লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। অপর বর্ণনানুসারে শাহ আবদুল আযীয প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় এই ভাতিজার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

শাহ আবদুল কাদিরের নিজ জীবদ্দশাতেই তার সমুদয় সম্পত্তি শরয়ী আইন মোতাবেক একমাত্র কন্যা বিবি জয়নাব এবং আপন ভাইদের নামে ভাগ করে দিয়েছিলেন। শাহ ইসমাঈলকে নিজের ছেলের মত লালন-পালন করেছিলেন বলে কন্যা এবং ভাইদের অনুমতিক্রমে কিছু অংশ তাকেও দান করেছিলেন। পরে নিজ নাতনী বিবি কুলসুমের সাথে তাঁর বিয়ে দেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক অবস্থায় শাহ ইসমাঈল পড়াশোনার প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। শাহ আব্দুল কাদিরের খেদমতে পাঠের জন্য হাজির হলে বেপরোয়া মনোভাবের কারণে তিনি ভুলে যেতেন কোথা হতে সবক শুরু করতে হবে। কখনও পরের পাঠ আগে পড়া শুরু করলে শাহ আবদুল কাদির থামাতে গেলে কিংবা ভুল দেখিয়ে দিলে তিনি বলতেন, এর মর্মার্থ সহজ মনে করে আমি এটা পাঠ করিনি। যদি এটা কঠিনও হত তবুও তিনি এর ব্যাখ্যায় এমন বক্তব্য প্রদান করতেন যে, ছোট বড় সকলেই বিস্মিত হয়ে যেত। কখনও আগের পড়া হতে শুরু করতেন। শাহ আবদুল কাদির এ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করলে তিনি এমন সব সংশয় উত্থাপন করতেন, বিজ্ঞ উস্তাদকেও এর সমাধান দিতে বেশ হিমশিম খেতে হত।

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী হওয়ার কারণে পনের-ষোল বছর বয়সেই তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহসহ যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক

জ্ঞানের সকল শাখার পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। গোটা শহরেই ছিল তাঁর মেধা ও প্রতিভার খ্যাতি। অনেক সময় সূক্ষ্মদর্শী মনীষী পণ্ডিত পরীক্ষাচ্ছলে তাঁকে কোন কঠিন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন কিতাবের সাহায্য ছাড়াই এর এমন সব ব্যাখ্যা দিতেন যে, প্রশ্নকারীকে লজ্জিত হতে হত। তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। তিনি কঠিন ও দুরূহ বাক্য খুব তাড়াতাড়ি অনুধাবন করে এর গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন। তাঁর মেধা ও প্রতিভার কাহিনী ছিল জ্ঞানীদের প্রতিটি মাহফিলের সৌন্দর্য্যের উপকরণ।

সংস্কারমূলক কাজ

শিক্ষা শেষ করার পর শাহ ইসমাঈল সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের কাজ শুরু করে দেন। তিনি যেখানে কোন বদআকীদা ও বদআমল শ্রেণীর লোকের সংবাদ পেতেন, ওয়াজ-নসীহতের জন্য কোনরূপ লৌকিকতা ছাড়াই সেখানে চলে যেতেন। সপ্তাহে দু'দিন তথা শুক্র ও মঙ্গলবার তিনি জামে মসজিদে ওয়াজ করতেন। হাজার হাজার শ্রোতা তাঁর ওয়াজ অত্যন্ত আগ্রহভরে ও মনোযোগের সাথে শুনত। মধ্যবর্তী বিরতির সময় কিছু পথভ্রষ্ট লোক বিভিন্ন সাথীদের অন্তরে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে দিত। শাহ সাহেব পরের ওয়াজের সূচনায় ভূমিকা হিসেবে এমন কতগুলো বাক্য বলতেন যার মধ্যে প্রত্যেকের প্রতিটি সন্দেহের জওয়াব থাকত। বক্তৃতার অবস্থা এই ছিল যে, আলেম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাঁর উপদেশ হতে সমানভাবে উপকৃত হত। তাঁর ওয়াজ ও নসীহতের বরকতে সুন্নাহর সত্য ধ্বনি প্রত্যেক মানুষের কানে পৌঁছে যায়, শিরক ও বিদআতের বুনিয়াদ ধসে পড়ে, মানুষ সুন্নাতে নববী গ্রহণ এবং বিদআত পরিত্যাগের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। জামে মসজিদে জুমআর নামায আদায়ের জন্য এত অধিক সংখ্যক মুসল্লীর সমাগম হতে থাকে যেমনটি হয় ঈদগাহে দু' ঈদে। তাঁর চেষ্টায় বহু লোক হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়। শত্রুমিত্র সকলেই এর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বলেছে, ইসলামের যে ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শাহ ইসমাঈল এবং মৌলভী আবদুল হাই এর- সযত্ন প্রয়াসের ফল। এই দু'জন বুযুর্গ স্বীয় শায়খ সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. এর- উজীর ছিলেন। সত্য বলতে কি, ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করার মত এমন কর্মীপুরুষ ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে বিগত বারশত বছরে জন্মায়নি।

কিছু জীবনীকার তাঁর প্রথম দিককার ব্যায়ামের আলোচনায় বেশ অতিশয়োক্তি করেছেন। এটা সম্ভব যে, শাহ সাহেব সে সময়কার প্রচলিত প্রথা মোতাবেক সাঁতার, অশ্বারোহন, তীরন্দাযী, বন্দুক চালনা ইত্যাদি শিখেছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনার সনদ পরীক্ষাসাপেক্ষ। ঠিক তেমনই পাঞ্জাবে শিখদের অধীনে

মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য তাঁর যে ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সমসাময়িক বর্ণনায় এর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

বায়আত

১৮১৮ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী র. নওয়াব আমীর খান হতে পৃথক হয়ে দিল্লী পৌঁছে প্রথম দুই রাকাত নামায সাইয়েদ সাহেবের ইমামতিতে আদায় করে বায়আত হন। তখন হতেই সাইয়েদ সাহেবের অনুসরণ করেন দৃঢ়ভাবে, যাতে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অবিচল থাকেন এবং জীবনের অবশিষ্ট অধিকাংশ সময় সাইয়েদ সাহেবের সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। যদিও তাঁর খান্দান জনসাধারণের সম্মানিত কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর শায়খের জুতা বহনকে গর্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করতেন। সাইয়েদ সাহেবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি তাঁর সামনে স্থিরচিত্রের ন্যায় থাকতেন। কখনও কখনও রোগের আধিক্যের কারণে নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে যেত। তারপরও সাইয়েদ সাহেবের হুকুমে যে কোন কাজে অংশগ্রহণের জন্য এতটুকু ইতস্তত না করে প্রস্তুত হয়ে যেতেন।

জিহাদী আন্দোলন ও বালাকোট

সাইয়েদ সাহেব মুসলমানদের সংস্কার ও সংশোধন এবং জিহাদী সংগঠনের উদ্দেশ্যে যতগুলো সফর করেছিলেন শাহ ইসমাঈল সবক'টিতেই শরীক ছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের ইঙ্গিতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর প্রচারাভিযান শুরু করলে তাঁর বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাবে মুসলমানদের অন্তঃচক্ষু প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে। তারা চাইতে থাকে যে, তাদের মস্তক আল্লাহর রাহে কুরবানী হোক এবং দীনে মুহাম্মাদী সা. এর– পতাকার সমুন্নতির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গিত হোক।

সাইয়েদ সাহেব বিধবা বিবাহের পুনঃপ্রচলন করলে শাহ ইসমাঈলের বিধবা বোনের, যিনি বয়সে বড় এবং যৌবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন, বিবাহ সুন্নাত পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে মৌলভী আবদুল হাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তিনি হজ্জ সফরে (১২৩৬-১২৩৯ পর্যন্ত) মাতা ও ভগ্নিসহ সাইয়েদ সাহেবের সাথে ছিলেন। তাঁর মাতা মক্কা মুকাররমায় ইন্তেকাল করেন। সাইয়েদ সাহেব জুমাদাল আখিরা ১২৪১ হিজরীতে জিহাদের উদ্দেশ্যে দারুল হরব ভারতবর্ষ হতে হিজরত করলে শাহ সাহেব মুহাজির ও মুজাহিদীনের প্রথম কাফেলায় শরীক ছিলেন।

সীমান্তে অবস্থানকালীন ওয়াজ ও আলোচনা, দাওয়াত ও প্রচার, প্রতিরক্ষা ও অগ্রাভিযান, কৌশল গ্রহণ ও রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত কাজে তিনি সকলের আগে থাকেন। যে সমস্ত কাজে শাহ ইসমাঈল শহীদ বিশিষ্টতা লাভ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-

১. হন্ড নামক স্থানে ইমামাত ও জিহাদ বিষয়ে সীমান্তের ওলামায়ে কেরাম ও খানদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সকল আলোচনা শাহ্ সাহেবই করেছিলেন।

২. শায়দু যুদ্ধে সাইয়েদ সাহেবের পীড়ার কারণে তিনি তাঁর সাথে হাতির পিঠে সওয়ার ছিলেন। দুররানীগণের পলায়নের পর শিখেরা সাইয়েদ সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করলে শাহ্ সাহেব যুদ্ধের ময়দান হতে হাতি বের করে সাইয়েদ সাহেবকে ঘোড়ার পিঠে আরোহন করান এবং একটি জামাআতসহ পাঠিয়ে দেন। অতঃপর শিখ বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন হতে বিরত রাখার জন্য তিনি নিজে হাতির পিঠে সওয়ার থাকেন এবং পরে সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হন।

৩. হাযারাতে জিহাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনিই সম্পন্ন করেন।

৪. শিনকিয়ারী যুদ্ধে তিনি স্বল্প সংখ্যক সাথী নিয়ে শিখদের বিরাট দলকে পর্যুদস্ত করে তাড়িয়ে দেন। শাহ সাহেবের কাবা (লম্বা জামা) শত্রুর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে মারাত্মক যখম হয়। শাহ্ সাহেব ঠাট্টা করে তাঁর এই কনিষ্ঠাঙ্গুলকে শাহাদাত আঙ্গুল বলতেন।

৫. শাহ্ সাহেবই শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠার বায়আতের জন্য আড়াই হাজার ওলামা ও খানকে ঐক্যমত্য অবলম্বনে সম্মত করিয়েছিলেন।

৬. স্বল্প সংখ্যক গাযী সমভিব্যাহারে তিনি হন্ড এর– সুদৃঢ় দুর্গ দখল করে নেন এবং এতে শত্রুপক্ষ হতে কেবল দুটি জীবন নষ্ট হয়।

৭. যায়দাহ নামক স্থানে শুধু সাতশত গাযী (তিনশ হিন্দুস্তানী চারশ দেশীয়) সহ ইয়ার মুহাম্মাদ খানের দশ হাজার সৈন্য এবং সাতটি কামানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে মাত্র দু'জন শহীদ হন।

৮. পাইন্দাহ খান তানুলীকে পরাজিত করে আম্ব ও আশারাহ্ দখল করেন।

৯. মায়ার যুদ্ধে তিন হাজার গাযী সমভিব্যহারে, যাদের অধিকাংশই ছিল দেশীয়, আট হাজার দুররানীকে পরাজিত ও পরাভূত করেন।

১০. পেশওয়ার বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ দুররানীর সহিত অনুষ্ঠিত সন্ধি আলোচনায় সাইয়েদ সাহেব শাহ্ সাহেবকেই মালিক মুখতার বানিয়ে ছিলেন।

২৪ জিলকদ ১২৪৬ মোতাবেক ১৮৩১ সালে শাহ্ সাহেব বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন। শেষ মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে কথিত আছে যে, মাথা ও কানের অংশবিশেষে গুলির হালকা যখম ছিল। দাড়ি রক্তে ভিজে গিয়েছিল। মাথা ছিল উন্মুক্ত। গুলিভর্তি বন্দুক কাঁধের উপর ছিল এবং খোলা তরবারী ছিল হাতে। একটি ভিড়ের ভিতর তিনি ঢুকে পড়েন। অতঃপর কেউ আর তাকে জীবিত দেখেনি। যুদ্ধের পর তাঁর লাশ সাইয়েদ সাহেবের

শাহাদাত গাহ হতে প্রায় আধামাইল দূরে কাসবা-ই বালাকোটের উত্তরে সিতবেনে নালার ধারে পাওয়া যায়। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর ইলমের গৌরব ও মহিমার শান ছিল এই যে, শাহ আব্দুল আযীয র. এক পত্রে তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম লিখেন। একবার বলেন, যারা আমার যৌবনকালের ইলম তথা বিদ্যাবত্তা দেখেছে তারা তাঁর নমুনা দেখতে চাইলে ইসমাঈলকে দেখুক। শাহ ইসমাঈল এবং শাহ ইসহাক (শাহ আবদুল আযীযের নাতী) কে আল্লাহর বিশেষ দান হিসেবে অভিহিত করত তিনি এই পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করতেন-

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل و اسحق

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। (১৪ ঃ ৩৯)

তাঁর যুগে তিনিই সর্বাধিক তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, সত্য সুন্দর ধর্ম তথা দীন-ই হক -এ সর্বাধিক দৃঢ় বিশ্বাসী এবং সুন্নাহর সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষক ছিলেন। দীনের খেদমতে তাঁর নিমগ্নতা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, খাবার এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি কখনও ভ্রুক্ষেপ করেননি। হজ্জ সফরে কলকাতা পৌঁছলে কোম্পানীর উকীল মুনশী আমীনুদ্দীন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সে সময় তাঁর পোশাক এতই সাধারণ ছিল যে, মুনশী সাহেব বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, বিখ্যাত মাওলানা শাহ ইসমাঈল ইনিই।

কুরআন মাজীদ ভিন্ন কখনও কোন গ্রন্থ তিনি কাছে রাখেননি। ওলামায়ে কেরাম মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করতে আসলে ঘোড়ার গা মর্দন করতে করতে এতটুকু ইতস্তত কিংবা বিলম্ব না করে জওয়াব দিতেন। প্রতিটি মাসআলাকে আয়াতে পাক এবং হাদীসের সাহায্যে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেন। ফিকহের খুঁটিনাটি বিষয় এমন পদ্ধতিতে পেশ করতেন যে, প্রসিদ্ধ ও নামকরা ফকীহ পর্যন্ত তা শুনে হতবাক হয়ে যেত।

সাইয়েদ সাহেব আরোহণের জন্য তাঁকে একটি ঘোড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভ্যাস ছিল তিনি নিজে পায়ে হেঁটে চলতেম এবং ঘোড়ার উপর অন্য কাউকে আরোহণ করাতেন। নিয়ত থাকত, আল্লাহর কাজে শরীরকে যতখানি কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, সওয়াব ততখানিই। আমলের ক্ষেত্রে সর্বদাই সর্বোচ্চ নমুনা পেশ করতেন। যদিও তার শরীর কমজোর ছিল, তবুও একবার কিছু সাথীসহ একটি ভারী ছোট কামান উঠান এবং তাঁর কাঁধে তুলে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কামানটি কাঁধে দিতেই তাঁর পা টলমল করতে থাকে। পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে কয়েক কদম চলার পর হাঁপিয়ে গেলে তিনি কোন পাথরের উপর বসে ওয়াজ শুরু করে দিতেন এবং সত্যের

রাস্তায় কষ্ট ও পরিশ্রমের ফযীলত বয়ান করতেন। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসলে পুনরায় উপরে উঠতে শুরু করতেন।

একবার বালাকোটে নামায পড়াতে গিয়ে দু'রাকাতে সূরা বনী ইসরাঈল সম্পূর্ণ পড়েন। সাইয়েদ যাফর আলী নাকবী লিখেছেন, উক্ত নামাযে যে স্বাদ ও আনন্দ পেয়েছিলাম সারা জীবন আর কোন নামাযে কোন ইমামের পিছনে তা পাইনি। সাইয়েদ সাহেবের প্রতি যদিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন, কিন্তু শরয়ী এবং জামাআতী ব্যাপারে তিনি স্বীয় মতামত এত নির্ভীকভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করতেন যে, স্বয়ং সাইয়েদ সাহেব একবার স্বীকার করেন যে, সত্য বিষয় প্রকাশে এতখানি নির্ভীকতা আমি আমার ভাতিজা সাইয়েদ আহমদ আলী ব্যতীত অপর কারো মধ্যে দেখিনি।

সুন্দর হাতের লেখার চর্চা তাঁর ছিল না। একবার দিল্লীর প্রসিদ্ধ হস্তলিপিকর পীর পাঞ্জাকাশ জিজ্ঞেস করেন, সুন্দর হাতের লেখা লিখতে কেন শিখলে না? তিনি বললেন, অপরের লেখা বুঝতে পারলেই যথেষ্ট, বাকীটুকু অনর্থক। শাহ মুহাম্মাদ ওমর নামে তাঁর একমাত্র পুত্র ছিল, যিনি মাজযুব অবস্থায় জীবন কাটান এবং ১৮৫১-৫২ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

মোটকথা, শাহ ইসমাঈল র. স্বীয় কামালিয়াতের কারণে মহান আল্লাহর কুদরতের একটি নমুনা ছিলেন।

রচনাবলী

সাইয়েদ সাহেবের সাথে সম্পর্কিত হবার পর শাহ ইসমাঈলের জীবন জনগণের সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শন এবং দাওয়াত ও জিহাদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায় এবং পুস্তক রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নের সুযোগ খুব কমই পান। এরপরও তাঁর রচনাসমূহ বিখ্যাত আলেমগণের তুলনায় সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ -

১. **রাদ্দুল ইশরাক** : এটি শিরক ও শরয়ী দিক দিয়ে সমর্থন যোগ্য নয় এমন সব রসম প্রত্যাখ্যানে আয়াতে কারীমা ও হাদীসে পাকের সংকলন। এর দু'টি অধ্যায়। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এটা একবার কাতফুছ ছামারাসহ প্রকাশ করেছিলেন এবং হাদীসসমূহ খুঁজে বের করে এর নাম রাখেন, আল ইদরাক বি তখরীজ আহাদীস রাদ্দিল ইশরাক।

২. **তাকবিয়াতুল ঈমান** : ঐ সমস্ত আয়াতে ও আহাদীসের প্রথমভাগে বিশ্লেষণমূলক উর্দূ তরজমা যা রাদ্দুল ইশরাক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি লক্ষাধিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর কতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা গণনাতীত। প্রথমবার মতবা দারুল ইসলাম, দিল্লী ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে করেছিল। এর ইংরেজী তরজমা

মৌলভী শাহাদাত আলী সম্ভবতঃ ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। রাদ্দুল ইশরাক এর দ্বিতীয় অংশের বিশ্লেষণমূলক উর্দূ তরজমা; মৌলভী মুহাম্মাদ সুলতান তাযকীরুল ইখওয়ান নামে ছাপিয়েছিলেন।

৩. **মানসাবে ইমামাত** : ইমামতের মাসআলা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক গবেষণাধর্মী পুস্তিকা। এটা মাত্র একবার ছাপা হয়। এর উর্দূ তরজমাও প্রকাশিত হয়।

৪. **ইদাহুল হক আস-সারীহ ফী আহকামিল মায়্যিত ওয়াদ দারীহ** : এটা প্রথমবার মাতবা ফারুকী ১২৯৭ হিজরীতে উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করেছিল। কিছু প্রখ্যাত আলেমের অভিমত এই যে, বিদআত প্রত্যাখ্যানে এর তুলনায় উত্তম কোন গ্রন্থ লিখিত হয়নি। গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার ১৩০৬ হিজরীতে কুতুবখানাহ আশরাফিয়া, দিল্লী নতুন উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করে।

৫. **রিসালা ইয়াক রোযী :** তাকবিয়াতুল ঈমান এর ওপর মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। শাহ সাহেব এক বৈঠকে তার উত্তর প্রণয়ন করেন। ১৫ জিলহজ্জ ১২৪১ হিজরীতে যখন শাহ সাহেব জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরতসূত্রে শিকারপুর পৌঁছেন তখন এটি আলোর মুখ দেখে। এই রিসালাটি ঈযাহুল হক; ১ম সংস্করণের সাথে প্রকাশিত হয়েছিল।

৬. **রিসালা উসূলে ফিকাহ।**

৭. **তানবীরুল আয়নাইন ফী ইছাবাতি রফয়ে ইয়াদাইন** : পুস্তকটির নামকরণের মধ্যেই এর প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। এতে সেই সমস্ত হাদীস সংকলিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা রা'ফে ইয়াদাইন অর্থাৎ নামাযে কান পর্যন্ত হাত উঠানো সমর্থিত হয়। এটি কয়েকবার উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. **তানকীদুল জাওয়াব দর ইছবাতে রফয়ে ইয়াদাইন :** ইতহাফুন নুবালা গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। নামেই গ্রন্থের পরিচয় বিধৃত।

৯. **আবাকাত** এতে তাসাওফের বিষয়বস্তু ব্যক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র একবারই ছাপা হয়েছে। বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্য।

১০. **সিরাতে মুস্তাকীম** : গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সাইয়েদ আহমাদ শহীদের। শুধু প্রথম অধ্যায় শাহ ইসমাঈল শহীদ প্রণয়ন করেছিলেন।

১১. **রিসালায়ে মানতিক** : স্যার সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর আসারুস সানাদীদ গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

১২. **মাছনাবী সিলকে নূর :** এটি ছাপা হয়েছে।

এছাড়াও রাসূল সা. এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শাহ সাহেবের– একটি লম্বা প্রশংসাসূচক কাসীদা এবং একটি কাসীদা সাইয়েদ আহমদ শহীদের প্রশংসায়

বর্তমান; যেগুলো বিক্ষিপ্ত কবিতাগুচ্ছ কয়েকটি গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। খুতবা এবং বিতর্কের সীমা সংখ্যা নেই। জিহাদের ফযীলত বিষয়ে কতগুলো খুতবা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান একটি খুতবাঃ সংকলনে প্রকাশ করেছিলেন। নওয়াব মরহুমের ওপর যখন ইংরেজদের আক্রোশ নেমে আসে তখন এই খুতবা সংকলনটি বিনষ্ট করে দেয়া হয়। শাহ সাহেবের কতিপয় চিঠিও বর্তমান রয়েছে। সাইয়েদ সাহেবের সমস্ত পত্র এবং ঘোষণা বিষয়ক সকল কিছুই শাহ সাহেবের লিখিত, যদিও তার বিষয়বস্তু সাইয়েদ সাহেবই বলে দিতেন।

✍ পথিমধ্যে মানছেরা শহর থেকে মাওলান ফয়যুর রহমান সাহেবের এক বন্ধু; যার বাসা ছিল বালাকোটে, তাঁকে আমরা আমাদের সাথে নিই। আমরা যখন বালাকোটে প্রবেশ করি তখন দেখতে পাই যে, ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবরের ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এনজিওরা নতুন নতুন ঘর তুলে দিয়েছে। বালাকোটের প্রায় সব বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। দেখলাম, নিউ বালাকোট নামে পুরাতন বালাকোটের পূর্ব দিকে নতুন শহর তৈরি হচ্ছে।

সাইয়েদ সাহেব বালাকোটের যে টিলার উপরের মসজিদে নামায পড়তেন আমরা সে মসজিদেই মাগরিবের নামায পড়লাম। প্রচণ্ড শীত শুরু হয়েছিল। এ টিলার নিচেই ধানক্ষেতে শিখ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছিল। টিলা থেকে অপর দিকের পাহাড় যেখানে শিখ সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল তা পরিষ্কারভাবেই দেখা যায়। যুদ্ধকৌশল এমনভাবে নেয়া হয়েছিল যে পাহাড় থেকে শিখ সৈন্যরা নেমে যখন ধান ক্ষেতে আসবে তখনই মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধ শুরু করবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে মুষ্টিমেয় কিছু শিখ সৈন্য নিচে নামতেই জিহাদী জযবায় বিভোর মুজাহিদ বাহিনী টিলা থেকে নেমে এসে যুদ্ধ শুরু করলে শিখ বাহিনী পাহাড়ে চড়ে গিয়ে মুজাহিদদের নিচু ভূমিতে পেয়ে যুদ্ধে সুবিধা পেয়ে যায়। মুজাহিদ ছিল মাত্র সাত-আটশত। অপরপক্ষে শিখ সৈন্য ছিল সাত হাজার। যা হোক, আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা তাই হয়েছিল বালাকোটে। এ যুদ্ধেও মুসলমানদের একদল বিশ্বাসঘাতক শিখদের পথ দেখিয়ে বালাকোটে এনেছিল।

এরপর আমরা হযরত সাইয়েদ সাহেবের ডানহাত হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদের মাজারে যাই। মাজারটি কুনহার নদীর পাশে অবস্থিত। বিগত ভূমিকম্পে মাজারের বেশ কিছু শহীদের কবর নদীর স্রোতে ভেসে যায়। মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব বললেন, তিনি চেষ্টা করে করাচীর আর- রশীদ ট্রাস্টের সহযোগিতায় কবরটি প্রায় ৩০/৪০ ফুঁট নিচ থেকে ঢালাই করে প্রাচীর তৈরি করে নদী ভাঙ্গন থেকে হেফাযত করেছেন। শাহ সাহেবের সাথে এখনও প্রায় ১৫/২০ জনের কবর রক্ষিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পেশোয়ারের পথে আকুড়াখটক

✍ এরপর রাত ৮টার দিকে আমরা প্রায় ২ ঘণ্টা সফর করে মানছেরা শহরে ফিরে আসি। মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের এক আত্মীয়ের বাসায় বালাকোট যাওয়ার পথে দুপুরে আমাদের দাওয়াত ছিল, কিন্তু দুপুরে দাওয়াত খেলে আমরা মাগরিবের পূর্বে বালাকোট হাজির হতে পারব না বুঝতে পেরে রাস্তায় হালকা কিছু খেয়ে নিই। সোজা বালাকোটে চলে যাই। রাত দশটার দিকে আমরা ঐ বাসায় পৌঁছি। মেজবান খুবই খেদমত করেন। গরম পানি এবং ঘর গরম করার ব্যবস্থা ছিল। হরেক রকমের খানার মাধ্যমে তিনি আমাদের আপ্যায়ন করেন। পাঠানরা মেহমানদারীতে খুবই পাকা তা পূর্বে বইপত্রে পড়লেও এবারে বাস্তবেও তা উপলব্ধি করার সুযোগ হয়। এখানেই এশার নামায পড়ে খানা খেয়ে শুয়ে পড়ি। ভোরে ফজরের নামায পড়ে একটু আরাম করে মজাদার নাস্তা করি। এরপর আমরা মানছেরা শহরের নায়েম মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের অফিসে চলে যাই। সীমান্ত প্রদেশে বিখ্যাত আলেম এবং রাজনীতিবিদ মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেবের পার্টি ক্ষমতায় থাকার কারণে আলেম ওলামারা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের ইস্তেকবাল করেন। বেলা দশটার দিকে আমরা মুফতী সাহেবের কামরায় চা পান করি। অনেক আলাপ আলোচনা হল। এরপর মেহমান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পেশোয়ারের পথে গাড়ি ছেড়ে দেই।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল পেশোয়ারের দিকে আকুড়াখটকের বিখ্যাত শায়খ এবং বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম হাক্কানিয়া। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। বহু বছরের স্বপ্ন ছিল হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের বড় ছেলে বিখ্যাত আলেমে দীন, রাজনীতিবিদ, কলামিস্ট, সিনেটর মাওলানা সামিউল হক সাহেব এবং দারুল উলূম হাক্কানিয়া দেখার। দারুল উলূম হাক্কানিয়া পাকিস্তানের অন্যতম মাদরাসা এবং সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার শহরের নিকটে অবস্থিত।

পেশোয়ার পরিচিতি

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটক এই পেশোয়ার শহরকে বিভিন্ন নামে স্মরণ করেছেন। কেউ ফোলিউশা, কেউ পিরশাওয়ার, কেউ পোলোশা পোলো

বলেছেন। মুগল বাদশাহ বাবরের সময় হতে একে পেশ আওয়ার ও পেশাহওয়ার বলে উল্লেখ করা হতে থাকে।

ভূগোল

মানচিত্রে পেশোয়ার ৭১ ডিগ্রী ২৫ মি. এবং ৭২ ডিগ্রী ১৫ মিটার অক্ষাংশ পূর্বে এবং ৩৩ ডিগ্রী ৪০ মি. ও ৩৪ ডিগ্রী ২৫ মি. দ্রাঘিমাংশ উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে মার্দার জেলা ও প্রায় ত্রিশ মাইল নিচে সিন্ধু নদ আটক জেলা হতে একে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নীলাবগাশে পর্বত একে কোহাট জেলা হতে পৃথক করেছে। দক্ষিণে হাসান খায়ল আফরীদী ও মূলাগূরী অবস্থিত। উত্তরে ও কাবুল নদীর এই পারে মাহমানদ গোত্রসমূহ এক পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত; এর সীমা সোয়াত নদীর তীর পর্যন্ত। এটি প্রাকৃতিকভাবে চতুর্দিক হতে পর্বতশ্রেণী ও ছোট ছোট পাহাড়ের এক গোলচক্র দ্বারা বেষ্টিত। কেবল পূর্বদিকে সামান্য উন্মুক্ত এলাকা। এর মাঝে কাবুল নদী, যা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। উপত্যকার ভূমি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক হতে নদীর দিকে ঢালু, যে কারণে অত্র অঞ্চলের পানি কাবুল নদীর দিকে ধাবিত হয়।

এই এলাকার সাধারণ দৃশ্য মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। এর স্থানে স্থানে ঝর্ণা, নহর, নালা ও নদী প্রবাহিত হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় সব মৌসুমেই সবুজে আচ্ছাদিত থাকে। কোন কোন অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম উঁচু উঁচু গাছে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কোথাও ফলবান গাছের বড় বড় বাগান এবং কোথাও জোয়ার, আখ ইত্যাদির বিস্তৃত বাগান কিংবা গম, যব ও ধানের শ্যামল ফসল দেখা যায়। হাশতনগর ও ইউসুফ যাঈ'র সমতল কৃষিভূমিতে নালার সাহায্যে পানির সেচ দেয়া হয়। খাটকদের দক্ষিণাঞ্চল শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিবিশিষ্ট।

আয়তন

পেশোয়ার জেলার মোট আয়তন ১,৬৬৪ বর্গমাইল এবং পেশোয়ার শহর ও সেনানিবাস উভয়ের সামষ্টিক আয়তন প্রায় ৯ বর্গমাইল।

আবহাওয়া ও মৌসুমী অবস্থা

পেশোয়ার এমন একটি স্থান, যেখানে প্রায় আট-নয় মাস আবহাওয়া মনোরম, আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর থাকে। অবশ্য গ্রীষ্মের তিন মাস উষ্ণতা গ্রীষ্মমণ্ডলী কোন কোন অঞ্চলের চাইতেও বৃদ্ধি পায়। মধ্য মে হতে মধ্য জুলাই পর্যন্ত উষ্ণতার পরিমাণ সমতল অঞ্চলগুলোতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, শুষ্ক গরম পড়ে, তীব্র লু হাওয়া চলে। এই উষ্ণতা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অতঃপর মধ্য জুলাই হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উষ্ণতা সামান্য কম কিন্তু বেশি আর্দ্র হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতার পরিমাণ সাধারণত ১১৬ ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং জানুয়ারীতে ২৬ ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে আসে।

নদী

কাবুল নদী আফগানিস্তান হতে প্রবাহিত হয়ে মাহমানদের পার্বত্য এলাকা হয়ে ওয়ারসাকে নামক স্থানে পেশোয়ার উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। এখান হতে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে মীচনী নামক স্থানে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে উচ্চ শাখাকে আদে যাঈ, মধ্য শাখাকে নাগুমান ও নিম্ন শাখাকে শাহ আলাম বলা হয়। এই তিনটি নদীই প্রায় বার মাইল সামনে অগ্রসর হয়ে নীসাতাহ নামক স্থানের নিকটে পুনরায় মিলিত হয়েছে। এই স্থানেই উত্তরাঞ্চল হয়ে সোয়াত নদী এবং আফরীদীদের তীরাহ অঞ্চল হতে বাহির হয়ে বাড়া নদী ও উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল হয়ে এর সাথে মিলিত হয়। এখান হতে কাবুল নদীকে দরিয়ায়ে লুণ্ডা বলা হয়। এটা জেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতঃ ত্রিশ মাইল সামনে গিয়ে আটক নামক স্থানে সিন্ধু নদে মিলিত হয়েছে।

নহর

পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নহর বা খালও রয়েছে। ১. নাহরে লোয়ার সোয়াত, সোয়াত নদী হতে আবাযাঈ স্থানে কাটা হয়েছে। এই নহর হতে তাহসীলে চারসিদাহর ভূমিতে পানি সেচ হয়। ২. নাহরে কাবুল, এই নহরটি কাবুল নদী হতে মীচনীর নিকটে কাটা হয়েছে। এটা হতে তাহসীলে পেশোয়ারের অধিকাংশ এলাকায় পানি সেচ হয়। ৩. নাহরে ওয়ারসাক, এটি একটি নতুন খাল। এ নহর ওয়ারসাক কাবুল নদী হতে বের করা হয়েছে। এটা হতে খাজুরী, খলীল, মাহমানদদের নিম্ন এলাকায় পানি সেচ হয়। নলকূপের সাহায্যেও কোন কোন স্থানে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাহাড়

জেলার সীমার মধ্যে উচু পাহাড় খাটকদের অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলোর মধ্যে চিরাত ও নীলাব পাশের উচ্চতা ৩,০০০ হতে ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত। জালালাসার পাহাড়ের চূঁড়া সবচেয়ে উঁচু। এর উচ্চতা ৫.০৩৬ ফুট এবং তুরূসার পাহাড়ের উচ্চতা ৪,৭৩৬ ফুট।

ভূমি

এই অঞ্চলের ভূমির বিরাট অংশের মাটিই উন্নত মানের। এর রং হালকা গেরুয়া। কোথাও কোথাও ঈষৎ কালো ও ঈষৎ সাদাও দেখা যায়। কিন্তু সকল জায়গার মাটিই শস্য উৎপাদনের উপযোগী। পেশোয়ার জেলার কৃষি জমির মোট পরিমাণ ৩,১১,০০০ একর।

প্রাকৃতিক সম্পদ

পেশোয়ারের পাহাড় প্রায় শুষ্ক। এতে কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঝোপঝাড় দেখা যায়, যা শুধু জ্বলানির কাজে লাগে। খাটকদের দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়গুলোর

কোন কোন স্থানে প্রয়োজনীয় কাঠের গাছ পাওয়া যায়। যেমন যায়তুন ও বাবলা গাছ। এই পাহাড়গুলোতে ফিটকিরি ও পাথুরে কয়লাও পাওয়া যায়, কিন্তু তা পরিমাণে কম। সমতল শুষ্ক অঞ্চলে যাগ, মাঙ্গী, বরই ও বাবলা এবং আদ্র অঞ্চলে শীশাস, তুত ও বাকাইন বৃক্ষ জন্মে। পেশোয়ার জেলায় বনজঙ্গলের মোট পরিমাণ ১৯,৬৮৬ একর। এছাড়া এক পরিকল্পনার অধীনে ওয়ারসাক পাহাড়সমূহে প্রায় দুই হাজার একর জমিতে নতুন গাছ লাগানো হয়েছে।

কৃষিদ্রব্য

ফসলের মধ্যে বিশেষত গম, জোয়ার, আখ এবং সাধারণত ধান, ডাল, সরিষা, মরিচ, তামা ও কার্পাস উৎপন্ন হয়। আখের অধিকাংশই তাহসীলে চারসিদায় উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা চিনি ব্যতীত গুড়ও তৈরি হয়, যা পেশোয়ারী গুড় নামে দূর-দূরান্তে পাঠানো হয়।

ভাষা

পেশোয়ার জিলায় বিশেষত গ্রামীণ লোকদের শতকরা ৯০ জনের মাতৃভাষা পশতু। অবশিষ্ট দশজনের মধ্যে হিন্দী, পেশোয়ারী, পাঞ্জারী, লুহান্দ, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় কথা বলে।

শিক্ষা

শিক্ষার দিক হতে পেশোয়ার শহর ও সেনানিবাস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমস্ত শহর হতে অধিক উন্নত। পেশোয়ার ও পেশোয়ার জেলার জন্য মঞ্জুরীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ- ১. বিশ্ববিদ্যালয়, ২. আর্ট এন্ড সায়েন্স কলেজ, ৩. ল' কলেজ, ৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ৫. খাইবার মেডিক্যাল কলেজ, ৬. ইঞ্জিয়ারিং কলেজ, ৭. এগ্রিকালচারাল কলেজ, ৮. কর্মাস কলেজ, ৯. ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ১০, হোম ইকোনমিকস কলেজ, ১১. উচ্চ বিদ্যালয়, ১২. মডেল কলেজ, ১৩. প্রাইমারী স্কুল, ১৪, নরমাল ট্রেনিং কলেজ, ১৫. টেকনিক্যাল স্কুল, ১৬. পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ১৭. কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট।

যোগাযোগ

পেশোয়ার জেলার পাকা রাস্তা ২৮২ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা ১৭২ মাইল। পুরো জেলায় উত্তম রাস্তার জাল বিস্তার করে আছে। এছাড়া পেশোয়ার হতে রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, নাওমিহরাহ চিরাট, সাওয়াবী, মার্দান, বুনায়র, সোয়াত, দীর, চারসিদাহ, ওয়ারসাক, বাড়া, ল্যন্ডিকোটাল, কাবুল, কোহাট, বানূন ও প্যারাহ চিনারের সাথে রাজপথের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এ সকল জনপথে সরকারী ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস রীতিমত চলাচল করে। লাহোর, করাচী প্রভৃতি শহরের সাথে পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন রেলপথের মাধ্যমে পেশোয়ার সরাসরি সংযুক্ত। অভ্যন্তরীণ রেল সড়কও যথেষ্ট উন্নত।

পেশোয়ার হতে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স সার্ভিসের মাধ্যমে চিত্রাল, কাবুল, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর ও করাচী ভ্রমণ করা যায়।

হাসপাতাল

শহর ও সেনানিবাসে একাধিক মহিলা ও পুরুষ, সিভিল ও সামরিক হাসপাতাল রয়েছে।

শিল্প কারখানা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে পেশওয়ার জেলায় শিল্প কারখানা ছিল নামে মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পেশোয়ার জেলায় অতি দ্রুত অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। এখন গোটা জেলায় আঠারটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা রয়েছে। এদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হল সূতী কাপড়, সিগারেট, ফল সংরক্ষণ, চিনি, কাগজ, পিচবোর্ড, কস্টিক সোডা, গ্লুক্সেজ ও ঔষধের কারখানা। লৌহ ও অস্ত্র কারখানও উল্লেখযোগ্য।

হস্তশিল্প

এতে সন্দেহ নেই যে, বিগত বিশ-পঁচিশ বছর বড় বড় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার দরুণ হস্তশিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তারপরও উন্নতমানের লুঙ্গি, চাদর ও কম্বল প্রস্তুত হচ্ছে। টুপি ও জুতার উপর উন্নত মানের এমব্রয়ডারী কাজের জন্যও এই এলাকা প্রসিদ্ধ। এছাড়া চপ্পল, জুতা, কার্পেট, গালিচা ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। শহরে তামার বিভিন্ন প্রকার উন্নত মানের সাদা ও ফুলদার পাত্র, মাটির পাকা তৈলাক্ত চিকন ফুলদার ও রঙ্গীন পাত্রও তৈরি হয়।

প্রশাসন

পেশোয়ার ডিভিশনের জন্য একজন ডিভিশনাল কমিশনার নিযুক্ত রয়েছেন এবং সাধারণভাবে পেশোয়ার জেলার ব্যবস্থাপনা একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীন রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পেশোয়ার সেই প্রদেশের রাজধানী।

পেশোয়ার শহর

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এই শহর পুরাতন ইটের তৈরি ভারি দেয়ালের মধ্যে বেষ্টিত ছিল। এর চারদিকে বাইরে যাওয়ার জন্য বারটি বড় এবং চারটি ছোট গেট ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যার বহু বিস্তৃতি ও উন্নয়ন ঘটে। আশপাশে শহর সংলগ্ন এলাকায় বহু নতুন বসতি গড়ে উঠে। এই সকল এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন রীতি ও নমুনার ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। তাই এগুলি মূল শহরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য চারদিক হতে দেয়ালের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এবং কয়েকটি গেট সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন-

বাজুড়ী, কাবূলী, কাছারী ও হাশতগরী গেট। শহরের ভেতরের দৃশ্য প্রাচীন কাঠামোবিশিষ্ট শহরগুলোর মত। বাড়ীগুলো অধিকাংশ দোতলা, তিনতলা ও চারতলা বিশিষ্ট। অধিকাংশ বাড়ীই পাকা ইটের তৈরি। পেশোয়ার শহরে বহু মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের আমলেরও কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদ রয়েছে। সবচেয়ে বড় মসজিদ হচ্ছে মহব্বত খান মসজিদ, গঞ্জ আলী মসজিদ, দিলাওয়ার খান মসজিদ, খাজা মারূফ মসজিদ ও মসজিদে কাসিম খান।

দর্শনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

পেশোয়ার জেলায় বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কিল্লায়ে বালা হিসার, মসজিদে মহব্বত খান, ওয়াযীর বাগ এবং সেনানিবাসে কোম্পানী বাগ, আজাইব ঘর, এসেম্বলী হল ও মিউনিসিপ্যাল হল। আর শহরের বাইরে ইসলামিয়া কলেজের সুদর্শন বিরাট অট্টালিকা যা খাইবার পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এবং যা সমকালীন চীফ কমিশনার স্যার জর্জরুস ক্যালব ও নওয়াব স্যার সাহেবজাদা আব্দুল কাইয়ুম খানের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন এখানেই পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ারসাকে পানি বিদ্যুৎ ঘর, খাইবার গিরিপথ, কোহাট গিরিপথ ও প্রাচীন নিদর্শনসমূহের স্থান পাঞ্জ তিথি, শাহজী কী ঢেরী ও গোরকাটারী দর্শনযোগ্য।

পাঠানদের পরিচিতি

বীর জাতি বলে পাঠানদের খ্যাতি রয়েছে। বন্দুক কাঁধে নিয়েই মাতৃজঠর থেকে তারা ভূমিষ্ঠ। পিস্তল আর রাইফেল হয় শৈশবে খেলার উপকরণ। পর্বতের গুহায় যাদের বয়োবৃদ্ধি, বন্দুক খেলায় যাদের জীবন সমাপ্তি, তাদের জীবন আর শষ্য-শ্যামল সমতল ভূমিতে সীমান্তের কৌতূহলী পর্যটকদের।
সীমান্তের এ অঞ্চলটি কতবার যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার সঠিক হিসাব রক্ষিত হয়নি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ধনরত্ন লুট করার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীতকাল থেকে অসংখ্য জাতি গিরিবর্ত্ম দিয়ে আগমন করেছে ভারতবর্ষে। খৃস্টপূর্ব দু হাজার বছর পূর্ব থেকে আর্যদের ভারত আগমনের মধ্য দিয়ে সর্ব প্রথম মিলেছে এ পথের সন্ধান। আর্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রক্ত পিপাসু পারস্য সম্রাট দরায়ুস, ৩২৫ খৃস্টপূর্বাব্দে অর্থ লোভী পাশ্চাত্য জাতি সমূহের প্রথম প্রতিনিধি আলেকজান্ডার, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরেশিয়ায় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মোঙ্গল সর্দার চেঙ্গিস খান প্রমুখ এই গিরিপথ ধরেই পর্দাপণ করেছিলেন ভারতবর্ষে। তারা দখল করেছিলেন ভারত ভূমি। লুট করেছিলেন এখানকার সম্পদ।

সীমান্ত ও আফগানিস্তানের পাঠানরা মূলতঃ একই গোত্র প্রসূত। পাঠানরা দাবী করে, তারা বনি ইসরাঈল বংশীয় লোক। হযরত ইব্রাহীমের বংশজাত নরপতি সউল। ইরমিয়া তাঁর পুত্র। আফগান ইরমিয়া তনয়। খৃস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। আফগানা হযরত সোলায়মানের সেনাবাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক থেকে উন্নীত হন প্রধান সেনাপতির পদে। কথিত আছে একটি অমার্জনীয় অপরাধে তিনি নির্বাসিত হন দামেস্কে। পারস্য সম্রাট বুখত-ই নসর আফগানার বংশধরদের ধরে নিয়ে যান ব্যাবিলন। সেখান থেকে আফগানার বংশধরেরা পালিয়ে কেউ মক্কার সন্নিকটে, আর কেউ আশ্রয় নেয় বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত ঘোরে (ঘোরের বর্তমান নাম হাজারাজাত)। উল্লেখিত দুটি দলই বনি ইসরাইল বা বনি আফদানা নামে পরিচিত।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার অভিযানকালে মক্কার সন্নিকটে অবস্থানকারী আফগানার উত্তর পুরুষ খালিদ ইবনে ওলিদ হযরত মুহাম্মদের কাছে দীক্ষা নিয়ে ইসলামের পরিধি বর্ধনে সচেষ্ট হন। হযরত মুহাম্মদের জীবদ্দশায় সিরিয়া ও ইরাক জয়ের পূর্বে খালিদ ইবনে ওলিদ ঘোরে বসবাসকারী তাঁর বংশধরদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণ প্রাপ্তির পর কায়াসের নেতৃত্বে বনি ইসরাইল গোত্রীয় প্রতিনিধিবর্গ মদীনা পৌঁছে হযরত মুহাম্মদের কর স্পর্শ করে আস্থা স্থাপন করেন ইসলামের মূলমন্ত্রে। প্রতিনিধিদলের নেতা কায়াসের নামটি হিব্রু। ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাম রাখা হল আবদুর রশিদ।

আব্দুর রশিদের ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখে হযরত মুহাম্মাদ বলেন, তোমার ধর্ম বিশ্বাস পাহতনের মতো সুদৃঢ় অটুট। তাই তোমার নাম আজ থেকে হলো আবদুর রশিদ পাহতন। পাহতন একটি তৈলতৃষির লৌহকঠিন কাঠের নাম। এর উপর দাঁড়িয়ে আনসার বাহিনী নির্মাণ করতো সমুদ্রগামী জাহাজ। হযরত মুহাম্মাদ আবুদর রশিদকে উপহার দেন পাহতন উপাধি। পাহতন–ই কালক্রমে হয় পাঠান।

আবদুর রশিদ পাঠান সঙ্গীসহ পুনরায় ফিরে গেলেন ঘোরে। সাতাশি বছর বয়সে অর্থাৎ মদিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের ৪১ বছর পর সারবান, বিতান ও ঘুরগাষ্ট নামক তিন পুত্রকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন আবদুর রশিদ। তাঁর পুত্রগণ থেকেই পাঠানদের আফ্রিদী, খটক, তরাকজাই, ইউসুফজাই, বাঙ্গাশ, ওয়াজির, তুরী, শিনওয়ারী প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভব। ওরা পাখতু (পশতু) ভাষা বলে। তাই তাদের বলা হয় পাখতুন।

দারুল উলূম হাক্কানিয়ার পথে

সিন্ধু ও কাবুল নদীর সঙ্গমস্থলে কিছুক্ষণ

আছরের নামাযের কিছু পূর্বে আমরা দরিয়ায়ে সিন্ধ এবং দরিয়ায়ে কাবুলের মিলন স্থলে হাজির হই। এলাকাটি একটি ছোট খাটো পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। রাস্তার পাশেই দুটি নদী একত্র হয়েছে। নদীর পাশেই গড়ে উঠেছে এ কেন্দ্রটি। এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বিক্রি হচ্ছে। এ মাছগুলো সাথে সাথে কেটে কুটে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট হোটেল আছে। মুসাফিররা এখানে গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। ছোট উন্মুক্ত মসজিদের ব্যবস্থা আছে। পরিবার নিয়ে একত্রে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমরা সেখানে নেমেই মাছ দেখতে যাই। মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব আমাকে মাছ খাওয়ানোর ফন্দি করে রেখেছিলেন। এমন কি এ আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য তিনি পেশোয়ারের কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন। আমরা মাছ দেখতে শুরু করি। রুই মাছের মত এক ধরনের মাছ ১৮০ টাকা দরে দু কেজি কেনা হল এবং ৩৮০ টাকা কেজির ৩ কেজি ছোট মাছ কিনে কাটতে দিয়ে এবং রান্নার অর্ডার দিয়ে আমরা ওযু করে নামায পড়ে নিলাম। নামায পড়তে পড়তে মাছ ভাজি হয়ে যায়। এরপর রুটি এবং মাছ ভাজি দিয়ে আমরা খুবই মজার সাথে দুপুরের খানা সম্পন্ন করি। পাঠান মাওলানার মেহমানদারী দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে পেশোয়ার থেকেও মাওলানার কয়েকজন মেহমান আমাদের সাথে যোগ দেন। খুবই আনন্দ ঘন পরিবেশে আমরা খাওয়া দাওয়া করি। অনেক আলোচনা হয়। খানা খাওয়ার পর পেশোয়ারের মেহমানরা ফিরে যান। তারা আমাকে আগামী দিন পেশোয়ারে হাজির হওয়ার দাওয়াত দেন। কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল না ফলে পেশোয়ার দেখার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। আমরা মাগরিবের নামায পড়ে দারুল উলূম হাক্কানিয়া দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আকুড়াখটক পৌছে যাই। ইসলামাবাদ পেশোয়ার হাইওয়ের পাশেই জামেয়া দারুল উলূম হাক্কানিয়া। এলাকাটির নাম আকুড়াখটক, জেলা নওশিরওয়া। বিরাট মাদরাসা। মাদরাসার পরিচিতি সামনে উপস্থাপন করব।

মাদরাসায় গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল যে, হযরত মুহতামিম সাহেব মাওলানা সামিউল হক সিনেট অধিবেশনের কারণে ইসলামাদে অবস্থান করছেন। হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের আরেক সাহেবজাদা মাওলানা হাফেজ আনওয়ারুল হক সাহেব বাসায় আছেন। আমরা হযরতের বাসায়

পৌঁছে গেলাম। হাইওয়ের পাশেই পেশোয়ারগামী রেল লাইন। রেল লাইনের পাশেই বাসা। তিনি মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। মাওলানা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহেব বললেন, আমি তো কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। মারকাযুল ইসলামীর মুফতী শহীদুল ইসলাম আমাকে বাংলাদেশে নিয়েছিলেন। মাসিক মদীনার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান তাঁর বিশেষ বন্ধু বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট দানবীর হাজী বশির সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। নাস্তা পানির পর তিনি তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা সালমান সাহেবকে আমাদের সাথে দিয়ে মাদরাসা ঘুরিয়ে দেখার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। মাদরাসা দেখার জন্য আমরা রাস্তা পার হয়ে মাদরাসার গেট দিয়ে ঢুকে একের পর এক মাদরাসার বিল্ডিং, দারুল হাদীস, দরসগাহ সমূহ, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরীসহ বিশাল এলাকাব্যাপী মাদরাসা এলাকা ঘুরে ফিরে দেখলাম। রাতের কারণে মাদরাসার বিভিন্ন অফিস ইত্যাদি বন্ধ ছিল। বর্তমানে এখানে তিন হাজার ছাত্র পড়াশুনা করে। শুধু দাওরায়ে হাদীসে প্রায় ১ হাজার ছাত্র। সীমান্ত প্রদেশের ছাত্রই বেশি। এ ছাড়া আফগানিস্তানের বহু ছাত্র এখানে পূর্বে পড়তো। মাওলানা সালমান আমাকে একের পর এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং এ নিয়ে গেলেন। অবশেষে আমরা মোটামুটি মাদরাসা দেখে শেষ করলাম।

আমি প্রথমেই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল হক সাহেবের মাযার জিয়ারত করে নিয়েছিলাম। হযরত ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম কর্মবীর আলেমেদীন। হযরতের বড় সাহেবজাদা মাওলানা সামিউল হক সাহেব বর্তমানে মাদরাসার মুহতামিম। তিনি হযরত মাওলানা তাকী উসমানীর মত পাকিস্তানের একজন প্রথম সারির আলেমেদীন, লেখক ও রাজনীতিবিদ। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের সিনেটের একজন বিজ্ঞ সদস্য। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। আফসোস শত আফসোস! সিনেটের অধিবেশন চলার কারণে হযরত মাওলানা ঐ দিন ইসলামাবাদে ছিলেন ফলে তাঁর সাক্ষাত থেকে আমি মাহরূম হয়ে যাই। আফগান জিহাদে হযরত শায়খ আব্দুল হক সাহেব এবং তাঁর মাদরাসার খেদমত অনেক বড়। এখানকার হাজার হাজার ছাত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত যে কয়েকটি মাদরাসার মাসিক পত্রিকাগুলোর সাথে আমি পরিচিত হয়েছিলাম সত্তরের দশক হতে, তার মধ্যে ৪টি ছিল বিখ্যাত। এগুলো হচ্ছে মুফতী তাকী উসমানী সম্পাদিত দারুল উলূম করাচীর আল বালাগ, জামেয়া ফারুকিয়া করাচীর আল ফারুক, জামেয়া উলূমুল ইসলামী

করাচীর আল বাইয়েনাত এবং দারুল উলূম হাক্কানিয়ার আল হক্ব। এসব পত্রিকা দেখার এবং পড়ার সৌভাগ্য আমার মাদরাসা জীবনের শুরু থেকেই হয়েছিল। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে আমি (১৯৬৯ সালের শেষ দিকে) যখন গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি হই ঐ সময় এ সব পত্রিকা মাদরাসায় আসতো। মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র. সাহেবের কামরায় এ সব পত্রিকা জমা হত। আমি শুরুতেই হযরতের খাদেম হওয়ার কারণে কামরায় যাতায়াত করতাম এবং এ সব পত্র-পত্রিকা উল্টে পাল্টে দেখতাম এবং পড়তাম। ঐ সময় আল হক পত্রিকা আমার নজর কাড়ে এবং হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব ও তাঁর বড় সাহেবজাদা মাওলানা সামিউল হক সাহেব ও দারুল উলূম হাক্কানিয়া সম্পর্কে জানতে পারি।

বছরে দু একবার করাচী আসা যাওয়া হলেও পেশোয়ার এসে দারুল উলূম হাক্কানিয়া দেখার ভাগ্য হয়নি। এ ছাড়া করাচী থেকে আল বালাগ, আল বাইয়িনাত, আল ফারুক সংগ্রহ করা গেলেও আল হক করাচীতে পাওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাথীদের কাছে টাকা দিয়ে এক বছরের আল হক সংগ্রহ করতাম।

যা হোক, মাওলানা সালমান সাহেবের কাছে আল হক পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য টাকা দিলাম। বেশ কয়েক বছর পূর্বে হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের ইন্তেকাল করার পর আল হকের আব্দুল হক সংখ্যা যা প্রায় ১৫০০ শত পৃষ্ঠায় ব্যাপৃত ছিল, পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিলাম। আমি এ বিশেষ সংখ্যার কথা বহু পূর্বেই শুনেছিলাম এবং ৭/৮ বছর পূর্বে করাচীর এক সাথীর কাছে দেখেও ছিলাম। এ বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করার লোভ ছিল। মাওলানা বললেন– এখন তো অফিস বন্ধ, এ সংখ্যা এখন পাওয়া মুশকিল। তিনি বললেন টাকা দিয়ে যান পাঠিয়ে দেব। আমি বললাম হযরত একটু চেষ্টা করে পত্রিকার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি চারদিকে লোকজন লাগিয়ে দিলেন। আমি আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জু হই। দরূফ শরীফ পড়তে থাকি। ছাত্ররা ছুটাছুটি করতে লাগলো। কয়েক ভাইয়ের কাছে ফোন করা হল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন হ্যাঁ। এক মেহমান পত্রিকার এ সংখ্যাটি খরিদ করে এক জায়গায় রেখে দিয়েছে। তার কাছ থেকে এনে আপনাকে দিয়ে দেই। কাল তাকে অফিস থেকে খরিদ করে দিয়ে দেব। আমি আলহামদুল্লিাহ বলে উঠি। মাওলানাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সাথে সাথে এ কিতাব বাবদ ৬০০ টাকা দেই। সঙ্গে আল হকের পুরনো দুটি কপিও পেয়ে যাই। আল্লাহ পাকের

অসীম কুদরতে আমার মনের একটি বাসনা পূরণ হয়। এদিকে এশার আযান হয়ে যায়। মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব গাড়িতে বসাই ছিলেন। আমি কিতাবপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি দ্রুতবেগে হাইওয়ে দিয়ে ইসলামাবাদের দিকে ছুটতে থাকে। আমরা প্রায় ২ ঘণ্টা পরে ইসলামাবাদের ইদারায়ে উলূমে ইসলামিয়াতে পৌছে যাই।
নিম্নে দারুল উলূম হাক্কনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চিত্র তুলে ধরছি।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হক র.

নাম : আব্দুল হক।

পিতার নাম : মাওলানা মারূফ গুল।

দাদার নাম : হাজী মীর আফতাব।

জন্ম : ১৯১২ মতান্তরে ১৯১৪ ঈসায়ী সালে আকুড়াখটকে।

শিক্ষাজীবন

মকতবের শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মকতবের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গা সফর করেন। ১৩৪৭ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে আসেন। এখানে তিনি দরসে নেজামীর কিতাব মানতেক, ফালসাফা, ফিকাহ, হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করে ১৩৫২ সালে ফারেগ হন। দেওবন্দে প্রথমবার এসে ভর্তি হতে পারেননি। পরে আবার এসে ভর্তির জন্য চেষ্টা করেন ও সফল হন।

দারুল উলূম হাক্কানিয়া প্রতিষ্ঠা

ভারত বিভক্তির পর মাওলানা আব্দুল হক সাহেব মাজবুর হয়ে দেওবন্দ থেকে আকুড়াখটক চলে আসেন। তাঁর সাথে সুবহে সরহাদ আফগানিস্তান, সাওয়াদ, দীর, চিত্রাল ও অন্যান্য কাবায়েলী এলাকার ছাত্ররাও ফিরে আসে। ছাত্রদের ও শুভাকঙ্ক্ষীদের অনুরোধে নিজের পৈত্রিক মসজিদে দরস তাদরিসের সিলসিলা শুরু করেন। তখন পাকিস্তানে দারুল উলূম দেওবন্দের মত বড় কোন মাদরাসা ছিল না। ফলে দারুল উলূম দেওবন্দের একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশের তুলাবা এবং ওলামারা হযরত মাওলানার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং অবশেষে দারুল উলূম হাক্কানিয়া নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

করেন। যা অল্প দিনের মধ্যে শুধু পাকিস্তানই নয় দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্তরের মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. ১৮৬৬ সালে যখন শিখদের সাথে যুদ্ধ করে আকুড়াখটকে পৌঁছেন তখন তিনি বলেছিলেন– 'ইস মিট্টি সে ইলম কি খুশবো আরাহে হে'।

বিবাহ

১৯৩৬ সালে তিনি প্রসিদ্ধ এক দীনী পরিবারে বিবাহ করেন। তার স্ত্রী নিজ হাতে ৪০ বছর পর্যন্ত মাদরাসার সকল ছাত্র-ওস্তাদের খাবার পাকান। পরে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নিজ হাতে রুটি তৈরি করতেন।

বায়আত

তিনি প্রথমে তারাগজারী র.–এর নিকট এবং তার ইন্তেকালের পর হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী র.–এর নিকট বায়আত হন। তিনি সুলুক ও তাসাউফের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেন। পরে তিনি মাওলানা আব্দুল মালেক সিদ্দিকী নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী র.–এর নিকটও বায়আত হন।

হজ্জের সফর

১৯৫২ ঈসায়ী সালে তিনি হজ্জ ও নবীজীর রওজা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা সফর করেন।

শায়খুল হাদীস উপাধি

হযরত বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চতর কিতাব ও সিহাহ সিত্তাহর কিতাব বিশেষ করে বুখারী ও তিরমিযী শরীফের দরস দিতেন। তাঁর ইলমের গভীরতা ও ২৫ বছর যাবত হাদীসের দরস দানের কারণে তার নামের সঙ্গে শায়খুল হাদীস পদবী যুক্ত হয়। এতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রচনাবলী

হযরতের রচিত অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে হাকায়েকে সুনান মাআ জামিয়ুস সুনান, সুহবত বা আহলে হক, কওমী এসিমব্লী মে ইসলাম কা মারেকাহ, ইবাদাত ও উবুদিয়াত, মাসআলায়ে খিলাফত ও শাহাদাত, দাওয়াতে হক উল্লেখযোগ্য।

ওফাত

তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৭ আগস্ট, ১৯৮৮ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দারুল উলূমের এরিয়ার ভিতরে দারুল হিফজ ও তাজবিদের সামনে দাফন করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামাবাদের পথে ঘাটে

✍ বুধবার আকুড়াখটক থেকে এসে পরদিন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ দেখার প্রোগ্রাম করি। সকালে হযরত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব ইদারার প্রবীন উস্তাদ মাওলানা রাহাত হাশেমী সাহেবকে আমার সাথে দিয়ে দেন। আমরা ট্যাক্সী নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হই। মারী রোড দিয়ে মাত্র দশ মিনিটেই মেইন শহরে আসা যায়। আমরা প্রথমেই ইসলামাবাদ এসে প্রথম দিন যেখানে পুলিশ এন্ট্রি করেছিলাম সেখানে চলে যাই। এ পথেই পড়ে পরপর পার্লামেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্ট হাউস, কনফারেন্স টাওয়ার ইত্যাদি। সাদা ধবধবে বিল্ডিংগুলো রাস্তা থেকে দেখে নিলাম। সুন্দর শহর চারিদিকে গাছপালা অদূরে পাহাড়। পরিকল্পিত শহর। কোন যানজট নেই। ইসলামাবাদ রাওয়ালপিন্ডি শহরের সাথে লাগা নতুন রাজধানী। পুলিশ এন্ট্রি সেরে আমরা শহর দেখতে দেখতে জোহরের নামায পড়তে হাশেমী সাহেবের মসজিদে গেলাম। নামাযের পর আমরা একটি হোটেলে খানা খেলাম। হোটেলটি মধ্যম ধরনের সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রুটি-ভাত-ভাজি গোশত দিয়ে খুবই সুস্বাদু খানা খেলাম। বিল উঠলো ৫০০ রূপীর মত।

ইসলামী ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যাম্পাস

এরপর আমরা চলে গেলাম ইসলামী ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যাম্পাস দেখার জন্য। ইসলামী ইউনিভার্সিটি শুরু হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত ফয়সাল মসজিদে। পরে ভার্সিটির বিস্তৃতির কারণে শহরের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় একটি নতুন ক্যাম্পাস বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় ২০ মিনিটে আমরা নতুন ক্যাম্পাসে পৌঁছে গেলাম। কয়েকশত বিঘা জমি নিয়ে নতুন ক্যাম্পাস। পাকিস্তান সরকার আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এখানে যায়গা দিয়েছে। এখান থেকে ফয়সাল মসজিদ দেখা যায়। আমরা ঘুরে ঘুরে ভার্সিটির বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, মসজিদ ইত্যাদি দেখতে থাকি। এ ইউনির্ভিসিটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের সাথে দেখা হল। আমাদের বাংলাদেশের ছাত্রও আছে।

এ ইউনিভার্সিটির প্রধান আকর্ষণ ছিল ডা. মাহমুদ আহমাদ গাজী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ। ডা. মাহমুদ সাহেবের আসল বাড়ী ভারতের উত্তর প্রদেশের

মুজাফফরনগর জেলার থানা ভবনে। তার আব্বা একজন বুযুর্গ মানুষ ছিলেন। ডা. গাজী দরসে নেজামী শেষ করে ভার্সিটির ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি একজন ইসলামী স্কলার। তিনি কিছুদিন ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। বর্তমানে শুধু প্রফেসর। আড়াইটার দিকে গাজী সাহেবের কামরায় চলে গেলাম। তাই সাক্ষাতের কোন অসুবিধা হয়নি ১৫/২০ মিনিট তিনি সময় দিলেন। আমি তাকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিলে তা কবুল করেন।

গাজী সাহেব ইতোপূর্বে বাংলাদেশ সফর করে গিয়েছেন। চিটাগাং এর ইসলামী ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামে তিনি এসেছিলে। সে সময় আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম। এ ছাড়া লন্ডনের কয়েকটি প্রোগ্রামেও তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। ডা. সাহেব ইংরেজীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে খুব সুন্দর লেকচার দেন। একদিন রাতে তাঁর বাসাতেও হাযির হয়েছিলাম। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইসলামী ইউনিভার্সিটি দেখে চলে যাই ফয়সল মসজিদ দেখতে। ১৫/২০ মিনিটে চলে যাই মসজিদের কাছেই। প্রথমেই বিশাল মসজিদের দক্ষিণ পাশে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউল হক সাহেবের মাযার। সাদাসিধে একটি ছোট মাযারে শুয়ে আছেন জিয়াউল হক সাহেব। তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পাকিস্তানে ইসলামী নেজাম কায়েমে তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা করলে তিনি আফগান মুজাহিদের অনেক সাহায্য করেন। ১৯৮৮ সালে ১৭ আগস্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি ভাওয়ালপুর নিহত হন।

২৩.১১.০৬ সকলে ফয়সাল মসজিদ দেখে, মাজার যিয়ারত করে আমরা মুতা'মার আল আলামীল ইসলামী মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে মাদরাসায় চলে আসি। রাতে মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের বাসায় দাওয়াত খাই এবং বিদায় নেই।

ইসলামী নেযাম কায়েমে মরহুম জিয়াউল হকের কয়েকটি পদক্ষেপ

ইসলামী আদর্শের ধারা উড্ডীন

মরহুম জিয়াউল হকের যামানায় ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ছিল। ইতোপূর্বে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর আমল করতে গিয়ে মানুষকে পদে পদে হিম্মত হারাতে হতো। দীনদার মুসলমানদেরকে তিরস্কারের নিশানা বানানো হত। এবং সরকারী তবকায় তো ইসলামী আদর্শকে বেকার এবং অচল মনে করা হত এবং ইংরেজদের চালু করা দর্শন শুধু কায়েমই ছিল না বরং এটা দিনদিন আরো উন্নত হচ্ছিল। ফলে ইসলামের উপর টিকে থাকা ব্যক্তিদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবা হত।

শহীদ মরহুম তার নিজের অক্লান্ত মেহনতের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। তিনিই একমাত্র মুসলিম শাসনকর্তা, যিনি জেনারেল এসেম্বেলীতে তেলাওয়াতে কালামে পাকের মাধ্যমেই বক্তৃতা শুরু করতেন। শুধু তাই নয় বিদেশী কোন রাষ্ট্রের বক্তৃতাও তিনি কালামে পাকের মাধ্যমে শুরু করতেন।

মদপান নিষিদ্ধ

সদর মরহুম ১৯৭৯ সালে মদপানের নিষিদ্ধতার উপর অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ইতোপূর্বে মুফতী মাহমুদ সাহেব সীমান্ত প্রদেশে এবং ভুট্টো সাহেব সারা পাকিস্তানে মদপান নিষিদ্ধ করলেও তা ছিল শুধু মুসলমানদের জন্য। কিন্তু মরহুম জিয়া মুসলিম এবং অমুসলিম সকলের জন্য মদ নিষিদ্ধ করেন। ইতোপূর্বে মদপানকারীর শাস্তি শরীয়ত অনুযায়ী ছিল না। তিনি শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি মদপানের মত জঘণ্য গুনাহ থেকে জাতিকে রক্ষা করেন। এটা ছিল তার পাকিস্তানে ইসলাম কায়েম করার এক মহান প্রচেষ্টা।

ব্যভিচারের শাস্তি

মরহুম জিয়া দেশে ইংরেজদের প্রচলিত ব্যভিচারীর শাস্তি পরিবর্তন করে কুরআন হাদীসের আলোকে শাস্তি নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ শত কোড়া এবং পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলা।

শরয়ী হদ জারী

তার আমলেই প্রথমবার সকল অন্যায়ের উপর শরয়ী শাস্তি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি হুদুদ অর্ডিন্যান্স জারী করেন।

সংবিধানে কুরআন হাদীস

ইতোপূর্বে প্রতি সংবিধানে কুরআন হাদীসের আলোকে আইন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হলেও কোন সরকার এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। জিয়া অনৈসলামী আইনকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার রাস্তা খুলে দেন এবং প্রাদেশিক শরয়ী আদালত এবং সুপ্রীম কোর্টের শরয়ী আপিল বেঞ্চ কায়েম করেন।

সরকারী অফিসে জামাতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা

মরহুম জিয়ার পূর্বে সরকারী অফিস আদালতে জামাতের সাথে নামায পড়া খুবই কঠিন ছিল। মরহুম জিয়া সকল অফিস আদালতে নিয়মতান্ত্রিক জামাতের সাথে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এমনকি ইসলামাবাদের সেক্রেটারিয়েটের প্রত্যেক হলে এবং ব্লকেও জামাতের সাথে নামায শুরু হয়। ফলে মানুষের মধ্যে অফিসারদের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এমনকি নামাযের পরপরই কোন কোন স্থানে ১টি হাদীস শুনিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শুধু তাই নয়, সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় নামাযের সময় হলে সেখানেও জামাতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা করার প্রচলন শুরু হয়। এমনকি বিমানবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি স্থানেও সহজে নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন মরহুম জিয়া। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নামাযী এবং মদপান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন তিনি।

রমযান মাসের পবিত্রতা রক্ষা

মরহুম জিয়া রমযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাছ ইহতিমাম করেন। দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট দিনের বেলা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। ফলে ঐ সময় মনে হত সত্যই পাকিস্তান একটি ইসলামী দেশ।

সরকারী যাকাত আদায়

জেনারেল জিয়া পাকিস্তানে সরকারীভাবে যাকাত আদায় করে গরীব দুঃখীদের মাঝে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। ইতোপূর্বে মানুষ এই ফরজকে ব্যক্তিগত মনে করত। মরহুম জিয়া ইসলামী অর্থনীতি চাঙ্গা করার নিয়তে সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

জাতীয় পোশাক নির্ধারণ

ছদর মরহুমের সময় পাকিস্তানের সকল নাগরিকের জন্য ইংলিশ পোশাকের পরিবর্তে ইসলামী জাতীয় পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা সংস্কার

মরহুম জিয়া পাকিস্তানের ধর্মহীন কর্ম শিক্ষা ও কর্মহীন ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে জেনারেল লাইনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি জীবন্ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপ দেয়ার জন্য ব্যাপক প্রোগ্রাম নেয়া হয়। ইসলামাবাদে ইসলামী ইউনিভার্সিটি কায়েম করা হয়। অন্যান্য সাধারণ ইউনিভার্সিটির তুলনায় এ ভার্সিটিতে ইসলামের অনেক বিষয় বিশেষ করে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

দীনী মাদরাসা শিক্ষার মান নির্ধারণ

ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে ওলামা এবং মাদরাসাসমূহ যথেষ্ট ভূমিকা রাখলেও সরকারী হালকায় মাদরাসাসমূহের কোন দাম ছিল না বললেই চলে। ফলে দীনী মাদরাসার ফারেগীনরা সনদের অভাবে বড় বড় সরকারী কার্যক্রমে স্থান পেত না। মরহুম জিয়া ওলামাদের প্রাণের দাবী মেনে নিয়ে মাদরাসা সনদকে এম এ - এর সমমানে উন্নীত করেন। এটা ছিল দীনী মাদরাসার জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এর ফলে উলামারা সমাজের বড় বড় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার ফায়দা লাভে সমর্থ হয়।

সুদী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ

মরহুম জিয়া সুদভিত্তিক অর্থনীতি পরিবর্তন করে ইসলামী অর্থনীতি চালুর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেন। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি বড় বড় ব্যাংকার এবং অর্থনীতিবিদদের ডেকে সুদী নেজামের খারাবীর কথা তুলে ধরেন এবং আস্তে আস্তে ইসলামী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বলেন।

মিডিয়ার ইসলামীকরণ

মিডিয়ার মাধ্যমে নির্লজ্জতা ও বেহায়ায়ী দিন দিন বেড়ে চলছিল। মরহুম জিয়ার আমলে মিডিয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। রেডিও, টিভি ইত্যাদি গণমাধ্যমের মধ্যে ব্রেক লাগানো হয়। ১৯৭৭ সালের পর হতে গণমাধ্যমগুলিতে কিছু না কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে। পূর্বের তুলনায় বেহায়ায়ী কমতে থাকে। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে থাকে।

কাদিয়ানী ফেতনা উৎপাটন

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সরকারীভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করলেও কাদিয়ানীরা বিভিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম চালু রাখে। মরহুম জিয়া তাদের ব্যাপারে শক্ত হাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। ফলে কাদিয়ানীরা মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারেনি।

আফগানিস্তানে জিহাদ

মরহুম জিয়া আফগানে জিহাদে যেভাবে মুজাহিদদের সাহায্য করেছিলেন তার তুলনা ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্নভাবে আফগান জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

✍ যাহোক আমরা মরহুমের মাযার যিয়ারত করি এবং মসজিদে প্রবেশ করি। বিশাল মসজিদ। বাদশা ফয়সল পাকিস্তান সফরে এসে−এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পাহাড়ের পাদদেশে তাবুর আকারে চার কোণে চারটি মিনারাসহ এ মসজিদটি ইসলামাদের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি বিদেশী মানুষ এটি দেখতে আসে।

মসজিদের মেইন হল বন্ধ ছিল। বাংলাদেশ থেকে এসেছি বলে পাহারাদারের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি দরজা খুলে দিলে আমরা ভিতরে যেয়ে এ বিশাল মসজিদের হলে প্রবেশ করি। পরে ইসলামী ইউনিভার্সিটির পুরনো ক্যাম্পাস দেখি। এখানের ভার্সিটির অফিস, লাইব্রেরী ইত্যাদি এখানেও চালু আছে। মসজিদের মেইন গেটে লাইব্রেরী এবং মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। আমরা মসজিদ থেকে বিদায় হয়ে 'মুতামার আল আলসে ইসলামীর' হেড অফিসের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে মাদরাসায় চলে আসি।

রাজধানী ইসলামাবাদ

পাকিস্তানের রাজধানী, পৃথিবীর স্বল্প সংখ্যক পরিকল্পিত রাজধানীগুলোর অন্যতম। বস্তুত এটি রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে যুগ্মশহর, উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয় শহর একই সাথে বৃদ্ধি পাবে এবং পিন্ডি মাতৃশহর হিসেবে গণ্য হবে। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, ৩৩ ডিগ্রী ৪৯ মি. উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৭২ ডিগ্রী ২৪ মি. পূর্ব অক্ষাংশে, একটি মালভূমির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, তার পূর্বনাম ছিল পোতওয়ার। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে স্থানটির উচ্চতা ৫০৩-৬১০ মিটার। উভয়দিকেই মালভূমি ক্রমেই উঁচু হতে হতে পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। ইসলামাবাদ হতে পার্বত্য পথে আরোহন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য ১৫টি পথ নির্মাণ করা হয়েছে; এগুলোর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কিলোমিটার। স্থানে স্থানে এসব পার্বত্য পথ ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছে, এর মধ্যে গিরিখাতও রয়েছে। এখানে সরকারের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩১,০০০ একর। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম নিলান ভাতু, তার উচ্চতা ১,৬০৪ মিটার। ইসলামাবাদের উত্তর সীমান্ত দিয়ে হাররো নদী প্রবাহিত, রাজধানী এলাকার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রাওয়াল বাঁধ নির্মাণ করে ৮.৮ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী রাওয়াল হ্রদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই নদী ও হ্রদ হতে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি উভয় শহরে সারা বছর প্রচুর পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। শহরে পানি সরবরাহের অপর উৎস হচ্ছে ২৪ মাইল উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত সোন নদী এবং তাতে বাঁধ নির্মাণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে সিমলী হ্রদ। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এই কৃত্রিম জলাধারের উচ্চতা ২,২৯৫ ফুট। এছাড়া এই দুই নদীরই অনেক ছোট ছোট উপনদীও রয়েছে, সেগুলি স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন। মারগাল্লা পাহাড় ও মারী পর্বতের কোন কোন চূড়ায় শীতকালে বরফ জমে।

কথিত আছে যে, এই অঞ্চলটি ছিল মানুষের অন্যতম আদি বাসভূমি। পোতওয়ার মালভূমিতেই ৪ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার প্রস্তর যুগের সোন সংস্কৃতির নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছে। অনেককাল পরে সে একই স্থানে অর্থাৎ মারগাল্লা পাহাড়ের অপর পারে তক্ষশীলাতে বিখ্যাত গান্দারা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল; তার নিদর্শনাদি বর্তমান রয়েছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অতীতের রহস্যময় আকর্ষণ আর বর্তমানের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। সামগ্রিকভাবে স্থানটি

সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। উত্তরে মরাগাল্লা ও মারী পাহাড় শ্রেণী থাকার কারণে বর্তমান শহর এলাকাতে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটিই খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে (মে হতে সেপ্টেম্বর) ৬৯ সেন্টিমিটার, আর শীতকালে (নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী) ২৩ সেন্টিমিটার। গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ২৪ ডিগ্রী হতে ৩৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর শীতকালে ২০ হতে ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

সমগ্র পরিকল্পিত শহর এলাকার পরিমাণ ৯০৬.৫০ বর্গ কিলোমিটার, এর মধ্যে মূল শহরের আয়তন ২২০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭২ খৃস্টাব্দে সমগ্র শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৭৬,০০০। দশ বৎসর পর তার জনসংখ্যা হয় ২,১০,০০০, শহরটি খুবই দ্রুত গড়ে উঠছে। যদিও তখন পর্যন্ত অধিবাসীদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ। প্রশাসনিকভাবে সমগ্র রাজধানী এলাকাটি পূর্বে রাওয়ালপিন্ডি জেলার রাওয়ালপিন্ডি, মারী ও কালুতা তহশীল এবং অ্যাবোটাবাদ জেলার অ্যাবোটাবাদ ও হরিপুর তহশীলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮১ খৃস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী সমগ্র রাজধানী এলাকাটিকে নিয়ে ইসলামাবাদ জেলা গঠন করা হয়। এটা পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত।

পাকিস্তানের রাজধানীর ইতিবৃত্ত

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপিত হয় জিন্নাহ এর– জন্মস্থান করাচী শহরে। সেই সময় শেরেবাংলা আফসোস করে বলেছিলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টি হল সত্য, কিন্তু কেন্দ্র স্থাপিত হল বৃত্তের এক প্রান্তে।" সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী হলেও করাচী তখন ছিল বস্তুত মৎস্য শিকার ও ব্যবসায়ের একটি বন্দর মাত্র। অতঃপর অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে করাচী শহরটি সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ভারত হতে মুসলিম মুহাজিরগণের মধ্যে যারা পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেছিলেন, তাদের প্রধান অংশটিই করাচীতে আশ্রয় লাভ করেছিল। ফলে সেই শহরের জনসংখ্যা স্ফীত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। পাকিস্তান সরকারও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এই রাজধানী শহরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে থাকে। অতঃপর দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা চলতে থাকলে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) মুহাম্মাদ আইয়ুব খান সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারী করেন এবং প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরে প্রেসিডেন্ট হন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী হতে স্থানান্তরিত হয়। আইয়ুব খান দেশের সেনাবাহিনীর সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডি হতে বিশেষ ফরমান জারী করে দেশ শাসন করতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সেজন্য কতগুলো কমিশন গঠন করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র তিন মাস পরেই ২৩ জানুয়ারী ১৯৫৯ সালে তিনি রাষ্ট্রের রাজধানীর উপযোগী স্থান নির্বাচনের জন্য কমিশন গঠন করেন। তার দায়িত্ব ছিল ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, আবহাওয়া এবং উৎপাদনশক্তিপূর্ণ পশ্চাদভূমির বিবেচনায় করাচী যথোপযুক্ত কিনা তা বিবেচনা করা এবং উপরিউক্ত বিবেচনায় অনুপযোগী হলে অন্যত্র কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা। ৯ সদস্যবিশিষ্ট সেই রাজধানী কমিশনের সভাপতি ছিলেন জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান। পরে তিনি পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি হন এবং তার হাতেই ক্ষমতা দিয়ে আইয়ুব খান রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তার শাসনামলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় এবং স্বাধীন বাংলাদশের অভ্যূদয় হয়। প্রায় পাঁচ মাস পরে কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে করাচীর উপযোগিতা বাতিল করা হয় এবং দেশরক্ষা, আবহাওয়া, স্থানীয় সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদির বিবেচনায় পোতওয়ারকে দেশের রাজধানীর যথোপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত করা হয়। বলা হয় যে, রাওয়ালপিন্ডি এর মাতৃশহররূপে থাকবে এবং উভয় শহরই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে সমৃদ্ধি অর্জন করে যাবে। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের জুন মাসে আইয়ুব খান কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং পোতওয়ার পাকিস্তানের নতুন রাজধানী বলে ঘোষিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হয় ইসলামাবাদ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের স্থাপয়িতা আইয়ুব খান। এই শহরেই স্বীয় বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং এখান হতে অল্প দূরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত স্বগ্রাম রেহানাতে তাঁকে কবর দেয়া হয়। ইসলামাবাদ নির্মাণের সাথে সাথে তিনি (তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ঢাকা শহরের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণেও হাত দেন এবং জাতীয় সংসদ ভবন ও অন্যান্য সুরম্য ভবনসমূহ নির্মাণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয় শেরেবাংলা নগর।

ইসলামাবাদের মূল পরিকল্পনা ও নক্সা তৈরি করে এথেন্সের নগর পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডক্সিয়াডেস এসোসিয়েটস। **Dynapolis** নগর গঠন অনুযায়ী এই শহরটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আবাসিক প্রয়োজনে চতুর্দিকে সম্প্রসারণ অনুযায়ী মূল নগর কেন্দ্রটিও তুলনামূলকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। বহিঃযোগাযোগের জন্য শাহারায়ে ইসলামাবাদ এবং শাহারায়ে কাশ্মীর নামক দুটি মহাসড়ক দ্বারা এটি সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত এবং শাহারায়ে পাকিস্তান নামক মহাসড়ক দ্বারা লাহোর, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত। নগরের সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজধানী উন্নয়ন

সংস্থা (**Capital Development Authority- CDA**) গঠন করা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত শহর বলে এখানে বিভিন্ন চিহ্নিত এলাকা রয়েছে এবং সেগুলো একান্তভাবেই নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূল রাজধানী কেন্দ্রে প্রশাসনিক এলাকা, কূটনৈতিক মিশন এলাকা, নাগরিকদের ভবন এলাকা, আবাসিক এলাকা, নীল এলাকা (প্রধান সড়কের পার্শ্বে বহুতলা বাণিজ্যিক এলাকা), শিল্প এলাকা ইত্যাদি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সড়কগুলোর বৈশিষ্ট্য

কতগুলো প্রধান প্রধান সড়ক আছে যেমন খায়াবানে কায়দে আযম, আতাতুর্ক এভিনিউ, শাহারায়ে সোহরাওয়ার্দী, ৭ম এভিনিউ, শাসনতন্ত্র এভিনিউ ইত্যাদি। আর এদের মধ্যবর্তী সড়কগুলো নম্বর দ্বারা চিহ্নিত। যেমন ৫১ নং স্ট্রীট, ৫২১ নং স্ট্রীট, ৫৩ নং স্ট্রীট ইত্যাদি।

ইসলামাবাদকে পাকিস্তানের স্থায়ী রাজধানীরূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাজেই এখানকার প্রধান প্রধান ভবন এমন বিশেষ পরিকল্পনামত নির্মাণ করা হয়েছে ও হচ্ছে যেন পরবর্তীকালের ভবনসমূহকেও মূল ভবনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্মাণ করা যায়। এই নগরীর প্রধান উপদেষ্টা স্থপতি ছিলেন ইংল্যান্ডের স্যার রবার্ট ম্যাথিও। ইসলামাবাদের বিশিষ্ট ভবনসমূহের মধ্যে রয়েছে-

১. পার্লামেন্ট ভবন

শহরের অন্যতম প্রধান পার্লামেন্ট সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। ১৯৭৪ খৃস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়, সুদৃশ্য ও বিশাল এলাকাব্যাপী পাঁচতলা ভবন, সর্বমোট আয়তন ৫,৯৮,৫৭২ বর্গফুট। জাতীয় সংসদ ভবন ও সিনেট হল তিনতলাতে অবস্থিত। উভয়টিই অতি সুদৃশ্য। সর্বমোট নির্মাণ ব্যয় ছিল ৪৫৪ মিলিয়ন টাকা। এর প্রধান স্থপতি সংস্থা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **M/S Eolward Durel Stone**, সহযোগী ছিল পাকিস্তানের মেসার্স নাবাভী এন্ড সিদ্দিকী এসোসিয়েটস।

২. সচিবালয় ভবনসমূহ

মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচ বৎসরে নির্মাণ করা হয়েছে। মোট এলাকা ৯২,৯০০ বর্গমিটার। এটি দু'ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগে চারটি করে পরস্পর সংলগ্ন চার হতে ছয়তলা ভবন, এগুলোর বাইরের দিকে মুগল স্থাপত্য রীতি এবং ভেতরের দিকে আধুনিক রীতি অনুসৃত হয়েছে।

৩. আইওয়ানে সদর বা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

একটি পাহাড়ের উপরে ও চতুর্দিক ঘিরে নির্মিত। সুদৃশ্য আধুনিক রীতির ভবন, মোট নির্মাণ এলাকা ৩০,১৯৩ বর্গমিটার। এটা একই সাথে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, রাষ্ট্রীয় মেহমানখানা এবং সম্মানিত রাষ্ট্রীয় মেহমানগণের ভোজসভাগৃহ।

৪. স্টেট ব্যাংক ভবন

এর ভিত্তিতে সাধারণ পাথর এবং উপরে মর্মর পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের সুসামঞ্জস্যতায় ভবনটি খুবই সুদৃশ্য দেখায়। অন্যান্য আকর্ষণীয় ভবনের মধ্যে রয়েছে রেডিও ভবন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন, জাতীয় আর্কাইভ বা দলীল সংরক্ষণ ভবন, বিজ্ঞান একাডেমী ভবন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর, সেনাবাহিনী জাদুঘর, সুপ্রীমকোর্ট ভবন, জাতীয় শিল্পকলা ভবন ইত্যাদি নির্মীয়মান রয়েছে।

শহরের পরিকল্পিত এলাকাতে ১৯ তলা গৃহ নির্মাণ ঋণ দান কর্পোরেশনসহ নানা আকর্ষণীয় ভবনসমূহ নির্মিত হচ্ছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকা এক একটি মারকায নামে পরিচিত। ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামাবাদ শহরে ১৫,৭৭৮ টি আবাসিক গৃহ নির্মিত হয়।

ফয়সল মসজিদ

কিন্তু সমগ্র ইসলামাবাদ শহরের মধ্যে যে ভবনটি সবার আগে দৃষ্টিগোচর হয় সে ভবনটি স্বীয় বিশালত্ব, স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নিয়ে বিরাজমান তা হচ্ছে ফয়সল মসজিদ। বস্তুতপক্ষে এটা পাকিস্তানের রাজধানীর প্রধান পরিচায়ক ধর্মীয় ভবন। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, শাহরায়ে ইসলামাবাদ সড়কের মোড়ে উঁচু স্থানে এটা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মোট আয়তন ১,৮৯,৭০৫ বর্গমিটার। কয়েকটি পিরামিড আকারের ছাদ ৪০ মিটার উচ্চ চারটি মীনার সরু, গোল, কীলক আকারের, প্রতিটি ৮৮ মিটার উঁচু। এই মসজিদ দিনে বা রাতে সবসময় শহরের যে কোন স্থান হতে এবং শহরের বাইরে বহুদূর হতে দেখা যায়।

মসজিদটির মূল ভবনে এক সঙ্গে ১০,০০০ লোক নামায আদায় করতে পারে। চতুর্দিকের ছাদযুক্ত বারান্দাতে ২৪,০০০ লোক এবং প্রধান চত্বর ও পূর্ব পাশের খোলা জায়গাতে আরো ৪০,০০০ হাজার লোক একসাথে নামায আদায় করতে পারে। ভিতরে এক সঙ্গে ৩০০ জনের ওযুর ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের একাংশে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণ দিক দিয়ে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য পশ্চিম দিক দিয়ে একটি আলাদা প্রবেশ পথও রাখা হয়েছে। এই বিশাল ও সুন্দর মসজিদটির মূল নক্সা প্রণয়ন করেন খ্যাতনামা তুর্কী স্থপতি ভেদাত দালোকায়। মসজিদটি নির্মাণের সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করেছেন সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ ফয়সাল। তাঁর নামেই এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে।

হজ্জ ভবন

১৯৮৬ খৃস্টাব্দে জুন মাসে ইসলামাবাদের নবনির্মিত হজ্জভবনসমূহ উদ্বোধন করা হয়। পাকিস্তানের প্রধান হজ্জ ক্যাম্প ছিল করাচীতে। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলের হজ্জযাত্রীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য ইসলামাবাদেও একটি হজ্জযাত্রী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও আযাদ কাশ্মীরের হজ্জযাত্রীগণ সরাসরি এখান থেকে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যেতে পারেন। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সেক্টর এইচ-১৪ তে সমতল স্থানে ২২ একর এলাকাজুড়ে এই বিশাল ক্যাম্প নির্মিত হয়েছে। বাইরের দিক হতে অননুমোদিত কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। দূর হতে এর সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। এখানে দোতলা ১০টি পাকা ভবন রয়েছে, সেগুলোতে একসাথে ১,০০০ হজ্জযাত্রী আরামে থাকতে পারেন। হজ্জের সময় প্রায় ৫০,০০০ লোক এখানকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন। বাইরে সড়ক যোগাযোগ, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, ভিতরে পানি সরবরাহ, ক্যান্টিন, ডিসপেন্সারী, পোস্ট অফিস, টেলিফোন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সাথে একটি মসজিদও নির্মাণাধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

ইসলামাবাদে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১. কায়দে আযম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই প্রথম এম. এ. পর্যায়ে শিক্ষাদান শুরু হয়। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, পাকিস্তান সচিবালয়ের পূর্বদিকে এটি অবস্থিত। এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয়ও মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, পাকিস্তান সচিবালয়ের পূর্বদিকে এটি অবস্থিত। এর লক্ষ্য ইসলামী শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা এবং ইসলামী সমাজের উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, দৈহিক, মানসিক ও সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজন মিটানো। ৩. আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শহরের জিরো পয়েন্টের নিকটে সেক্টর এইচ-৮ -এ অবস্থিত সাধারণ বেতনের বিনিময়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসেই প্রাথমিক পর্যায় হতে ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে বৎসরে দুইবার পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে সরবরাহ করা হয়। সেক্টর এইচ-৯ -এ স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। সেখানে আরবী, ফার্সী, হিন্দী, তুর্কি, ইংরেজী, জার্মান, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়।

চিকিৎসাব্যবস্থা

রাজধানীর নাগরিকগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সেক্টর জি -৮/৩ এ ১৪০ একর এলাকাব্যাপী নির্মিত হচ্ছে বিশাল হাসপাতাল কমপ্লেক্স।

এখানে হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, শিশু হাসপাতাল, প্রসূতি সদন, মস্তিষ্কের রোগ গবেষণা কেন্দ্র, চক্ষু হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কান, নাক ও গলার রোগের চিকিৎসা বিভাগ, যকৃতের চিকিৎসা, পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা, প্লাস্টিক সার্জারী ইত্যাদির বিশেষ চিকিৎসার আলাদা আলাদা বিভাগ নির্মিত হচ্ছে। এই কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস বা জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

এ ছাড়া জাতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স রাজধানীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখান থেকে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রেল স্টেশনসমূহ ও বাস টার্মিনালের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এখানে এশীয় অলিম্পিক খেলাসমূহসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। জাতীয় স্টেডিয়ামের নাম জিন্নাহ স্টেডিয়াম। ইসলামাবাদের এই ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণে চীন সহায়তা প্রদান করেছে।

শিল্প

বড়, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য খায়াবানে স্যার সাইয়েদ এর– পার্শবর্তী এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের অন্য প্রধান প্রধান শহরের সাথে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে। শিল্প এলাকা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। নিত্য ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় ছোট ছোট শিল্পদ্রব্য নির্মাণ ও ব্যবসায়ের জন্য খায়াবনে সোরাওয়ার্দীর উত্তরাংশের এলাকা নির্ধারিত করা হয়েছে। সেখানে এ ধরনের শিল্প দ্রব্যাদি নির্মাণ এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া সব ধরনের শিল্প কারখানার জন্য ১ হতে ৯ পর্যন্ত সেক্টর আলাদাভাবে নির্ধারিত রয়েছে।

শহরবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাওয়াল হ্রদ ও সিমলী হ্রদে নৌভ্রমণ, ২,০২,৩৬০ বর্গমিটার জোড়া গোলাপ ও জুইফুলের বাগানে বেড়াবার ব্যবস্থা, আর্জেন্টিনা পার্ক ও মারগাল্লা জাতীয় পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাসম্বলিত ২২০ বর্গকিলোমিটারব্যাপী ইসলামাবাদ পার্ক নির্মিয়মান রয়েছে। জাপানী শিশুদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ জাপানী সহযোগিতায় নির্মিত ১৬ একর এলাকাজুড়ে শিশু উদ্যান বিশেষ আকর্ষণীয়।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য এই শহরে দুটি কেন্দ্রস্থল রয়েছে। একটি সেক্টর এফ- ৮/৪ এর নির্মিত সুদৃশ্য খৃস্টান গির্জা। তা গথিক স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। ভিতরে একসাথে ৬০০ লোক প্রার্থনা করতে পারে এবং অপরটি হচ্ছে মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে সেক্টর এফ-৭ এ অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন

অশ্বত্থ বৃক্ষ। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের (বা খুব সম্ভবত এর মূল গাছের) নীচে বসে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বিদেশী দূতাবাসের অনেক বৌদ্ধ কূটনৈতিক এই পবিত্র বৃক্ষতলে এসে থাকেন। ইসলামের আগমনের পূর্বে এই পুরো অঞ্চলটিতেই যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব ছিল।

পাকিস্তানের নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ দ্রুত গড়ে উঠছে। এখনকার প্রায় কোন প্রকল্পই এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে এটি একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় শহরে পরিণত হবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নতুন এক ধারার সূচনা করেছে। শিক্ষাকাল এবং বাহ্যিক উন্নতির কাল বৃদ্ধিকরণ প্রস্তুতি কাজে প্রতিষ্ঠানটি ব্যস্ত। বিগত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন শ্রেণীকক্ষে বিস্তৃত ১০ একর ভূমিতে উন্নতি হয়েছে। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সুন্দর ও মনোরম, সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যময় করণের প্রায় সকল কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা যায়।

হিযরতের পনের শততম বার্ষিকী পালনের জন্য ১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই নতুন শতাব্দী উদযাপন করে। যেন নতুন যুগে সূচনা হয় ঐক্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধির এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বিচক্ষণপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে এই অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। অধ্যাদেশ অনুযায়ী এমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে পদচারণা, ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে উন্নতি লাভ করা এবং সমাজ বির্নিমাণে মানুষের চিন্তা সংস্কার করা। শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচী চালু রাখার পাশাপাশি ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নৈতিকতার উন্নতি সাধন করা। এজন্য আয়োজন করা হয়েছে পরিচিত কোর্স, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং অন্যান্য পারস্পরিক কারিকুলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষাগত দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল– সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী শিক্ষা-জ্ঞানকে একীভূত করা। বিগত ২৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রচিত কোর্সসমূহ এবং ইসলামী কর্মসূচীর মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী নেতাদের যারা বিগত শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। চিন্তা, আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবেই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের সমৃদ্ধশালী শিক্ষা ঐতিহ্যসহ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং নদওয়াতুল ওলামা কর্তৃক রচিত শিক্ষা-ঐতিহ্য এবং শিক্ষাবিদদের একত্রিতকারী প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য দক্ষ বিচারকমণ্ডলী তৈরি করা। বড় বড় ইসলামী শিক্ষাবিদ, যোগ্য অর্থনীতিবিদ, পেশাগত বাণিজ্য নির্বাহকারী, স্পষ্টভাষী সাহিত্যিক ও মেধাবী গবেষক প্রস্তুত করা এবং একদিকে ইসলামের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি অপরদিকে জ্ঞানের গভীরতা ও প্রগাঢ়তা সৃষ্টি করা।

বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান মান ও সফলতার পেছনে কর্তৃপক্ষের কঠোর প্রচেষ্টা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- পরীক্ষা তফসিল অনুসারে ফলাফল প্রদান করা হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাঘাতের জন্য পড়াশুনায় কোন বিচ্যুতি ঘটে না। ভর্তি করা হয় সর্বদা মেধার ভিত্তিতে। অদ্যবধি কেউ কোন রকম আপত্তি তুলতে পারেনি এবং এখানে শিক্ষামূলক আরো কিছু করা হয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এজন্য এখানকার ছাত্র, শিক্ষক মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। ইনশাআল্লাহ নতুন ক্যাম্পাসেও এই চেতনা অব্যাহত থাকবে। নতুন নতুন বিভাগ এবং বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে অবশ্যই অনেক অনেক বেশি কাজ করতে হবে। যাহোক সেই মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন হবে না যে সেবা এবং শিক্ষা ১৯৮৫ সাল থেকে আন্ত র্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানবতার জন্য দিয়ে আসছে।

পটভূমি

সকল আন্দোলন ছিল ঐ সকল মানুষকে শিক্ষিত ও উন্নত করার জন্য যে সকল মুসলমানরা ঐ সময় সমস্যাকবলিত ছিল। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে। মুসলমানদের হারানো শক্তি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক শিক্ষিতদের নেতৃত্ব করা।

শিক্ষা আন্দোলনে যেমন দারুল উলূম দেওবন্দ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স, নদওয়াতুল ওলামা, আঞ্জুমান হেমায়েত-ই-ইসলাম লাহোর জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লী ইত্যাদি। যা পরিবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষার প্রবর্তনে সহায়তা করেছে।

উপরোল্লিখিত শিক্ষা আন্দোলন বিভিন্নভাবে শুরু হয়ে ছিলো মুসলমানদের অনন্য চিন্তা ও ধারণা থেকে এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– মাওলানা কাসেম নানুতবী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাওলানা শিবলি নোমানী, আল্লামা

ইকবাল, সৈয়দ সুলাইমান নদভী, ড. জাকের হুসাইন, সাহেব জাদা আব্দুল কাইয়ূম, হাসান আলী আযেন্দী, মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী এবং অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদগণ। কিন্তু শিক্ষার সমস্ত আন্দোলনই মুসলমানদের কৃপণতার জন্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য থামাতে গিয়েছিল। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা হয়েছিল যাতে মুসলমানরা একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। এর মধ্যে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো শুধু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কিন্তু আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামীয়া কলেজ, পেশোয়ার, আঞ্জুমান হেমায়েত-ই-ইসলাম এবং জামিয়া মিল্লিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য।

উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক সময়কালে এটা উপলব্ধি করা হয়েছিল যে, মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীসের সাথে সমন্বয় রেখে বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যাকে শিখতে হবে এবং গবেষকরা এগুলো থেকে ধারণা নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে সাজানো হবে যাতে শিক্ষার্থী দীন ও ইসলামী সভ্যতা সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত হতে পারে। এই সূত্র ধরেই ইসলামী বিশ্বে ইসলামী সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজিত হচ্ছে। যাতে ইসলামী চিন্তাবিদরা উপরোল্লিখিত মতামত ব্যক্ত করছেন। যাতে করে উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের পরিকল্পনার সার বস্তু উপস্থাপন করেছেন।

উপনিবেশবাদের পরে

এ উপমহাদেশ বিগত পাঁচ দশকে এক চরম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মুসলিম বিশ্বে এক নতুন জাগরণ হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতার দর্শনের অংশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ (কর্মশালা) এবং সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এর বেশির ভাগ কার্যক্রমই সংঘঠিত হয়েছিল মুসলমানদের দ্বারা। পাশাপাশি অনেক আয়োজন হয়েছিল আমাদের অমুসলমান বন্ধুদের দ্বারা যারা এই নতুন ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলো, কনফারেন্সগুলো অনুষ্ঠিত হতো আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর।

এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মুসলিম পণ্ডিতদের সুপারিশে ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এর পাশাপাশি ইসলামী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করা হয়। যার নাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন প্রকল্পভাবে হাতে নিতে উৎসাহিত করে যা তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধান সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা মুসলিম বিশ্বে একই সাথে আধুনিক ও ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়েছে। এটি আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য সার্বজনীন এক ইসলামী মূলনীতি সরবরাহ করে থাকে।

উদ্দেশ্যসমূহ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

* ব্যক্তি এবং সমাজের বহুবিধ ও সুশৃঙ্খল উন্নতি সাধন।
* ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাকে পুনর্গঠিত করণ।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন সাধন।
* ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, সামাজিক, প্রাকৃতিক ফলিত এবং যোগাযোগ বিজ্ঞানসহ এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখার শিক্ষাকে উৎসাহিত ও প্রবর্তিত করণ।
* আদর্শিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী ধারণা এবং মূলনীতি অনুযায়ী আদব কায়দা শিক্ষাদানে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
* শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত।

নতুন ক্যাম্পাস

পাকিস্তান সরকার সদয়ভাবে ইসলামাবাদে সেক্টর এইচ-১০ এ-৭০৪ একর (সাতশত চার একর) জমি বরাদ্দ দিয়েছেন এই জায়গাতে পুরনো ক্যাম্পাস স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং ইহা অদূর ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। বর্তমানে দুটি একাডেমিক ব্লক এবং হোস্টেল ব্লক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে সকল শিক্ষা কার্যক্রম নতুন ভবনে। এছাড়া মহিলাদের ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি একাডেমিক ব্লক এবং দুটি হোস্টেল ব্লক করা হয়েছে। নতুন ভবনের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ফেছ ওয়ান এর স্টেইজ ওয়ান সম্পন্ন করা হয়েছে এবং স্টেপ টুও প্রায় সম্পন্ন। যখন নির্মাণ কাজ হবে। (২০ হাজার ছাত্র এবং ১০

হাজার ছাত্রী) ২২-২৫ টি অনুষদে। এ ছাড়াও এখানে ছাত্রদের জন্য থাকবে ৫৭টি হোস্টেল ব্লক এবং ছাত্রীদের জন্য থাকবে ২২-২৫টি অনুষদে। এছাড়াও এখানে ছাত্রদের জন্য থাকবে ৫৭টি হোস্টেল ব্লক এবং ছাত্রীদের জন্য থাকবে ২৮টি হোস্টেল ব্লক, শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের জন্য থাকবে আলাদা আলাদা জায়গা।

বিশিষ্ট স্থপতিদের দ্বারা ভবনের নকশা করানো হয়েছে। সমস্ত অবকাঠামো সুন্দর সুন্দর জায়গায় করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্থপতি ইসলামের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ছাপ বহন করে।

এছাড়াও প্রশাসনিক ভবন শিক্ষা বিভাগসমূহ, বিভিন্ন অনুষদ, একাডেমিক ভবন, সুন্দর কেন্দ্রীয় মসজিদ, আবাসিক ছাত্র এ কর্মচারীদের জন্য একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ও অনেক দোকান রয়েছে। যখন সকল স্থাপত্য সম্পন্ন হবে তখন এটি পাকিস্তানের স্থাপত্য জগতের এক চমকপ্রদ স্থান দখল করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য

* পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
* বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সংবিধান তৈরি করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে।
* ২৩ ডিপার্টমেন্টসহ ৮টি অনুষদ, ৪টি কেন্দ্র, ২টি একাডেমি ও ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে।
* ৫৭টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৭,০০০/০০ (সাত হাজার)।
* ১৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পিএইচডি এবং এমফিলের জন্য গবেষণা করছেন।
* ২৫০ জন ফুলটাইম শিক্ষক রয়েছেন যারা আমেরিকা, ইউরোপ, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ১৯৮৫ সাল থেকে সহস্রাধিক গবেষণাসহ অসংখ্য বই লিখেছেন।
* শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একই সাথে ইংরেজী ও আরবী ভাষা ব্যবহার করা হয়।
* ভর্তি যারা হয় মেধাভিত্তিক, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে, সাক্ষাত গ্রহণ করে এবং অতীত পড়াশুনার রেকর্ড দেখে।
* যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একাডেমিক কাঠামো

বর্তমানে পাকিস্তান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন বর্ণিত অনুষদ, প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিসমূহ রয়েছে।

১. শরীয়াহ ও আইন অনুষদ।

১) ফিকাহ বিভাগ। ২) উসূলে ফিকাহ বিভাগ। ৩) আইন বিভাগ

ভবিষ্যতে যেসব অনুষদ যুক্ত হতে যাচ্ছে :

দেওয়ানী আইন বিভাগ। পাবলিক আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক আইন বিভাগ, ইফতা।

২. **উসূলে দীন বা ইসলামী শিক্ষা অনুষদ** : ১) তাফসীর এবং বিজ্ঞান বিভাগ, ২) আদব এবং বিজ্ঞান বিভাগ ৩) দাওয়া এবং ইসলামী সভ্যতা অনুষদ, ৪) আকিদা ও দর্শন অনুষদ, ৫) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগ। ৬) ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগ।

৩. **আরবী অনুষদ :** ১) সাহিত্য বিভাগ, ২) ভাষা বিভাগ।

৪. **ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ :** ১) ইংরেজী সাহিত্য বিভাগ, ২) ফারসী বিভাগ।

৫. **ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান অনুষদ** : ১) ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ, ২) প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা অনুষদ, ৩) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র **(IMDC)**।

৬. **ফলিত বিজ্ঞান অনুষদ** : ১) কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, ২) টেলিকমিনিকেশন ইনঞ্জিনিয়ারিং এ কম্পিউটার বিজ্ঞান অনুষদ, ৩) গণিত বিভাগ।

৭. **সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ :** ১) রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২) শিক্ষা বিভাগ।

৮. **আন্তর্জাতিক অর্থনীতি অনুষদ :** ১) অর্থনীতি স্কুল, ২) ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি স্কুল, ৩) অর্থনীতি ও অর্থায়ন ব্যবস্থা বিভাগ, ৪) ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন বিভাগ।

৯. **মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র** : ১) আরবী ভাষা বিভাগ, ২) ইংরেজী ভাষা বিভাগ, ৩) ইসলামী শিক্ষা বিভাগ।

১০. **প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য ইকরা সেন্টার।**

১১. **ফয়সাল মসজিদ ইসলামী কেন্দ্র।**

১২. নতুন যে সকল **বিষয় সংযুক্ত হতে যাচ্ছে**-প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ অনুষদ, ঔষধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ।

স্বপ্নের শহর রাওয়ালপিন্ডি

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও সেনানিবাস। এটি একটি জেলা ও বিভাগীয় প্রধান কেন্দ্র, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেন্দ্র এবং ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ হতে পাকিস্তানের অস্থায়ী রাজধানী ছিল। জাতীয় (আন্তর্জাতিক) মহা সড়কের পার্শ্বে লাহোর হতে ১৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিম এবং পেশোয়ার হতে ১০৮ মাইল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে রাওয়ালপিন্ডির অবস্থান। রাওয়ালপিন্ডি নামকরণের সূত্র এইরূপ যে, কোন এক কালে এখানে তাঁতী ও জোলাদের রাওল গোত্রের দ্বারা আবাদকৃত একটি গ্রাম ছিল। বর্তমানে সেনানিবাসের নিকটেও কোন প্রাচীর শহরের কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। শহরটি তাতারী আক্রমণের মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুখখর সরকার ঝুগে খান শহরটি পুনরায় আবাদ করে এবং এর নাম রাখে পিন্ডি অথবা রাওয়ালপিন্ডি। ১৭৬৫ খৃ. শিখ সরদার মালকা সিংহ এটা দখল করে ঝিলাম ও শাহপুরের ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদেরকে এখানে এনে পুনর্বাসিত করে। ক্রমান্বয়ে বসতিটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আফগানিস্তানের নির্বাসিত আমীর শাহ গুজা ও তাঁর ভাই শাহ যামান এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুজরাটের যুদ্ধের পরে ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের ১৪ মার্চ ছত্র সিংহ ও শের সিংহের শিখ বাহিনী সর্বশেষ এই স্থানেই ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিয়েছিল। এরূপে অঞ্চলটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনামলে এখানে সেনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ইহাকে প্রধান জেলা ও বিভাগীয় শহলে উন্নীত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে রাওয়ালপিন্ডি ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ সেনানিবাস হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা পাক সেনাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র ও সেনানিবাসে পরিণত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শহর ও সেনানিবাসের পরিধি ও জাঁকজমক বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূল শহরের উত্তর দিকে মারী সড়কের প্রান্ত ধরে একটি উপশহর গড়ে উঠেছে এবং এর পরবর্তী অংশেই নির্মিত হয়েছে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাদ। লিয়াকত খান, আইয়ূব ন্যাশনাল পার্ক ও রাওল ড্যাম (বাঁধ) এখানকার উল্লেখযোগ্য বিনোদনকেন্দ্র। রাওয়ালপিন্ডি এর সংলগ্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্রের মর্যাদাও লাভ করিয়েছে। এখানে তিনটি ডিগ্রী কলেজ ছাড়াও কয়েকটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক

বিদ্যালয় এবং একটি পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে এখানে রয়েছে একটি বৃহদাকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, তৈল পরিশোধনাগার লোহা ও ইস্পাতের কলকব্জা ও যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, গ্যাস কারখানা, তাঁবু তৈরির কারখানা এবং সূতী ও রেশমী বয়ন শিল্পেন কারখানা। এখানকার মর্মর পাথর তৈরির কুটির শিল্পও উল্লেখের দাবী রাখে।

চাকলালা সেনানিবাসে বিমান বন্দর রয়েছে। রাওয়ালপিন্ডি জেলার আয়তন ২০২২ বর্গমাইল। এখানকার আবহাওয়া সামগ্রিক বিচারে মোটামুটি সমভাবাপন্ন ও স্বাস্থ্যকর। সমভূমি অঞ্চলের তুলনায় এখানকার শীতঋতু দীর্ঘ এবং গ্রীষ্ম ঋতু তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য (রাওয়ালপিন্ডিতে বার্ষিক ৩৬ ও পাহাড়ী অঞ্চলে বার্ষিক ৫৩)। এখানকার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে গম, যব ও বাজরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-পশ্চিম হতে আগত ভারত আক্রমণকারীদের পথিমধ্যে হওয়ার কারণে রাওয়ালপিন্ডির ইতিহাস বহুল পরিমাণে পাঞ্জাবের ইতিহাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচীন ইতিহাসে জেলাটিকে গান্ধারার অংশরূপে দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে এর গুরুত্ব স্বীকৃত (সামরিক দৃষ্টিকোণ হতে এর গুরুত্ব ও প্রাধান্য বহিরাক্রমকারীদের প্রবেশদ্বার হওয়া ছাড়াও বৃটিশ পূর্ব ও পরবর্তী যুগে স্থায়ী ও প্রধান সেনানিবাস হওয়ার দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে রয়েছে; পুরাতন শহর হতে প্রায় দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন নগরী তক্ষশীলার ভগ্নাবশেষ ও ধ্বংস গহবর রয়েছে।) বৌদ্ধ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মানকিয়ালে দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে অপর একটি প্রাচীর ছোট শহর রোওয়াত হতে নয় মাইল দূরবর্তী স্থানে প্রস্তর যুগের কতিপয় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ রাওয়ালপিন্ডি বিভাগ গঠিত। ঝিলার, গুরজাট, আটক ও রাওয়ালপিন্ডি জেলাসমূহ এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ভূমি অর্ধ সমতল ও অর্ধ পার্বত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লবণ পর্বত দ্বারা ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বের গুজরাট জেলার অধিকাংশ সমভূমি অঞ্চল এবং অবশিষ্ট তিনটি জেলা পোটুহার মালভূমির অন্তর্ভুক্ত।

মারী

পাকিস্তানের একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানের নাম মারী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট। স্থানটি ৩৩ ডিগ্রী ৫৪ মি. উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৩ ডিগ্রী ২৬ মি. পূর্ব দ্রাঘিমাংশে রাওয়ালপিন্ডি হতে ৩৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। একটি পাকা রাস্তা উভয় স্থানকে সংযুক্ত করেছে। রাওয়ালপিন্ডি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সাওয়ান নদী এবং তার সহযোগী খাল- রাওয়ালপিন্ডির কাছে যার ওপর রাওয়াল বাঁধ নির্মিত হয়েছে, উভয়টিই মারী শহরের নিকট হতে বের হয়েছে। মারীর প্রস্তরভূমি ভূ-ত্বকের গঠন বিন্যাসের তৃতীয় যুগে গঠিত। এর পাহাড় হিমালয় পর্বতমালার পশ্চিমাংশীয় শাখাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। উক্ত পাহাড় পূর্বদিকে রাওয়ালপিন্ডি জেলায় অবস্থিত কাহুটা পর্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে মারগালার পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। রাওয়ালপিন্ডি হতে সাড়ে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তারবাট নামক স্থান হতে পাহাড় আরম্ভ হয়।

পাহাড়ের তিন হাজার হতে ছয় হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে পীল এবং সেখান থেকে উপরের দিকে বেয়ার ও দেবদারু গাছ রয়েছে। যে পাহাড়ের উপর মারী শহরটি অবস্থিত, তার দু'টি প্রান্ত রয়েছে। এক প্রান্তের নাম পিন্ডি পয়েন্ট এবং অপর প্রান্তের নাম কাশ্মীর পয়েন্ট। পিন্ডি পয়েন্টে এর উচ্চতা ৭২৬৬ ফুট। উক্ত পয়েন্ট হতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে কাশ্মীর পয়েন্ট অবস্থিত। কাশ্মীর পয়েন্টে এর উচ্চতা ৭৫০৭ ফুট। মারীর উচ্চতম স্থান কাশ্মীর পয়েন্ট ও পিন্ডি পয়েন্টের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। উক্ত উচ্চতম স্থানের উচ্চতা ৭৫১৭ ফুট। কাশ্মীর পয়েন্ট ও পিন্ডি পয়েন্ট মল রোড নামীয় একটি পাকা সড়ক দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। পিন্ডি পয়েন্ট হতে কাশ্মীর পয়েন্ট পর্যন্ত পাহাড়ের উভয় দিকেই ভবনাদি নির্মিত থাকলেও অধিকাংশ ভবন পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম ঢালেই অবস্থিত। ভবনগুলো প্রশস্ত ও সহজ চলাচলযোগ্য পাকা সড়কসমূহ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে মূল রোড হচ্ছে দীর্ঘতম সড়ক।

ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বৃষ্টি ও তুষারপাতের দরুণ মারীতে তীব্র শীত পড়ে। রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও নিচে নেমে যায়। নভেম্বর ও এপ্রিল মাসে তুষারপাত হয়ে থাকে। এপ্রিল হতে অক্টোবর পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমটি অত্যন্ত মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। জুন ও জুলাই মাসে গরম পড়লেও

তাপমাত্রা খুব কমই, ৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপর উঠে থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে কখনও কখনও বৃষ্টি হয়, কিন্তু জুলাই ও আগস্ট মাসে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৮ ইঞ্চি। সারা বৎসরে প্রায় ১৪০ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ খৃস্টাব্দে মারীর লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৪৮৬ জন। উক্ত লোকসংখ্যার মধ্যে সেনা ছাউনীর ৬,৮১০ জন সৈন্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সহজেই বুঝা যায় যে, গ্রীষ্মকালে উক্ত জনসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মারীর মূল অধিবাসীরা হাজারা জিলা ও আযাদ কাশ্মীরের লোকদের সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখে। তারা সমতলভূমির অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর কঠোর স্বভাবের অধিকারী।

মারীর আশেপাশে একাধিক চিত্ত-বিনোদন কেন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে সেব, আলুচা, আয়ু, আঙ্গুর, আখরোট, নাশপাতি ও বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান রয়েছে। এই সকল গ্রামে মকাই, আলু, ও ধানের চাষ হয়ে থাকে।

মারী শিখদের অধিকারে চলে যাবার পূর্বে তা গাকখাড়গণের অধিকারভূক্ত ছিল। গাকখাড়দের রাজধানী ছিল ফাড়ওয়ালা। ১৮50 খৃস্টাব্দে ইংরেজরা মারীকে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে নির্বাচিত করে। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে মারী অঞ্চলের যুদ্ধে মারী অঞ্চলের ঢান্ড উপজাতীয় লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থনে মারী আক্রমণ করেছিল। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মারী পাঞ্জাবের প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাজধানী নির্ধারিত হয়। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবার পর হতে তার রাষ্ট্রপ্রধান প্রতি বৎসরই কিছু সময় মারীতে অতিবাহিত করে থাকেন। অনেক বিদেশী দূতাবাসই এখানে তাদের শাখা কার্যালয় স্থাপন করেছে। এখানে অতি সম্প্রতি টাউন হল নির্মিত হয়েছে।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দে মারীতে হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে এখানে সিটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে স্থাপিত যক্ষ্মা নিরাময় কেন্দ্রটি এর সামিলী নামক স্থানে অবস্থিত। মারীতে স্নাতক পর্যায়ের একটি সরকারী কলেজও রয়েছে, পৌরসভা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাওয়ালপিন্ডি প্রভৃতি শহরসমূহের সাথে মারীর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে মারীর পথে কাশ্মীরের সাথে পাকিস্তানের বাণিজ্য চলত। মারীতে নাইবে তাহসীলদার, দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি এবং প্রশাসনিক বিভাগের শাসনকর্তাও নিযুক্ত রয়েছেন। লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডি হতে বিভিন্ন যানবাহন প্রতিষ্ঠানের বাসসমূহ নিয়মিতভাবে মারীতে যাতায়াত করে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

গুজরাওয়ালার পথে

✍ ফজরের নামাযের পর তাড়াতাড়ি নাস্তা খেয়ে রাওয়ালপিন্ডির ফয়যাবাদ বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে ইদারায়ে উলূমে ইসলামী হতে সবার থেকে বিদায় নিয়ে অশ্রুসজল চোখে রওয়ানা হই। রাতেই হযরত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিই। রাতের খানাও তাঁর বাসায় খাই। আমার জন্য হরেক রকমের খানা তৈরি করা হয়। ইসলামাবাদ থেকে রুপচাঁদা মাছও আনা হয়। মোটকথা, মেহমানদারীতে কোন রকম কার্পণ্য করা হয়নি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এ মাদরাসার সকলের কাছে অনেক আপন হয়ে গিয়েছিলাম। মাওলানা রাহাত আলী, মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা হোসাইন, কারী মাহবুব ইলাহী সকল উস্তাদের সাথে বৈঠক করেছি। ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে ছাত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। ঢাকাতে এ ধরনের একটি মাদরাসা কায়েম করার লক্ষ্যে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন তার মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা হাসেল করেছিলাম। রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই মাওলানাকে ঢাকায় আসার দাওয়াত দিতে ভুল করিনি। তিনি দাওয়াত কবুল করেন।
মাদরাসা থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ফয়যাবাদ বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই। গুজরাওয়ালা অভিমুখী একটি হিনো কোচের টিকিট করি। এটি একটি বড় বাসস্ট্যান্ড। পিন্ডি থেকে লাহোর, পেশোয়ার, করাচী, কাশ্মীরসহ সকল দূর পাল্লার বাস এখান থেকে ছেড়ে যায়। পাকিস্তানে এটিই ছিল আমার দূর পাল্লার বাসজার্নী। সকাল ৭-৩০ এ গুজরাওয়ালার দিকে যাত্রা শুরু হয়। প্রশস্ত হাইওয়ে রাস্তায় দ্রুতবেগে বাস চলছিল, মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্টেশনে বাস থামছিল। রাস্তার দুপাশের মনোরম অট্টালিকা এবং সবুজ ক্ষেত খামারের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে প্রায় ১২টার দিকে গুজরাওয়ালা শহরে পৌঁছে যাই।

মাওলানা যাহেদুর রাশেদীর সাথে কিছুক্ষণ

গুজরাওয়ালা শহরের আমার আকর্ষণ ছিল গুজরাওয়ালা নছরাতুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীস, আশ শরীয়া একাডেমীর চেয়ারম্যান এবং খ্যাতিনামা কলামিস্ট, চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা যাহেদুর রাশেদী। মাওলানা

রাশেদী পাকিস্তানের বিখ্যাত বুযুর্গ আলেম এবং লেখক, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সারফরাজ খান সাহেবের সুযোগ্য সাহেবজাদা।
মাওলানা রাশেদী সাহেব ২০০৪ সালে ঢাকার মিরপুরের মাদরাসা দারুর রাশাদের তত্ত্বাবধানে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এডুকেশন সেন্টারের উদ্যোগে ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আয়োজিত 'নতুন শতাব্দীর চাহিদা ও ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় প্রায় সপ্তাহব্যাপী হযরত মাওলানাকে একেবারে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আসলে তিনি একজন বিজ্ঞ আলেমে দীন, শায়খুল হাদীস এবং একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এবং লেখনীর ময়দানে বিচরণকারী একজন দরদী আলেমেদীন। তার জীবন খুবই সাদাসিধে। তিনি লন্ডনের ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরামের সেক্রেটারী জেনারেল। এ সুবাদে আমার লন্ডন সফরের সময়, ফোরামের চেয়ারম্যান লন্ডনের মাওলানা ঈসা মানসুরী সাহেবের বাসায় এবং লন্ডনের ইবরাহীম কম্যুনিটি কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ সফরের কিছুদিন পূর্বেও মাওলানা মানসুরী সাহেবের বাসায় দেখা হয়েছিল।
যা হোক, করাচী পৌঁছে ১৭ নভেম্বর শুক্রবার দিন সকালে ফজরের নামাযের পর হাঁটতে বের হয়েই দৈনিক ইসলামী পত্রিকা সংগ্রহ করে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতেই দেখলাম ইদারায়ে উলূমুল ইসলামীর কনভেশন সম্বলিত বিরাট পোস্টার। আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা রাশেদী সাহেবের নাম দেখে মনের মধ্যে খুশির শিহরণ বয়ে যায়। শনিবার দিন সন্ধ্যার পূর্বেই ইসলামাবাদ পৌঁছে মাওলানার ফোন নম্বর যোগার করে ফোন করি। আমার ইসলামাবাদ আগমনের কথা জানতে পেরে তিনি যারপরনাই খুশী হন। হালপুরসী করেন। ঢাকার সবার কথা জিজ্ঞেস করেন। আগামীকাল সকাল ১১টায় কনভেশনে দেখা হবে বলে আমাকে আশ্বস্ত করেন। সকাল ৯টায় ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর কনভেশন শুরু হয়। একে একে মেহমানরা আসতে থাকেন। সত্যিই ১১টার দিকে মাওলানা হাজির হন। আমি পাশে গিয়ে মুসাফা মুআনাকা করি। কথাবার্তা হয়। বিকেলে বিদায় হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে গুজরাওয়ালায় তাঁর বাসায় দাওয়াত দেন। সে সুবাদেই গুজরাওয়ালা হাজিরী। রাতে ফোন করে মাওলানার সাথে যোগাযোগ করে নিয়েছিলাম। ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। বাস থেকে নেমে ট্যাক্সী নিয়ে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত শেওয়াবাদ এলাকায় গুজরাওয়ালা জামে মসজিদে হাজির হই। হযরতের সাথে মসজিদ সংলগ্ন বাস ভবনে দেখা হয়। জুমার

দিন থাকায় তাড়াতাড়ি গোসল সেরে জুমার প্রস্তুতি নিলাম। মাওলানার অনুরোধে জুমার পূর্বে আধা ঘণ্টা বয়ান করি। নামায বাদ খানা খেয়ে মাওলানার সাথে শহর দেখার জন্য বের হয়ে পড়ি। গুজরা শব্দের অর্থ মহিষ। মনে হয় এ শহরের প্রাচীন অধিবাসীরা বেশি বেশি মহিষ পালত। পুরনো ধাঁচের শহর। গুজরাওয়ালা থেকে লাহোর মাত্র ১ ঘণ্টার বাস জার্নী। লাহোর, ফয়সালাবাদ কাছের শহর। আমরা প্রথমেই ফয়সালাবাদ সড়ক দিয়ে চলে গেলাম শরীয়া একাডেমীর নতুন জায়গা দেখার জন্য। সমাজের কিছু নতুন চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ফারেগ ওলামায়ে কেরামের জন্য মেন শহরে মাওলানা শরীয়া একাডেমী নামে একটি দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত নতুন জমিতে পৌছে গেলাম। সুহৃদ এক ভাই এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ৩ বিঘা জমি দান করেছেন। ২টি নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। খুবই নিরিবিলি পরিবেশ। জুমার দিন আসরের নামাযের পর দুআ কবুলের সময়। দুজনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রাণ খুলে দুআ করলাম।

সন্ধ্যায় শরীয়া একাডেমীর হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিরাট বড় লাইব্রেরী হলে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হয়। আমাদের সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এডুকেশন সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করি। আমার কাছ থেকে একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়। এরপর আমরা চলে যাই শহর থেকে দূরে কাসেমুল উলূম তাফহীমুল কুরআন মাদরাসায়।

এ এলাকার সব চেয়ে বড় মাদরাসা। মাওলানার অনুরোধে এশার নামাযের পর আধাঘণ্টা বয়ান করি। বয়ানের পর খানা খেয়ে, মাওলানার বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। সকাল ৭.৩০ মিনিটে বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য হযরত চলে যান শহরের নছরাতুল উলূম মাদরাসায়। আমি বাসায় নাস্তা খেয়ে অন্য এক সাথীর সাথে মাদরাসায় গিয়ে দেখি হযরত বুখারী শরীফের দরস দিচ্ছেন।

এটি অনেক বড় একটি মাদরাসা। পাকিস্তানের বড় বড় মাদরাসাগুলোর মধ্যে এ মাদরাসা গণ্য হয়। মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব অসুস্থ। তিনি অনেক বড় আলেম ও বুযুর্গ। তার সাথে দেখা করে দুআ নিলাম। সাবেক শায়খ হযরত মাওলানা সারফারাজ খান, হযরত মাওলানা রাশেদী সাহেবের আব্বাও অসুস্থ। তিনি বেশ দূরে থাকেন, মাদরাসায় আসতে পারেন না বিধায় দেখা হল না। অবশ্য কয়েক বছর পূর্বের লাহোর সফরে খুদ্দামুদ্দীন মাদরাসায় দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। দরস শেষ হলে চা পান করে হযরত রাশেদী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকাল ১০.৩০ এ লাহোরের উদ্দেশ্যে বাসে উঠে বসি।

আশ-শরীয়া একাডেমী

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

আশ-শরীয়াহ একাডেমী ১৯৮৯ সাল থেকে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ, ইসলাম বিরোধী চক্র চিহ্নিতকরণ ও তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ইসলামী হুকুম-আহকাম ও নিয়মনীতির ওপর উত্থাপিত প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসন, ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতা সৃষ্টি এবং নবীন প্রজন্মের চৈন্তিক ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মতৎপর রয়েছে। গুজরানওয়ালার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব এবং মাদরাসা নুসরাতুল উলূম, গুজরানওয়ালার সদরে মুদাররিস মাওলানা যাহেদুর রাশেদী একাডেমীর (পরিচালক) ডাইরেক্টর, হাফেজ মুহাম্মাদ আম্মার খান নাসের (এম.এ ইংরেজী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-মাদরাসা নুসরাতুল উলূম গুজরানওয়ালা) ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ ইউসুফ (ফাযেলে মাদরাসা নুসরাতুল উলূম, গুজরানওয়ালা) নাজেম হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

বিগত চার বছর ধরে জি.টি. রোড, গুজরানওয়ালার উপর কঙনীওয়ালা বাইপাস এর নিকটে 'সরতাজ' ফ্যান এর পেছনে হাশেমী কলোনীতে এক কাঠা জমির উপর একাডেমীর তিনতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। এর কিছু অংশের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় দুই বছর পূর্বে একাডেমীর শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম নির্মাণাধীন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম

মাসিক আশ-শরীয়াহ

অক্টোবর ১৯৮৯ ঈসায়ী হতে শিক্ষা ও গবেষণামূলক পত্রিকা মাসিক আশ-শরীয়াহ নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। যাতে মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন সমস্যা, সংকট এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিশিষ্ট লেখকদের নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে সাপ্তাহিক কলাম

একাডেমীর ডাইরেক্টর মাওলানা যাহেদুর রাশেদী সাহেবের সাম্প্রতিক বিষয়ে তাত্ত্বিক ও চিন্তামূলক বিভিন্ন নিবন্ধ "রোজনামায়ে ইসলাম, করাচী" -তে 'নাওয়ায়ে হক' শিরোনামে এবং "রোজনামায়ে পাকিস্তান, লাহোর" -এ 'নাওয়ায়ে কলম' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। "রোজনামায়ে ইসলাম এর–

প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ ইন্টারনেটে **WWW. daily pak.com** ঠিকানায় কলাম সেকশনে পড়া যায়।

উর্দূ ওয়েবসাইট

২০০২ ঈসায়ী সনে উর্দূ ভাষায় ইসলামী ওয়েবসাইট **WWW. al-sharia.org** খোলা হয়েছে। যাতে মাসিক "আশ-শরীয়াহ" ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পড়া যেতে পারে।

দরসে কুরআন ও হাদীস এবং বয়ান

আশ-শরীয়াহ একাডেমী তার পার্শ্ববর্তী শহরসমূহের বিভিন্ন স্থানে আরবী ভাষা শিক্ষা, কুরআন ও হাদীসের দরস এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে বয়ান ও বক্তৃতার মাধ্যমে তা'লীম ও তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

তালীমি ও তরবিয়তী কর্মতৎপরতা

তরবিয়তী কর্মসূচী

২০০৩ ঈসায়ী সনের ডিসেম্বর মাসে এই একাডেমী দীনী মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য এক পরামর্শ সভা ও তরবিয়তী কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে। যাতে দীনী মাদরাসার শিক্ষা ও পাঠদান পদ্ধতি এবং ছাত্রদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়। অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে আরও অধিক পরিমাণে পরামর্শ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স

২০০৩ ঈসায়ী থেকে দীনী মাদরাসার ফারেগ ছাত্রদের জন্য এক বৎসরব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। যাতে তাদেরকে আন্তর্জাতিক আইন ও ইসলামী আহকামের তুলনামূলক শিক্ষা, জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রাথমিক পরিচিতিমূলক পাঠ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, আরবী ও ইংরেজী ভাষা, কম্পিউটার, প্রবন্ধ লিখন ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ থেকে নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ পড়ানো হয়। এ পর্যন্ত দশজন ছাত্র এই কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে আগামী বছরের জন্য ভর্তি চলছে। এ কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্রদের কাছ থেকে কোন ফিস নেয়া হয় না এবং তাদের থাকা, খাওয়া ও শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় ব্যয়ভার একাডেমী বহন করে থাকে।

তিন বছরব্যাপী বিশেষ কোর্স

হাফেজে কুরআন ছাত্রদের জন্য তিন বছরের এক বিশেষ কোর্সের সূচনা করা হয়েছে। যার প্রথম ব্যাচ বর্তমানে চালু রয়েছে। যাতে মেট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ছাড়াও ছাত্রদের আরবী ভাষা, তরজমায়ে কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ও সীরাতের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হয়।

আরবী কথোপকথন কোর্স

ধর্মীয় মাদরাসা ও স্কুল কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়সমৃদ্ধ আধুনিক আরবী কথোপকথন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

আরবী ভাষা ও তরজমায়ে কুরআনের ওপর ক্লাস

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরবী গ্রামারের পাশাপাশি কুরআনে কারীমের তরজমা এবং ধর্মের আবশ্যিক বিষয়সমূহের পরিচিতিমূলক কিছু ক্লাস চালু রয়েছে।

ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার ট্রেনিং

দীনী মাদরাসার ছাত্রদের জন্য ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের তিন মাস ব্যাপী কিছু কোর্স ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতি বছর এ ধরনের সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

ধর্ম শিক্ষা কোর্স

সাধারণ মানুষকে জীবন ধারণের সাথে সম্পর্কিত দীনী শিক্ষার সাথে পরিচিত করানোর জন্য চলতি বছর তিন মাসব্যাপী একটি শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছে।

একাডেমীর নির্মাণাধীন মসজিদে বাজামাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্য নাজেরায়ে কুরআনের ক্লাস নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালু রয়েছে।

'আশ-শরীয়া' ফ্রি ডিসপেন্সারী

স্থানীয় অধিবাসীদের চিকিৎসা সেবার সুবিধার জন্য ফ্রি ডিসপেন্সারী তথা বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রোগীদের সেবা প্রদান করে থাকে।

আশ-শরীয়াহ একাডেমী, গুজরানওয়ালা একটি নিখাঁদ শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, যার কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা নেই। যার সকল ব্যয়ভার নির্বাহ হয় সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার মাধ্যমে। সুধীজনের কাছে এ প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করার বিভিন্ন পন্থা রাখা হয়েছে। এর কয়েকটি হল-

১. কর্মসূচীর সফলতা ও কবুলিয়াতের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিশেষভাবে দু'আ করবেন।
২. কর্মসূচীর সফলতা ও উন্নতির জন্য আপনাদের কল্যাণধর্মী পরামর্শ, প্রস্তাব ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করবেন।
৩. একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাতে অংশীদার হওয়ার উপায় বের করবেন।
৪. নিজে এবং অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে একাডেমীর শিক্ষা ও নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সাধ্যানুসারে সহযোগিতা করবেন।
৫. অধিকন্তু, সঙ্গী-সাথীদের আশ-শরীয়াহ ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিবেন যাতে মাসিক আশ-শরীয়াহ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়তে পারে।
৬. লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কিতাব ও সিডি সরবরাহ করবেন।
৭. যদি কোন ম্যাগাজিন কিংবা ওয়েবসাইট আপনাদের অধীনে থাকে তবে তাতে একাডেমীর পরিচিতি প্রচার করবেন।
৮. আপনাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে তারা একাডেমীর শিক্ষা ও তরবিয়তী প্রোগ্রামসমূহ থেকে উপকৃত হতে পারে।
৯. ইসলামী শিক্ষা, হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন কর্মতৎপরতা, বস্তুবাদী কর্মসূচী যদি আপনাদের নজরে আসে তবে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।
১০. ফারেগীনদের জন্যে এক বছরব্যাপী বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কারও ব্যয়ভার নিজে বহন করবেন।
১১. আশ-শরীয়াহ ফ্রি ডিসপেন্সারীর জন্য নগদ দান কিংবা ঔষধ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য-সহযোগিতা করার বিচিত্র পদ্ধতি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এ সব উপায়ে কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা করা যায় তা আমার জানা ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লাহোরের পথে

✍ বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী লাহোরে পৌঁছে যাই। লাহোরে কোথায় উঠব -এ ব্যাপারে রাশেদী সাহেবের সাথে আলাপ করলে তিনি আমাকে তাঁর এক শাগরেদের ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন এবং আমার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেছিলেন। শাগরেদের নাম মাওলানা জামিলুর রহমান। তিনি লাহোরের বাগবানপুরা এলাকার একটি মসজিদের খতীব, কয়েকটি মাদরাসার পরিচালক ও একজন সমাজসেবক। আমি বাস থেকে নেমে ট্যাক্সী নিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যেই তার মসজিদে পৌঁছে যাই। একটু পরেই মাওলানা জামিলুর রহমান ভাইকে পেয়ে যাই। হালপুরছি করার পর সর্ব প্রথম আমার লাহোর-করাচীর রেল টিকেট বুক করার জন্য এবং এরপর শহর দেখার জন্য তার সহযোগিতা কামনা করি। তিনি সাথে সাথে তার একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাগরেদকে আমার সাথে দিয়ে দেন। আমরা মোটর সাইকেলে করে চলে যাই রেলের হেড অফিসে। কোন ট্রেনে স্লিপার সিট নেই শুধু বসে যাওয়ার সিট আছে। গনীমত মনে করে কারাকোরাম ট্রেনে ৮০০ টাকা দিয়ে পরদিন রবিবার বিকাল ৪.৩০ এর সিট নিয়ে মসজিদে ফিরে আসি। যোহরের নামায পড়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে এবার মাওলানা জামিলুর রহমান সাহেব তাঁর ভাই মাওলানা যাকাউর রহমানকে আমার সাথে দেন। যাকাউর রহমান ভাইয়ের মোটর সাইকেল নিয়ে আমরা প্রথমে বাদশাহী মসজিদ দেখতে বের হই। কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝতে পারি চীনের প্রেসিডেন্ট লাহোরে আসার কারণে আজ সারা রাস্তা বন্ধ। এরপরও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তাবলীগ মারকাজ দেখার জন্য রায়বেন্ড যাওয়া অথবা হযরত রায়পুরীর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা শাহ নফিসুল হুসাইনী সাহেবের সাথে দেখা করা যায় কিনা তা দেখার জন্য বিভিন্ন রাস্তায় যেয়ে অনেক চেষ্টার পরও সকল রাস্তা বন্ধ থাকায় ব্যর্থ মনোরথে মসজিদে ফিরে আসি।

রায়বেন্ড তাবলীগী মারকাযে কিছুক্ষণ

লাহোরে আমার হাতে সময় ছিল মাত্র ঐ দিন যোহর থেকে পরদিন অর্থাৎ শনিবার যোহর থেকে রবিবার যোহর পর্যন্ত। কারণ রবিবার ৪.৩০ এ ছিল আমার করাচীগামী ট্রেনের সময়সূচী। যাহোক আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর

নিজকে সঁপে দিয়ে মসজিদে অবস্থান করতে থাকি। পরদিন সকাল ১০টার পর আমাকে সময় দিতে রাজি হলেন। জামিলুর রহমান ভাইকেও অবস্থা জানিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ফজরের নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে জামিলুর রহমান ভাই এলান দিয়ে বললেন বাংলাদেশ থেকে আগত মাওলানা সালমান সাহেব আপনাদের সামনে কিছু কথা রাখবেন। আমার ছিল তাড়াহুড়া। তবুও কিছু বললাম। এরপর এশা পড়ে জামিলুর রহমান ভাই তার মোটর সাইকেলে করে বেশ কিছুদূর গিয়ে আমাকে রায়বেন্ড যাওয়ার বাসে উঠিয়ে দিলেন। ঐ বাসে প্রায় ২৫ মিনিট চলার পর অন্য বাস নিলাম। এ বাস সোজা রায়বেন্ড হয়ে আরো সামনে চলে যায়। লাহোর থেকে মুলতানের দিকে প্রায় ২০/২৫ মাইল দূরে পাকিস্তান তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকাযে চলেছি। বাসের মধ্যেই এক সাথী পেয়ে যাই। প্রায় ৪০ মিনিট পর রায়বেন্ড পৌঁছে যাই। এবারো চীনের প্রেসিডেন্টের বিপদ দেখা দেয়। তখন ঐ রোডেই চীনের প্রেসিডেন্ট একটি শিল্প এলাকা পরিদর্শনে আসছিলেন। পুরো রাস্তা ছিল পুলিশে ভরা। ভাবছিলাম আর বুঝি রায়বেন্ড দেখা হল না। যা হোক আল্লাহ আল্লাহ করে পৌঁছে গেলাম।

রায়বেন্ড মারকায বিরাট বড় এলাকা নিয়ে গঠিত। প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে মসজিদ, মাদরাসা, সাধারণ মেহমানখানা, বিদেশী মেহমানখানা, লাইব্রেরী ডাইনিং হল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ঐ সাথী আমাকে সবকিছু দেখাবার পূর্বে নাস্তা করিয়ে নিলেন। টোকেন দিয়ে রুটি ছালুন দিয়ে নাস্তা করি। অন্য হল রুমে এসে চা পান করলাম। এরপর ঐ সাথী সকল এলাকা অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সারা পৃথিবীতে এখান থেকে জামাত যাচ্ছে। দেখলাম সীমানের পাঠানরা এ কাজে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। ভাই আব্দুল ওহাব, ভাই মুশতাক, মাওলানা তারেক জামীল এ মারকাজের দায়িত্বশীলদের মধ্যে অন্যতম। সময়ের স্বল্পতার কারণে মারকাযে আর দেরী করতে পারলাম না। আবার লাহোরের দিকে ফিরে চললাম। কিছু দূর যেয়েই চীনের প্রেসিডেন্টের ঐ এলাকায় আগমনের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাসটি অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল ফলে লাহোর শহর পৌঁছতে আরো প্রায় এক ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। মেইন রেল স্টেশনের সামনে নেমে যাকা ভাইকে ফোন করলে তিনি বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন আমি এখনই আসছি। আমি অস্ট্রেলিয়ান বিল্ডি মসজিদে ওযু এস্তেঞ্জা করে নামায পড়ে রেল চত্বরের সামনে আসতেই যাকা ভাই এসে পড়লেন। এবার দ্রুত মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে আমরা প্রথমে চলে যাই বাদশাহী মসজিদ দেখার জন্য। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমরা কেলা এবং বাদশাহী মসজিদে প্রবেশ করি। বিরাট এ মসজিদটি মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কীর্তি।

লাহোরের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

লাহোর পাকিস্তানের অন্যতম প্রাচীন নগরী। ঐতিহাসিকরা এর ভিত্তি প্রস্তরের তারিখ সম্পর্কে শুধু কল্পনাই করে থাকেন। ঠিক কোন জায়গা থেকে লাহোর গড়ে উঠেছে তা খুব কমই জানা যায়। অনুমান করা হয়ে থাকে, লাহোর ইরাবতী নদীর বাম তীরেই গড়ে উঠতে শুরু করে। এখন লাহোরের তিন মাইল উত্তরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। দশম শতকে গজনীর বিজয়ী মুসলিম বীর মাহমুদ ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব থেকে লাহোর ছিনিয়ে নেন। লাহোরের শাসক হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত ক্রীতদাস মালিক আয়াজকে নিয়োগ করেন। ক্রমে গজনবী সুলতানাতের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়ে লাহোর। গজনবীর রাজ্য-সীমা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও লাহোর তার খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখে।

এবার লাহোর সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলছি। করাচীর তুলনায় লাহোর খুব ছোট এবং পুরোনো শহর। করাচীর কথা বাদ দিলেও রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশোয়ার যতটা সুন্দর লাহোর ততটা নয়। করাচী শহর হিসেবে গড়ে ওঠেছিলো ইংরেজদের হাতে, আর লাহোরের পত্তন মুসলমান শাসনামলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোদী বংশের সুলতানরা যখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন তখন মুলতান ও লাহোর ছিলো সে রাজ্যের প্রধান দুটি স্থান। তখন থেকেই লাহোর শহর হওয়ার মর্যাদা লাভ করে।

বাদশাহী মসজিদ

বাদশাহী মসজিদকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মসজিদ বলা হয়। জমিন থেকে অনেক উঁচুতে এর ভিত্তি। পূর্বদিক থেকে সুন্দর সাজানো সিঁড়ি নেমে গেছে। এর উঁচু খাস দরোজাটি মুঘলদের ঐতিহ্যবাহী। আকাশছোঁয়া মিনার আর মোটা গম্বুজওয়ালা মসজিদটি যদি প্রতিভার স্বাক্ষর না হয় তা হলে অন্ততঃ মুঘলদের সম্মানস্মারক তো বটে। এর দরোজাটি লাল মথুরা পাথরে তৈরি– নামায ঘরের প্রধান গম্বুজটির গায়ে ফুলের নক্শা কাটা। মাত্র চারটি পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লাহোরের শাহী মসজিদ। এর নির্মাণ কৌশল এমনই অদ্ভুত যে বাইরে যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে মসজিদের দিকে তাকালে মাত্র তিনটি পিলার চোখে পড়ে। ভেতরে ঢুকলে চারটি পিলারই দেখা যায়। অসাধারণ মোগল স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই শাহী মসজিদ।

লাহোর দূর্গ

বাদশাহী মসজিদের খাস প্রবেশ পথের ঠিক উল্টো দিকে লাহোর দূর্গের আওরঙ্গজেব গেট। দূর্গটি সম্পর্কে বেশ মজার ইতিহাস রয়েছে। মোট তিনটি

পর্যায়ে তৈরি হয়েছে দূর্গটি। প্রথমে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শাহজাহান আর শেষ পর্যায়ে রয়েছে আওরঙ্গজেবের অবদান। প্রথম পর্যায়ে তৈরি একটি বড় দেয়াল ঘেরা প্রাঙ্গণটি হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগে এর চতুর্দিকে ঘিরে ছিলো খিলানওয়ালা প্রকোষ্ঠ। শামিয়ানার নিচে মোঘল বাদশাহর দরবার বসতো এখানে। রাজদূত, আবেদনকারী, পরিদর্শক সবাই এসে এখানে রোজ ভীড় জমাতো মুঘল সম্রাটকে এক নজর দেখার জন্যে। সিংহাসন ঘরটি পাথরখচিত গম্বুজওয়ালা। দেখতে ব্যালকনীর মতো। বেলে পাথরের থামের ওপরে স্থাপিত। দরবারস্থানের মাঝখানে রয়েছে ঝর্ণা উচ্ছল একটি দীঘি। ফুল বাগানে চারদিক ঘেরা। মাটির নিচের এ কেল্লাতে আপদ বিপদের সময় সপরিবারে বাদশাহদের আত্মগোপন করার ব্যবস্থা ছিলো। একবার অভ্যন্তরে ঢুকতে পারলে খোঁজে বের করা ছিলো অসাধ্য ব্যাপার। খোঁজ করে বের করতে যে ভেতরে ঢুকবে তারও জীবন নাশের সম্ভাবনা। কেল্লার অভ্যন্তরভাগ দোতলা প্রাসাদের মত করে তৈরি এবং এর আয়তন তিন চার মাইলের কম নয়। দোতলায় একটি প্লাটফরম বানানো আছে যেখানে দাঁড়িয়ে বাদশাহরা অনায়াসে হাতীর পিঠে চড়ে কেল্লা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। কেল্লাটি বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ভেতরে প্রবেশ করার দ্বারটিও রুদ্ধ। বাদশাহী আমলের অস্ত্রশস্ত্র যা কেল্লার মধ্যে ছিলো সেসবও উদ্ধার করা যায়নি। এতদিনে হয়ত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে। ঢাকার লালবাগের কেল্লা দেখলেই লাহোরের শাহী কেল্লা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা চলে। দু'টিই জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত।

শালিমার বাগ

লাহোরের শালিমার গার্ডেন কারো অজানা নয়। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান উদ্যান খুব ভালোবাসতেন এবং উদ্যান বিন্যাস শিল্পে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শিনী। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই রমণীর উদ্যানটি নির্মাণ করেছিলেন। উদ্যানটি খুব বড় নয়। আয়তনে ঢাকার সোহরোওয়ার্দী উদ্যানের অর্ধেকের সমান। নানা বর্ণের সুগন্ধী ফুলের বাহার, চারদিকে হেঁটে বেড়াবার সুন্দর রাস্তা, বসে বিশ্রাম করার জন্য মাঝে মাঝে পাকা আসন, পানির সুদৃশ্য ফোয়ারা, এসব দেখতে ভারি চমৎকার। মোট আটটি ফোয়ারার মধ্যে একটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ইংরেজ আমলের বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা শত চেষ্টা করেও সেটি মেরামত করতে পারেনি। মাটির নিচে কোথায় কিভাবে যে ফোয়ারার কেন্দ্রটি অবস্থিত সেটাই খোঁজ করে বের করতে পারেনি।

বর্তমানে নতুন করে ফোয়ারার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্যানের মধ্যে পাথরে মোড়ানো নাচ গানের একটি মঞ্চ আছে। আলো ঝলমল মঞ্চটি

সত্যিই দেখার মত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে কাওয়ালি ও গজল গানের আসর বসতো সেখানে। টিকিটের হার ছিলো জনপ্রতি দু'টাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত যুবতী মেয়েদের নৃত্য পরিবেশন করা হতো সে মঞ্চে। সে সব এখনও আছে কিনা বলতে পারবো না। নাচ গানের এ ব্যবস্থা মোঘলদের আমলেই নাকি প্রবর্তন করা হয়েছিলো। তখন মঞ্চের চারদিকে রঙিন কাঁচের যে আবরণ দেয়া ছিলো সেসব এখন আর নেই। বাদশাহরা যে আসনে বসে নাচ দেখত, আমীর ওমারাহদের পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কারো এ মঞ্চের অনুষ্ঠান দেখার অধিকার নাকি ছিলো না। সম্রাট শাহজাহান শালিমার গার্ডেনের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করেন। ভেতরে পানির সুদৃশ্য তিনটি হ্রদ, তার চারপাশে ঘুরে বেড়াবার রাস্তা এবং পাশ দিয়ে ফুল ও ফলের বাগান, এসব সম্রাট শাহজানের আমলেই নির্মিত হয়।

তাজমহল নির্মাতাই এটি তৈরি করিয়েছেন। শালিমার নির্মিত হবার আগেই লাহোরে উদ্যানের সংখ্যাধিক্য ছিল। সম্রাট শাহজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে 'দিল-আওয়াজ বাগের' উল্লেখ করেছেন। এই বাগের মালিকানা ছিল জাহাঙ্গীরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর এবং তিনি (জাহাঙ্গীর) এখানে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন।

শালিমারের চারপাশে বিস্তৃত আঙ্গুরী বাগ, মেহতাব বাগ, গুলাবি বাগ এবং এনায়েত বাগ ছাড়াও জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহানের দিলখুশ বাগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার সমাধিভূমেই সম্রাট জাহাঙ্গীর শায়িত রয়েছেন।

সমস্ত উদ্যানের মাঝে শালিমার যেন রত্নবিশেষ। জনৈক উদ্যান-প্রিয় বলেছেন, 'লাহোরের সন্নিকটে শালিমার বাগের মত স্থান এশিয়ায় খুব কমই আছে। এখানে প্রকৃতি এবং মানুষের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে; ইতিহাস ও জনশ্রুতি একত্র মিশে চটকদার রোমান্স সৃষ্টি করেছে।'

তিরিশ একর ভূমির উপর অবস্থিত ৫২০ গজ দীর্ঘ এবং ২৩০ গজ প্রস্থ শালিমার প্রকৃতই একটি রাজকীয় প্রমোদ কানন। চারটি বৃহৎ তোরণবিশিষ্ট উঁচু দেয়াল-ঘেরা শালিমার বাগান তিনটি চত্বরে বিভক্ত। বাগানটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং সর্বনিম্ন চত্বরটি উত্তর প্রান্তে। উত্তর দিকে ক্রমোন্নত হওয়ার ফলে বাগানের ঢালুর উপরিভাগ গ্রীষ্মকালীন সূর্য থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে। দক্ষিণ উত্তর চত্বর অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় চত্বর দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান; কিন্তু মাঝের চত্বরটি আয়তক্ষেত্রাকার। প্রথম ও তৃতীয় উভয় চত্বরই আড়াআড়িভাবে খালের সমান্তরাল পথ দ্বারা চারটি সম-চতুর্ভুজে বিভক্ত এবং এই চতুর্ভুজগুলো আবার অনুরূপ চারটি করে সম-চতুর্ভুজে বিভক্ত। সমগ্র উদ্যানের শীর্ষদেশ– প্রথম চত্বরের দু'টি ফটক কিন্তু উত্তর প্রান্তে নয়। চত্বরের মধ্যভাগে পূর্ব ও পশ্চিম

দিকের দেয়ালে এই ফটক অবস্থিত। পশ্চিমের ফটকই প্রধান ফটক। সুউচ্চ দেয়ালের উপর থেকে অর্ধ-ষড়ভুজের আকারে এটিকে বহির্গত মনে হয়। পাকিস্তানের সৌধসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সুন্দর আলোকবিচ্ছুরিত টালি দ্বারা ফটকটি সজ্জিত। ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত নির্ঝরের মনোরম দৃশ্য এবং বাঁধানো খালের পানির টুংটাং শব্দ আপনাকে স্বাগত জানাবে। এই খাল পূর্ব তোরণ থেকে পশ্চিম-তোরণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণের প্রবাহিত অন্য আর একটি খাল দ্বারা বিভক্ত।

খালগুলো প্রায় বিশ ফুট প্রস্থ এবং মাঝখানে বরাবর পাথরের তৈরি পদ্মকুঁড়ির মত ঝর্ণা শোভিত। অষ্টকোণ ও অন্যান্য আকারের সামুদ্রিক মাছের হাড় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দ্বারা খালের উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত পথ বাঁধানো হয়েছে। তার পাশে সারি সারি পাম গাছ এবং তার পশ্চাতে ছায়াপ্রদানকারী বড় বড় গাছ লাগানো হয়েছে। উদ্যানের সৌন্দর্য ভালমত উপভোগ করতে হলে উদ্যানে পরিভ্রমণ করতে হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার কাবুলের সাতটি উদ্যানের সবগুলোতেই পদব্রজে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই পরিভ্রমণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, মনে হয় না, আমি পূর্বে কোনদিন এত দীর্ঘ পথ হেঁটেছি। প্রথমে আমি উদ্যান-অলংকৃত শহরের চারদিক তারপরে চন্দ্রালোকিত উদ্যান ও আমার পিতার মাতামহী বিকা বেগমের রচিত উদ্যান ঘুরে দেখেছি।

কিন্তু আর একটু এগিয়ে গেলেই শালিমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সোজা আপনার সামনে এই চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করে লাল বালি পাথরে তৈরি দশ ফুট উঁচু দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালের উপরিভাগ প্রথমে খোপে খোপে বিভক্ত করে অর্ধগোলাকৃতি খিলানের দ্বারা অবনমিত করা হয়েছে। একটা বড় খিলানের উপর দু'টো ছোট খিলান– একটার উপর আর একটা পর পর সাজিয়ে এগুলো তৈরি হয়েছে। এরপর আছে বারোটি দরজা বিশিষ্ট বারোদ্বারী প্রাসাদ। ভেতরে ঢুকতে বুঝা যায় ফতেহপুর শিক্রির রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে এ প্রাসাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। লাহোরের বাদশাহী মসজিদের সামনেই আছে মহাকবি ইকবালের সমাধি। যে ময়দানে দাঁড়িয়ে শেরে বাংলা, এ. কে. এম ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তার নামকরণ করা হয়েছে ইকবালপার্ক।

শীশমহল

মোগলদের বিস্ময়কর স্থাপত্য প্রতিভার আরেকটি নিদর্শন লাহোরের শীশমহল। পাকিস্তানের এক টাকার নোটের ওপর শীশমহলের ছবিটি ছাপানো ছিলো। সর্বস্তরের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে ভরা লাহোরের সুবৃহৎ বিপণীকেন্দ্রের নাম আনারকলি মার্কেট।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও তাঁর প্রেয়সী নূরজাহানের সমাধিও লাহোরে। সমাধি দুটি রাভী নদীর তীরে। দেখলে মনে হয় মোঘল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সমাধি সৌধই বটে। এ দুটি সৌধও সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেছিলেন। মোগলদের স্থাপত্য-কীর্তি আগের মত এখন আর নেই, তবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথাসাধ্য যত্নসহকারে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে।

ভারতে মোঘলদের অপূর্ব স্থাপত্য ও শিল্পকর্মের প্রতি তাকালে একটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্রাট আকবর ও শাহজাহানের কীর্তিকলাপ প্রায় সবাই ফতেপুর শিক্রি, আগ্রা এবং দিল্লীতে। কিন্তু লাহোরে সে আমলের বাদশাহী নিদর্শন যা আছে তার স্থপতি প্রধানত সম্রাট জাহাঙ্গীর।

শান্ত সুন্দর আবাস ঘরগুলো এবং মনোমুগ্ধকর বসার জায়গাগুলো বানানো হয়েছে রুচি আর সৌন্দর্য মিশিয়ে, সাজানো হয়েছে দুর্লভ শিল্পীদের তুলিতে আঁকা প্রাণময় ছবি দিয়ে। অদ্ভুত সুন্দর সবুজ বাগান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সব রকম ফুল আর লতা-গুল্ম। অবাক করে দেয়– শিহরণ জাগায় মনে। কবির ভাষায়–

‘যে দিকেই দেখি শুধু সুন্দর
ছুটে চলি খুশি মনে,
মন বলে, হয়ো না উতলা
দু’দণ্ড শান্তি লভ এখানে।’

দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণকালে চল্লিশটি থামওয়ালা এক বিরাট হলরুম তৈরি হয়েছিলো সিংহাসন ঘরের সামনে। এটাকে বলা হয় দিওয়ানে আম। দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিখ্যাত মার্বেলের তৈরি শীশমহল। পশ্চিম দিকে ছোট ছোট ‘বাঙলা’ প্রাসাদগুলো তৈরি হয়েছিলো। এই প্রাসাদগুলোর ছাদ গোলাকার। সম্রাট শাহজাহান তৈরি করেছিলেন খোলা সাজানো স্তম্ভের প্রাসাদ, খোয়াব-গাহ নামে যা এখন সুপরিচিত।

মতি মসজিদ

মতি মসজিদ তৈরির কোন তারিখ পাওয়া যায় না। মসজিদটি খুবই সুন্দর– অনেকগুলো তোরণ রয়েছে এতে। নামায ঘরটি শক্ত পাথরে তৈরি– সাজানো কারুকাজ করা।

তৃতীয় পর্যায়ে নির্মাণের উল্লেখযোগ্য বস্তু হচ্ছে আওরঙ্গজেব তোরণ– এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়ও এটি রাজকীয়। সহজে ভোলা যায় না একে।

বিদেশীরা শালিমার উদ্যান সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। এই উদ্যানের দরজায় খোদিত প্রথম দু’টি চরণ এখানে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে : ‘মিষ্টি-সুন্দর এই উদ্যান– একে হিংসা করলে কোমল ফুলটিও ঝরে যাবে।’

আরেকটি বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ হচ্ছে দাই আঙনা মসজিদ। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পরিচারিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটি তৈরি করেছিলেন।
ওয়াজির খান মসজিদটি একটা অন্যতম গৌরবময় স্মৃতি–শুধু লাহোরেই নয়, সারা পাক-ভারতে এর জুড়ি নেই। সাদা-নীলে রীতিতে ফুল-সাজানো এর সামনের দিকটি। পুরনো লাহোরের দক্ষিণে পাঞ্জাব সেক্রেটারিয়েট ভবনের বাগানের অভ্যন্তরে রয়েছে আনারকলির কবর। এই কবরটি ছয়টি কোণবিশিষ্ট। প্রতিটি কোণে রয়েছে অষ্টভুজ সমতল মিনারওয়ালা প্রকোষ্ঠ। একটি প্রধান মিনারও রয়েছে এতে। আনারকলির প্রণয় কাহিনী প্রাচ্যের অন্যতম উপকথায় রূপ লাভ করেছে। আনারকলির কবরের গায়ে তাঁর প্রেমিক সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত দুটি বিষাদময় চরণ লেখা আছে।

'হায়! যদি আরেকবার প্রেয়সীকে দেখতে পেতাম
কেয়ামত পর্যন্ত আমার প্রভুকে শোকরিয়া জানাতাম।'

জাহাঙ্গীরের সমাধি

লাহোরের তিন মাইল পশ্চিমে শাহদারায় জাহাঙ্গীর সমাধি। ১৬২৭ সালে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে ক্যাম্পে মারা যান সম্রাট জাহাঙ্গীর। অন্তিম অনুরোধে তাঁর সোহাগসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জন্যে তৈরি উদ্যানে তাঁকে কবর দেয়া হয়।
পুরনো লাহোরে রয়েছে হারেম সুন্দরী আনারকলির নামে সবচেয়ে বড় বাজার। গায়ে-গায়ে-লাগানো দোকানের সারি সংকীর্ণ রাস্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে রয়েছে। দক্ষিণ সীমান্তে লাহোরী দরওয়াজা–আকবরের বানানো নগররক্ষা প্রাচীরের মোট তেরটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে এটি একটি। দক্ষিণদিকে সম্রাট হুমায়ুনের আমলের ফকির নীলা গুমবাদের মাজার শরীফ। অভিজাত ব্যবসা-কেন্দ্র মল-এ এই রাস্তাটি পৌছেছে। আনারকলি কবরের মাজার শরিফ। আনারকলি কবরের ডানে সিভিল কোর্ট, সেক্রেটারিয়েট ভবন ও সুন্দর সরকারী কলেজ। দুপাশে সাজানো বিপনীগুলো আর সুন্দর নক্শা আঁকা প্রধান ডাকঘরটি দেখা যায় মল–এর বাঁয়ে এগিয়ে গেলে। গভর্নর ভবনের কাছে যেখানে এককালে আকবরের সম্পর্ক ভাই মোহাম্মাদ কাসেম খানের কবর ছিলো– সেখানে জিন্নাহ বাগ ১৫৭ একর জমিজুড়ে আছে। এই জিন্নাহ বাগ এককালে ইংরেজ আমলে নির্মিত সর্ব সাধারণের জন্যে তৈরি অন্যতম সুন্দর উদ্যান হিসেবে বিখ্যাত ছিলো।
যুব রাজদের ছেলেদেরকে শিক্ষা দানের জন্যে আরো ভেতরে রয়েছে চিফস কলেজ। নগরীর প্রধান রাস্তাসংলগ্ন বিখ্যাত ইমারত হলো কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা, বিশ্ববিদ্যালয় হল,ল্যাবরেটরি ও পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী।

হযরত শাহ নাফিসুল হোসাইনী সাহেবের সাক্ষাত লাভে খানকায়ে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ-এ উপস্থিতি

✍ এরপর আমরা চলে যাই হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র.-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা সাইয়েদ শাহ নফিসুল হুসাইনী সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। শাহ সাহেব শহর থেকে প্রায় ৫/৭ মাইল দূরে এক নিরিবিলি পরিবেশে বালাকোটের শহীদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের নামে সেখানে 'খানকায়ে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' নামে একটি মসজিদ ও একাডেমী গড়ে তুলেছেন। প্রায় আধাঘণ্টা মোটর সাইকেল চালিয়ে আমরা খানকাহে হাজির হলাম। খুব নীরব নিস্তব্ধ। পাশে শুধু গ্রাম এবং আমবাগান ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ৩ বিঘা জমি নিয়ে বিরাট মসজিদ খানকাহ, লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। হযরত শাহ নফিসুল হুসাইনী বর্তমানে পাকিস্তানের অন্যতম শায়খে তরীকত ও বুযুর্গ। তালীম তরবিয়ত এবং ইসলাহে উম্মতের খুব কাজ নিচ্ছেন আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা। যা হোক খানকাহে হাজির হয়ে আমরা জানতে পারলাম যে শাহ সাহেব শিয়ালকোট গিয়েছেন। ফিরবেন বাদ যোহর। মনটা ভেঙ্গে গেল। বুকটা কেঁপে উঠল। বহু বছরের স্বপ্ন এবারও হাতছাড়া হয়ে গেল। ওযু করে ২ রাকাত নামায পড়ে কান্নাকাটি করলাম। লাইব্রেরীটি বহু কিতাবে ভরপুর। খুবই সুন্দর। হযরত শাহ সাহেবের হাতের লেখা ছাপানো হয়েছে দেখলাম। খুবই বিখ্যাত তাঁর হাতের লেখা। আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত আলী মিয়ার আত্মীয় হবার সুবাদে বড়ই আশা ছিল হযরতের সোহবতে কিছু সময় কাটানো, কিন্তু তখন ১২টা বেজে গিয়েছে। ৪.৩০ এ ট্রেন। অনেক দুঃখ নিয়ে লাহোর শহরের দিকে ফিরে আসি।

জামেয়া আশরাফিয়ায়

এরপর আমরা চলে যাই জামেয়া আশরাফিয়া দেখতে। জামেয়া আশরাফিয়া পাকিস্তানের অন্যতম একটি মাদরাসা। হাকীমুল উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত হাসান এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এ মাদরাসায় দরস দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ফযলে রহীম বর্তমান মুহতামিম। তাঁর সাথে ইসলামাবাদের কনভেনশনে দেখা হয়েছিল। তিনি লাহোরে তাঁর মাদরাসায় আসার দাওয়াতও দিয়েছিলেন কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল না। মাদরাসার ভিতর অল্প সময় পাঁয়চারী করে মসজিদে ফিরে এসে যোহরের নামায পড়ে খানা

খেতে বসতেই দেখি রাশেদী সাহেব। খুবই পুলকিত হই। ঐ অস্ট্রেলিয়ান বিল্ডিং একটি তাফসির মাহফিলে তিনি বয়ান করতে এসেছিলেন। বয়ান শেষে আমার খোঁজ খবর নিতে এ মসজিদে এসেছেন। যাহোক খানা খেয়ে রেল স্টেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। মাওলানা জামিলুর রহমান ও যাকাউর রহমান আর মাওলানা ইসহাক র., হযরত শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র. -এর খলীফা বড় বুযুর্গ আলেম ছিলেন। আমি যে আল আমিন মসজিদে অবস্থান করছিলাম সে মসজিদের বুনিয়াদ রেখেছিলাম শায়খুত তাফসীর সাহেব ১৯৫৬ সালে।

করাচীর পথে লাহোর রেলস্টেশনে

লাহোরে আমার সহযোগিতাকারী এ দুভাই এবং রাশেদী সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাড়ে তিনটার দিকে ট্রেন স্টেশনে এসে অপেক্ষা করতে থাকি। এদিকে শোনা যাচ্ছে সাড়ে ৫টায় ট্রেন আসবে। তবে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানেও যে ৮টার গাড়ি দশটায় ছাড়ে তার প্রমাণ পেলাম। খবর নিয়ে জানা গেল যে রাত ৭.৩০ ট্রেন ছাড়ার সম্ভাবনা। আমি লোটা কম্বল নিয়ে পাশের মসজিদে যেয়ে একটু শুয়ে পড়লাম এরপর মাগরিবের নামায পড়ে পাশের হোটেল থেকে খানা খেয়ে এশার নামায পড়ে স্টেশনে হাজির হলাম। ৭.৩০ এ কারাকোরাম চলা শুরু করে। আমার স্লিপার সিট ছিল না। সারা রাত বসে যেতে হবে। তাই আমরা সামনের সিটের সাথীর সাথে ভাব জমালাম। এক যুবক ভাই করাচী যাচ্ছে। লাহোরের বাসিন্দা। করাচী থেকে কোয়েটা যাবে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে খুশী হলেন। অনেক বিষয়ে আলাপ হল। ট্রেন ছুটছে শা শা করে। ২ ঘণ্টা পরে পাকিস্তানেই ফিরে যাবে। ফয়সলাবাদে ট্রেন থামল। এরপরের স্টেশনগুলোর আর খবর ছিল না। রাত ভর ঝিমুতে থাকি। স্মৃতিপটে ইসলামাবাদ, পিন্ডি, ইদারায়ে উলূমে ইসলামী, লাহোর আর বালাকোটের মনোরম দৃশ্যগুলো একের পর এক চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ ট্রেনটির সকাল ৯টায় করাচী পৌঁছবার কথা থাকলেও ১২টায় হায়দারাবাদ এবং ঠিক ২টায় করাচী পৌঁছে যায়।

সপ্তম অধ্যায়

লাহোরের ইসলামী ব্যক্তিত্ব

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান র.

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান কিম্বলপুর জেলার মিলপুর এলাকার এক দীনদার ও ইলমী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মানতেকের কিতাবসমূহ তিনি মৌলভী মুহাম্মাদ মাসুম সাহেবের নিকট পড়েন। মাওলানা সাহেব তাঁর সময়কার আলেম সমাজে যুক্তিবাদী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। যখন তিনি শিক্ষক হিসেবে গজনবী আমর তাসর আসেন তখন তিনি ছাত্রদের থেকে দূরে থাকাকে স্বীয় স্বভাবের পরিপন্থী মনে করেন।

তিনি দাওরায়ে হাদীস দু'বার পড়েন। একবার মাদরাসা গজনবীতে এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে হাকীমুল উম্মত থানভী র.-এর নিকট আসেন। হাকীমুল উম্মত থানভী র.-এর নিকট বায়আত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক ছিল। প্রত্যেকেই তার মানশা মোতাবেক কিছু শর্ত পূর্ণ করতো। আবার কাউকে কোন শর্ত ছাড়াই বায়আত করে নিতেন। মুফতী সাহেবের জন্য এই শর্ত দেয়া হল যে, তিনি কোন একজন কারীর নিকট কুরআন শরীফ মশক করবেন। আরেকটি শর্ত ছিল হানাফী মাযহাবের কোন আলেমের নিকট হাদীস পড়বে। তিনি শর্ত দুটি গ্রহণ করেন এবং দারুল উলূম গিয়ে মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র.-এর নিকট হাদীসের কিতাবসমূহ পড়েন।

শিক্ষকতা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি আমর তাসরে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হন। তার ইলমী যোগ্যতার বলে অল্প সময়ের মধ্যেই মাদরাসায়ে নোমানিয়ার সদরে মুদাররিস হিসেবে নিয়োগ হন। কমপক্ষে চল্লিশ বছর যাবত শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আমর তাসরে তিনি যত দিন ছিলেন প্রত্যেক দিন নূর মসজিদে ফজরের নামাযের পর কুরআনের তালিম দিতেন। তাঁর তালিমে লোকদের মাঝে বেশ প্রভাব পড়তো। কারণ তাঁর প্রতি তার শায়খের বিশেষ তাওয়াজ্জুহ ছিল।

ফতওয়া লেখা

দরস-তাদরিসের পাশাপাশি ফতওয়া লেখায়ও তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁর নিকট অসংখ্য মাসআলার সমাধানের জন্য অনেক প্রশ্ন আসতো যার নির্ভরযোগ্য সমাধান তিনি দিতেন। যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন ততদিন এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

জামেয়া আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠা

তিনি অমৃতাসরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তালিমে কুরআনের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষারও এক পূর্ণাঙ্গ খেদমতের আঞ্জাম দেয়া হয়। এই মাদরাসা প্রায় চল্লিশ বছর যাবত খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই মাদরাসা সকল খাদেম ও উস্তাদ লাহোর চলে আসেন। লাহোরের নিলাগোবন্দ এলাকায় মাদরাসার জন্য জায়গা নেওয়া হয়। এই মাদরাসাকে দ্বিতীয়বার ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৭ সালে জামেয়া আশরাফিয়া হিসাবে নামকরণ করা হয়।

জামেয়ার হলরুমগুলো ছাত্র-শিক্ষকের (বসবাসের) জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় লাহোরের ফিরোজপুর রোডে নতুন ভবনের জন্য একশত বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। দারুল উলূম দেওবন্দকে আল্লাহ তাআলা যেরূপ মর্যাদা ও পরিচিতি দিয়েছেন যার আসল ভিত্তি হল বড়রা মিলে এর ভিত্তি রচনা করেন। অনুরূপভাবে হাকীমুল উম্মত র.-এর নাম ও হযরত মুফতী সাহেব র.-এর একনিষ্ঠতার বরকতে এই জামেয়ার ভিত্তিপ্রস্তরের সময় অনেক বুযুর্গ আল্লাহ ওয়ালা হাজির হন। এ সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কয়েকজন হলেন মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যেব সাহেব র.। মাওলানা হাফেজ জলিল আহমদ, মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান সাহেব, মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব, মাওলানা রাসূল খান সাহেব, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, মাওলানা ইদ্রীস সাহেব, মাওলানা মুফতী জামিল আহমদ সাহেব এবং মাওলানা দাউদ গজনবী র. প্রমুখ।

অসুস্থতায় ধৈর্য্য ও শোকর

একদা তাঁর একটি পা আগুনে পুড়ে যায়, পরে আস্তে আস্তে পুরো পায়ে ঘা ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাঁর কষ্ট কি পরিমাণ হচ্ছে তা ভাষায় বলার মত নয় কিন্তু কখনও তাঁর এই কষ্টের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করেননি। সবসময় হাসি খুশি থাকতেন, ক্ষতের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি। পরে যখন ক্ষতস্থান আরো বাড়তে লাগলো তখন কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে অপারেশন করাতে রাজি হন।

ডাক্তার এমন ঔষধ দিতে চাইলেন, যাতে কষ্ট অনুভূত না হয়। কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে আমার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। সত্তর বছর বয়স্ক ডাক্তার সাহেব অনেক পেরেশান হয়ে যান। কিন্তু তাঁর সামনে কথা বলতে সাহস হয়নি। স্বেচ্ছায় হোক আর জোরে হোক এক টিকা দিয়ে পা কাটা শুরু করলেন। এতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগলো। ডাক্তারের বর্ণনানুসারে অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাড়ির গতি বন্ধ ছিল। অপারেশনের পর দেখা গেল এত কষ্ট তিনি পেয়েছেন যা বলার মত নয়।

ধৈর্য ও শোকরিয়া

অপারেশনের পর তাঁর কষ্টের কোন লাঘব হয়নি বরং প্রায় সময়ই কষ্ট পেতেন। কখনও বলতেন, যখন আমার পায়ের এই অংশের কথা মনে পড়ে তখন মনে হয় যেন আমার ওপর একশ দড়ি দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু কখনও মুখ দিয়ে উফ শব্দ বের করতেন না। ডাক্তারদের পাশাপাশি অনেকেই তাঁর ব্যাপারে পেরেশান থাকতেন।

একবার তিনি বলেন, যখন আমার পা কাটালাম তখন ডাক্তারদের একটা ভুল ধারণা ছিল। তারা মনে করেছেন যে, আমি সম্ভবত ভয় পেয়ে যাব। কর্নেল আমির উদ্দিনও তাই মনে করেছেন। কর্নেল ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আমার শিরায় হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, আমিও পেরেশানিতে আছি কিন্তু আমি বললাম যে, আমার জন্য এটা ঈদ বা খুশি।

মোটকথা, তাঁর জবান থেকে কখনও কষ্টের কোন কথা শোনা যায়নি। তিনি এই সব অবস্থায়ই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে থাকতেন। একদিন বলেন, এটা কেবল আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।

মুর্শিদের সন্ধান

হযরত মুফতী সাহেব র. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী র.–এর সাথে প্রথমে সাক্ষাত করে তাঁর উদ্দেশ্য বয়ান করলে হাকীমুল উম্মত বলেন, আমার ও সব বন্ধুর সাথে ইসলাহের সম্পর্ক কায়েম কর এবং তার নিকট পঁচিশবার চিঠি লিখে আমাকে দেখাও। তারপর বায়আতের দরখাস্ত কর। তিনি এই পরামর্শ মোতাবেক আমল করতে লাগলেন এবং তার খলিফা হাকীম মুহাম্মাদ মোস্তফা বাজনুরী র. এর নিকট একাধারে দুবছর ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন এবং এই সময়ে তার পঁচিশ বার চিঠিপত্র আদান প্রদান করার পর হাকীমুল উম্মতের খেদমতে হাজির হয়ে তা পেশ করেন। হাকীমুল উম্মত এই চিঠিপত্র দেখে ১৩৪৩ হিজরী জিলহজ্জের ১১ তারিখ চার তরিকায় তাঁকে বায়আত করান। এরপর তিনি নিজেকে পুরোপুরি হাকীমুল উম্মতের পায়ে অর্পণ করেছেন।

খিলাফত

যখন হাকীমুল উম্মত র. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বুঝতে পারলেন যে, মুফতী সাহেব দরজায়ে তাকমিলে পৌঁছতে পেরেছেন এবং আখলাকী সকল সংশোধন হয়ে খেলাফতের যোগ্যতা তার মধ্যে পয়দা হয়েছে তখন তিনি তাকে বায়আত করেন এবং এজাজত দিয়ে সম্মানের মর্যাদায় সমাসীন করেন।

পীর ও মুর্শিদের সাথে তায়াল্লুক

হযরত থানভী র. ও মুফতী সাহেবের সাথে কিরূপ গভীর রূহানী সম্পর্ক ছিল তা একটি ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তাহলো একদা হযরত থানভী র.–এর এক খাদেম মুফতী সাহেবের নিকট হযরতের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি থানাভবন চলে আসেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ হযরতের কাছে থাকেন। থানভী রহ এর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেছে মুফতী সাহেব বলে আসেন। খানকার এক বুযুর্গ হযরতের নিকট বলেন, হযরত খলিফা সাহেব চলে গেছেন তাই এখন খানকার সৌন্দর্যও কমে গেছে। এতে থানভী র. বলেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

আবার কখনও কোন আলেমের মজলিসে ইলমী কোন আলোচনা করলে আর সেখানে মুফতী সাহেব অনুপস্থিত থাকলে বলতেন, মৌলভী মুহাম্মাদ হাসান এই আলোচনা শুনলে খুব খুশি হতেন।

হযরত মুফতী সাহেব তাঁর শায়খ সম্পর্কে বলেন, হযরত যে কিরূপ ছিলেন তা কোন কিতাব পড়ে বুঝে আসবে। কেউ হযরতের আমল ও রূহানিয়াত তাঁর রচিত কোন কিতাব পড়ে বা তাঁর লেখা পড়ে বুঝতে পারবে না ওনার রচিত কিতাবাদী পড়ে কেউ হয়তো বুঝবে যে, তিনি একজন বড় কারী ছিলেন। একজন ফকীহ ছিলেন। একজন মুজতাহিদ ছিলেন কিংবা হাদীসের বহস দেখে বলবেন একজন মুহাদ্দিস ছিলেন বা মুনাজারার বিষয়গুলো দেখে বলবেন যে তিনি একজন বড় যুক্তিবাদী বা দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু আমার জানা মতে হযরত এইসব কিছুর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বের লোক ছিলেন। যে লোক হযরতকে স্বচক্ষে দেখেনি সে হযরতের হাকীকত বুঝতে পারবে না।

যখন ডাক্তার সাহেব হযরত মুফতী সাহেবের পা কাটার জন্য বলেছে তখন মুফতী সাহেবের এক ঘনিষ্ঠজন থানভী র.কে তা অবহিত করেন। থানভী র. এই কথা শোনার পর বলেন– আমি এই খবর তোমার মুখ থেকে শুনেই বরদাস্ত করতে পারছি না। সত্যিই বলছি যে, মৌলভী সাহেবের পা কাটার কল্পনা করলে আমার এরূপ মনে হয় যে, যেন আমার পায়ে কাটা হচ্ছে। পরে তিনি উল্লেখ করে বলেন, ভাই! এমন কোন ঔষধ আছে কি যা দ্বারা সে আরাম পাবে। বশীর আলী র. বলেন, হযরত এই রূপ অসুস্থতা মাদ্রাজে

হয়েছে বলে শুনেছি যে এমন ঔষধ পাওয়া হওয়াও আল্লাহর আরেকটি নেয়ামত সবশেষে বলেন, ভাই নেয়ামতের গণনা কেইবা করতে পারবে–

إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها

একবার তিনি জামেয়া আশরাফিয়া নিলাগাবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পাশের একটি স্কুলে বাচ্চাদেরকে ছুটি দেয়া হয়। বাচ্চারা অভ্যাসানুযায়ী ছুটির খুশিতে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে ছিল এবং সকল হতে বের হতে লাগলেন। তিনি এই হুল্লোড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পরে বললেন–

এই সকল বাচ্চারা আমার উপস্থিতি নিজেদের জন্য মসিবত মনে করছিল। তাদেরকে এর থেকে বুদ্ধি দেয়ায় তারা খুশি প্রকাশ করতে লাগলো। তাই আল্লাহ তাআলা যখন মুমিনদেরকে বলবে তোমাদেরকে নাজাত (মুক্তি) দেয়া হল তখন তারা কিরূপ খুশি হবে তা কিছুটা অনুমান করা যায়।

একবার হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. অমৃতাসরে হযরত মুফতী সাহেবের দরসে শরীক হন। এই দরসে অংশগ্রহণের পর তিনি তাঁর অনুভূতিকে এভাবে প্রকাশ করেন–

এই যে বরকত ও ফয়েজ মাওলানা হাসান দেখছে যেন, অমৃতাসরে বসে আমরা আজ থানাভবন দেখছি, দরসের কুরআনের এই চেরাগ চক্ষু খুলে যেন এক বিরাট মুজেযা দেখছি।

হযরত খাজা র. সাহেব বলেন, হযরত থানভী র. বলতেছিলেন, আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কোন চিন্তা ভাবনা থাকবে না যখন আমার পর এই দুইজন বিদ্যমান থাকবে। আমি আরজ করলাম এই দুইজন কারা? তিনি বললেন, একজন তো হলো মুফতী মুহাম্মাদ হাসান র.।

অথচ হযরতের মৃত্যু যেন নেক লোকদের ন্যায় আসান ও সহজ হয়। তার জন্য কত যে চিন্তা-পেরেশান ছিল প্রায় প্রতিটি মজলিসে তার বয়ান থেকেই বুঝা যেত।

একবার কারী খোদা বখস সাহেব হযরতের অসুস্থতায় তাকে দেখার জন্য আসলে তার প্রাথমিক শারীরিক অবস্থা জানার পর বললেন যে, সবচেয়ে বড় নেয়ামত তো হলো ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়া। এরপর বলেন, হযরত আল্লাহ না করুক (খোদানাখাস্তা) মৃত্যুর সময় যদি ঈমান নসীব না হয়, বলেই অন্য রকম বলতে লাগলেন এবং চোখ থেকে অশ্রু পড়তে লাগলো। কারী সাহেব বললেন, হযরত আল্লাহর শোকরিয়া, ঈমান আছে এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে মৃত্যুর সময়ও এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবেন না। তখন বললেন, তোমার কথা ঠিক যে, ঈমানের দৌলত

বর্তমান বিদ্যমান কিন্তু কে এই জিম্মাদারী নিয়েছে যে, মৃত্যুর সময়ও ঈমান নসীব হবে যদি ঈমানের দৌলত নসীব না হয়। ইহা বলেই তিনি দীর্ঘক্ষণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এরপর উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন,

يا الله ايمان يا الله ايمان، يا الله ايمان

১৩৮০ হিজরীর ১৬ জিলহজ্জ মাসে করাচীতে হযরতের ইন্তেকাল হয়। হযরত মাওলানা আব্দুর গণি ফুলপুরী র. তাঁর জানাজার নামায পড়ান। হাজার হাজার লোক তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী র.

জন্ম ও বংশ

মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী র. ১২ রবিউস ছানী, ১৩১৭ হিজরী তারিখে ভারতের ভূপাল শহরে এক ঐতিহ্যবাহী 'আলেম' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি 'কান্ধালাহ'–এর সাথে সম্পর্ক করে তিনি নিজেকে কান্ধলবী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ ইসমাঈল কান্ধলবী। তিনি ১৯ শাওয়াল শুক্রবার ১৩৬১ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। তিনিও একজন বিখ্যাত আলেম, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.–এর বিশিষ্ট মুরীদ ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.–এর পীরভাই ছিলেন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী র. পিতার দিক হতে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও মাতার দিক হতে ওমর ফারুক রাযি.–এর বংশধর ছিলেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর (মাতার বংশের সূত্রে) পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তিনি মাওলানা রুমী র.–এর মসনবীর তাকমিল (পরিশিষ্ট) এর রচনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষা

পরিবারের ঐতিহ্যানুযায়ী মুহাম্মাদ ইদরীস এর– প্রাথমিক শিক্ষা কুরআন হিফজের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। তিনি নয় বছর বয়সে হিফজ সমাপ্ত করেন। কুরআন হিফজ সমাপনের পর পিতা তাকে থানা ভবনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.–এর নিকট নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর নির্দেশে মাদরাসা-ই আশরাফিয়ায় তাঁকে ভর্তি করানো হয় এবং তত্ত্বাবধানের ভারও স্বয়ং মাওলানা থানভী গ্রহণ করেন। মাওলানা আশরাফ আলীর হাতে বালক মুহাম্মাদ ইদরীস এর– হাতেখড়ি হয়। নাহু-সফর এর কিতাবসমূহ তিনিই শিক্ষা দেন। মাদরাসায়ে আশরাফিয়ায় মাওলানা থানভী ছাড়াও মাওলানা আব্দুল্লাহর কাছে কিছু কিতাবের সবক লাভ করেন।

মাদরাসায়ে আশরাফিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মাওলানা থানভী র. তাঁকে মাদরাসা আরাবিয়া মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী তাঁর তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক হন। মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুরে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সে সর্বোচ্চ সনদ দাওরায়ে হাদীস লাভ করেন। মাওলানা ছাবিত আলী প্রমুখ স্বনামধন্য আলেম এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা প্রয়াসী মুহাম্মাদ ইদরীস উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিসে হিন্দ মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র., মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী র., মিয়া আসগার হুসাইন র. ও মুফতী যায় যা তার জন্য খুবই উপকারী হবে। তখন হযরত থানভী র. বলেন, ভাই একটু চেষ্টা করে ঔষধটি সংগ্রহ করে দাও। ধার্য মাদরাসা থেকে সংগ্রহ করে আরযকে দিলে হযরত তা মুফতী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন।

এই ব্যবহার দ্বারা হযরতের সাথে সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। একবার হযরত মুফতী সাহেব হযরত থানভী র.-এর খেদমতে মাছ পাঠান এবং মাছকে তিনটি ভাগ করেন এবং যে ব্যক্তিকে মাছ দিয়ে পাঠান তাকে বলেছেন যে, এক অংশ ছোট ঘরে আরেক অংশ ঐ ঘরে এবং আরেক অংশ তিনি যে ঘরে অবস্থান করে সেখানে দিবে। যখন হযরতের নিকট মাছ এসে পৌঁছলো এবং বণ্টনের কথা বলা হল তখন হযরত খুবই খুশি হলেন। কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি এই ঘটনাটি বলতেন। আর বলতেন, তার চেয়ে আমার প্রতি মনোযোগ দানকারী কেইবা আছে?

হযরত থানভী রহ-এর সাথে মুফতী সাহেবের এমনই গভীর সম্পর্ক ছিল যে, হযরতের কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব দেয়াকে রীতিমত অপছন্দ করতেন। তিনি তাঁর ওসিয়তের মাঝে সন্তানদেরকে উপদেশ করে যান যে, বেহেশতী জেওর, জামাউল আমাল, তালিমুদ্দীন মাওয়ায়েজ, মালফুজাতে হযরত থানভী এই কিতাবসমূহ মুতাআলার মাঝে রাখবে।

তিনি বলেন, এই জামানার জন্মগ্রহণ করাটাও এক বড় নেয়ামত, ছোট আমলেও বড় প্রতিদান পাওয়া যায়। আরেকটি নেয়ামত হলো হযরতের সাথে সম্পর্ক যার শেষ পরিনাম ইনশাআল্লাহ, আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে বলে আশা করি।

হযরত মুফতী সাহেবের সাথে সম্পর্ককারীদের একজন যিনি পুরাতন খাদেম ছিলেন, তিনি হজ্জের জন্য আবেদন করেন সাধারণ লোকদের ন্যায় অন্তরের দরদ রাখেন। ফলে অনুমতি মিলে যায় কিন্তু লটারীর মধ্যে তার নাম না আসায় অনেক পেরেশান হয়ে যান। তার এই পেরেশানির কথা মুফতী সাহেবকে

জানানো হয়। হযরত তাকে কাছে ডেকে বললেন, চৌধুরী সাহেবের তো দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি। চৌধুরী সাহেব অনেকটা দুঃখের সাথে উচ্চকণ্ঠে বললেন, হুজুর মঞ্জুর হয়নি। হযরত মুফতী সাহেব বললেন, মুজা হু গায়ী, কয়েকবার এটি উচ্চারণ করার পর বললেন, তোমার হজ্জের সওয়াব এখান থেকেই ঘরে বসেই পাওয়া গেল। এই কথা বলার পর উপস্থিত সকলে সান্ত্বনা পেলো।
হযরতের যখন প্যারালাইসিস হয় তার পর কিছুটা সুস্থ অনুভব করছিলেন এবং হাত নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন। একদিন মজলিস সমবেত লোকদেরকে বলেন, আমার প্রথম এরূপ বুঝে আসতো যে, হাত আল্লাহ তাআলার নেয়ামত তবে এই হাতের হরকত করাটাও আল্লাহ তাআলার এক মুস্তাকেল নেয়ামত। অনুরূপভাবে এর দ্বারা খানা খাওয়াকে আল্লাহর নেয়ামত বুঝতাম কিন্তু এর অন্যান্য গুণাবলীও এক মুস্তাকেল নেয়ামত। খোদানাখাস্তা এই হাতের কাজ ক্ষমতা যদি বন্ধ হয়ে যায় বা এর কাজ বেশী বেড়ে যায় তখন বুঝে আসে নিশ্চয়ই এটা এক বড় নেয়ামত ছিল। তারপর বলেন ঘুমানোও আল্লাহর এক নেয়ামত কিন্তু ঘুম থেকে জাগ্রত আযীযুর রহমান র. প্রমুখ খ্যাতনামা উস্তাদগণের সাহচর্যে এসে উচ্চ জ্ঞান ও রূহানী ফয়েয হাসিল করেন।

কর্মজীবন

১৩৩৮ সালে মাদরাসা আমিনিয়ার সহাকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। মুফতী মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ র. ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মাত্র এক বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার পর দারুল উলূম দেওবন্দে মুদাররিস হন। তিনি দারুল উলূমের তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি শায়খুত-তাফসীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে প্রায় আট বছর অধ্যাপনা করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পদ হতে ইস্তফা দেন এবং দক্ষিণ হায়দারাবাদে চলে যান। সেখানেও তিনি দীর্ঘ নয় বছর (১৯২৯-১৯৩৮) অবস্থান করেন। সেই সময় মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্য 'আত-তালীকুস সাবীহ', শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ' গ্রন্থ রচনা করেন। দামিস্কএর– একটি প্রকাশনা সংস্থার অর্থানুকূল্যে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৩৫৪ হিজরী সনে দামিস্কে এর প্রথম চার খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ভারতবর্ষ, মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও হেরেম শরীফের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হিসেবে সমাদৃত হয়। হায়দারাবাদে অবস্থানকালে এতে তাঁর খ্যাতি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এছাড়া আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশ সময় পুস্তক রচনার কাজে অতিবাহিত করলেও তিনি শিক্ষানুরাগী ছাত্রদেরকে নিয়মিত হাদীসের দরস দিতেন।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. ১৯৩৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ এর প্রধান পরিচালক পদে যোগদানের পর সেখানে স্বতন্ত্র তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। মাওলানা উসমানী ও দারুল উলূমের মুহতামিম কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুত-তাফসীর পদে পুনরায় তাশরীফ আনার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি হায়দারাবাদে (দক্ষিণাত্য) মাসিক আড়াইশ' টাকার বেশি রোজগার করতেন। অন্যদিকে দেওবন্দ মাদরাসায় মাত্র সত্তর টাকা বেতন ধার্য ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ১৯৩৯ সালে ইস্তফা দেন এবং ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে জামেয়া আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুর–এর শায়খুল-জামেয়া হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোর জামিয়া আশরাফিয়ায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বছর উক্ত পদে থেকে তিনি ইলম হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দেন। ইন্তেকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই মাদরাসায় নিয়োজিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। এতে পরিবারের কেউ আপত্তি করলে বলতেন, 'তোমার নওয়াবী অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে দরবেশী ও ফকীরীতে যেই শান্তি রয়েছে তা কোন কিছুতেই নেই।' অর্থের প্রতি তাঁর মোহ এত কম ছিল যে, তিনি জীবনে কোন প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করেন নাই। জামিয়া আশরাফিয়ার পরিচালক মাওলানা উবায়দুল্লাহ নিজ উদ্যোগে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমার প্রয়োজন তো আল্লাহ তাআলা পূরণ করছেন। সুতরাং বেতন বৃদ্ধির দরকার কি? সুদীর্ঘ ২৩ বছর তিনি একই বেতনে চাকুরী করেন।

হজ্জ পালন

তিনি জীবনে চারবার হজ্জ করার সুযোগ লাভ করেছেন। প্রথমবার ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ। দ্বিতীয়বার ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে একা। এই হজ্জ সমাপনের পর তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তীনসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। দামিস্কে ছয় মাস অবস্থান করে তাঁর রচিত 'আততালিকুস-সাবীহ', 'শরহে মিশকাতিল-মাসাবীহ' গ্রন্থের প্রথম চারখণ্ডের প্রকাশনায় তত্ত্বাবধান করেন। অবসর সময়ে নিয়ম মাফিক শহরের বিশিষ্ট আলেম, মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীর সাথে বৈঠকে মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে আরব বিশ্বের আলেম, মাশায়েখ আশ্চর্য হয়ে বলতেন, 'আমরা আহলে লিসান (আরবী ভাষা) হওয়া সত্ত্বেও আরবী অলংকারশাস্ত্রে এই অনারব 'শায়খ'এর– মত পারদর্শী নই। তৃতীয় ও চতুর্থবার

হজ্জ করেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ও আরব-বিশ্বের চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন। তাঁর সাথে আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের ফলে উপমহাদেশের ইলমে দীনের ব্যাপক চর্চা ও প্রসার তাদেরকে মুগ্ধ করে।

মাওলানা একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাদরাসা শিক্ষা ছাড়াও তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন। তাই তাঁর রচনায় আধুনিক তত্ত্বগত আলোচনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্বিক, গবেষণাধর্মী ও ইতিহাস এতিহ্য তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুরআন, হাদীস ও আধুনিক জ্ঞানের সুসমন্বয়ে তাঁর রচনাসমূহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দীনের জটিল বিষয়গুলো সহজ-সরল উপস্থাপনায় তাঁর অসামান্য নিপুণতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

রচনাবলী

অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় তিনি গবেষণা ও পুস্তক রচনায় কাটিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ মাকামাত হারীরীর'র আরবী হাশিয়া যা তিনি ২১ বছর বয়সে রচনা করেছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। ইন্তেকালের ১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখনী অব্যাহত ছিল। তিনি প্রায় একশত কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে–

তাফসীর : ✿ আল ফাতহুস সামাবী তাওজীহি তাফসীরিল বায়দাবী ✿ মা'আরিফুল কুরআন ✿ মুকাদ্দামাতুত-তাফসীর (আরবী) দালাইলুল কুরআন, 'আলা মাযাহিবিন-নুমান (আরবী) ✿ শারাইত মুফাসসীর ওয়া মুতারজিম (উর্দূ) ✿ ইজাযুল-কুরআন (উর্দূ)।

হাদীস : ✿ আততালীকুস সাবীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ (আরবী) ৮ খণ্ড ✿ মুকাদ্দমাতুল-হাদীস ✿ কালিমাতুল্লাহ ফী হায়াত-ই-রূহিল্লাহ (উর্দূ) ✿ আল-কাওলুল মুহকাম (উর্দূ) ✿ লাতাইফুল হিক্যাম ফী আসরার-ই-নুযুলি ঈসা ইবন মারয়াম (উর্দূ) ✿ আদ-দীনুল কায়্যিম (উর্দূ) আহসানুল বায়ান ফী মাসআলাতিল কুফরি ওয়াল ঈমান ✿ নিহায়াতুল ইদরীক ছে হাকীকাতিত তাওহীদ ওয়াল ইশরাফ (উর্দূ) ফাতহুল গাফুর শারহি মানজুমাতিল কুবুর (উর্দু) ✿ ইসলাম ওয়া মিরযায়িয়্যাত কা উসূলী ইখতিলাফ (উর্দূ)।

সীরাত ও জীবনী : সীরাতুল মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– ৪ খণ্ড (উর্দূ) ✿ খিলাফাতে রাশেদাহ (উর্দূ) আকাইদ ও ইলমে কালাম ✿ আকাইদ ইসলাম ✿ উলূমুল কালাম।

আধ্যাত্মিকতা

তিনি চিশতিয়া ও নাকশবন্দিয়া উভয় তরীকার বায়আতের অনুমতিপ্রাপ্ত একজন পীর ছিলেন। এছাড়া কাদরিয়া ও সুহরাওয়ারদিয় তরীকার উপরও তাঁর সাধনা অব্যাহত ছিল। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. ও আশরাফ আলী থানভী র. প্রমুখ মনীষী হতে তিনি এই অনুমতি লাভ করেন। মাওলানা খলীল আহমাদ মুহাজির মাদানী, মাওলানা মুহাম্মাদ মাজহার নানুতবী ও শাহ আব্দুল গণী র. হতে সনদ রেওয়াত (হাদীস বর্ণনা সূত্র) এর অনুমতি লাভ করেন।

একজন কামিল পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি লোকদের বায়আত করতেন না। কেউ অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করলে মুফতী মুহাম্মাদ হাসান, প্রতিষ্ঠাতা জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া অথবা দারুল উলূম করাচীর প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র.–এর কাছে যাবার পরামর্শ দিতেন। শাগরিদ ভক্তদের কেউ তাঁর খেদমত করতে চাইলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন, 'আমার উচিত তোমার খেদমত করা।' তিনি বলতেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয প্রয়োজনীয় দীনী ইলম হাসিল করা, আলেম হওয়া জরুরী নয়। কারণ দীনী ইলম মানুষকে সুসভ্য করে গড়ে তোলে। ইলমের সাথে সাথে আমলও জরুরী। আমল দীনী তরক্কীতে অনুপ্রেরণা যোগায়, ইবাদতে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর ভয়-ভালোবাসা অন্তরে জাগরূক রাখে।

সমাজ-সংস্কার

তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সমসাময়িক যুগে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর মূলে কুঠারাঘাত করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমেছিল। বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা ও এদের নেপথ্য সহযোগিতায় কাদিয়ানী ধর্মমতের উদ্ভব ইসলামী আকীদা ও জীবন-দর্শনের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। দেশের হাক্কানী আলেমগণের সাথে মাওলানা কান্ধলবীও এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর তাত্ত্বিক লেখনী এই মতবাদগুলোর অসারতা প্রমাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মুরতাযা হাসান খান প্রমুখ দেশবরেণ্য আলেমগণকে নিয়ে তিনি বহুবার কাদিয়ানী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র কাদিয়ান, পিরোজপুর, গুরুদাসপুর ও লাহোর সফর করেন। এই সময়ে আয়োজিত বহু মাহফিলেও তিনি বক্তৃতা করেন। এতে বিভ্রান্ত লোকদের অনেকেই অনুতপ্ত হয়ে ইসলামে ফিরে আসে। অন্যদিকে কাদিয়ানীদের উপরও ইহা কম প্রভাব বিস্তার করে।

পিরোজপুর ও পাঞ্জাবের কাদিয়ানীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অনুষ্ঠিত প্রথম বির্তক সভায় মাওলানা কান্ধলবীও একজন সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি কালিমাতুল্লাহ ফী হায়াতে রূহিল্লাহ গ্রন্থটি রচনা করে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত প্রত্যয়কে উদ্ভাসিত করে তোলেন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'খতমে নবুওয়াত' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সামরিক আইন জারী করেন। এতে বহুসংখ্যক আলেম গ্রেফতার হন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিশন ও হাইকোর্টের শুনানীর সময় মাননীয় বিচারপতিগণের সামনে আসামী পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মাওলানা কান্ধলবী পাকিস্তান আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য ছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় আমেলমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'ইসলামী শাসনতন্ত্র'-এর খসড়া প্রস্তুতি হচ্ছিল। এতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত ওলামা কমিটিতেও (৩১ সদস্য বিশিষ্ট্য) তিনি সদস্য ছিলেন। মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী ও মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন।

মৃত্যু

বৃদ্ধ বয়সে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হন। আগস্ট ১৯৭২-এ আকস্মিকভাবে রোগ বেড়ে যায়। এরপর হতে তিনি আর সুস্থ হননি। ১৯৭৩-৭৪ সালের তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সময়ও তিনি দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। ৮ রজব, ১৩৯৪ হিজরী তারিখে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শায়খুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র.

জন্ম

শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী র. ২রা রমযান ১৩০৪ হিজরী পাকিস্তানের গোজরাওয়ালা জেলার 'কসবায়ে জালালে' নও মুসলিম শেখ হাবিবুল্লাহর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নিজ এলাকার মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। ঐ সময় বিখ্যাত বিপ্লবী আলেম মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে পাত্তাজে তাশরীফ আনেন। তিনি শেখ হাবীবুল্লাহর আত্মীয় ছিলেন। শেখ হাবীবুল্লাহ তাঁর নয় বছরের সন্তান আহমাদ আলীকে দীন ইসলামের জন্য ওয়াকফ করেন এবং মাওলানা সিন্ধীর হাতে তাকে তুলে দেন। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ তাকে নিয়ে দীনপুর তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তিনি তাঁর মোরশেদের কাছে শিশু আহমাদ আলীকে বায়আত করান। এরপর তিনি শাগরেদকে নিয়ে আমরুত শরীফ ও গোট পীরঝান্ডায় নিজের কাছে রেখে তালীম দিতে থাকেন। তিনি ১৩২৭ হিজরীতে দরসে নেযামী সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

ফারেগ হওয়ার পর হযরত মাওলানা সিন্ধি স্থাপিত পীরঝান্ডার মাদরাসা দারুল ইরশাদে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং হযরত সিন্ধির মেয়েকে বিবাহ করেন। ১৯০৯ সালে মাওলানা সিন্ধি দ্বিতীয়বার দেওবন্দে আসলে দারুল ইরশাদের দায়িত্ব হযরত লাহোরীর উপর ন্যস্ত করা হয়। পরে অবশ্য তিনি হযরত সিন্ধি প্রতিষ্ঠিত অন্য এক মাদরাসায় দরস দেয়া শুরু করেন। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই শিশু ও মা এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করে। এরপর হযরত সিন্ধির এক বন্ধুর মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। ১৩৩০ হিজরীর মুহররম মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদে হযরত শায়খুল হিন্দ এ বিবাহ পড়ান।

ঐ সময় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি দেওবন্দে এসে ফুযালায়ে জমিয়তুল আনছার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন সিদ্ধান্ত হয় যে, আলীগড় থেকে পাঁচজন গ্রাজুয়েট ছাত্রকে কুরআনে হাকীমের বিপ্লবী শিক্ষার সাথে পরিচয় করাবার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। এ বিভাগটি নায্যারাতুল মা'আরিফিল

কুরআনিয়া নামে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঁচজন বিজ্ঞ আলেমকে ও গ্রাজুয়েটদেরকে একত্রিত করা হয়। হযরত মাওলানা সিন্ধি মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবকে দিল্লীতে তাঁর মাদরাসায় ডেকে আনেন এবং প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে ভর্তি করেন। ঐ সময় হযরত লাহোরী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধির দরসী বক্তৃতাগুলো লিপিবদ্ধ করার অনুমতি লাভ করেন।

দরসে কুরআন

কুরআনের ১৩তম পারার দরস চলাকালে হযরত শায়খুল হিন্দের রাজনৈতিক মিশন নিয়ে মাওলানা সিন্ধি কাবুল চলে গেলে হযরত মাওলানা লাহোরী এ প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। তিনি দু'বছর ধরে দরসে কুরআন দিতে থাকেন। ঐ সময় ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। নাযযারাতুল মা'আরিফে দরসে কুরআন দেয়া অবস্থায় হযরত লাহোরী গ্রেফতার হন, যার ফলে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েকমাস বিভিন্ন জেলখানায় আটক থাকার পর বৃটিশ সরকার তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেয় যে, তিনি সিন্ধু এলাকায় যেতে পারবেন না। বরং লাহোর এলাকায় থাকার জন্য তাঁর ওপর পাবন্দী লাগানো হয়।

লাহোরে অবস্থান

লাহোরে আসার পর তিনি জুমআর খুতবা দিতেন এবং একটি মসজিদে কুরআনের দরস দিতেন। ঐ সময় তিনি হজ্জ করেন। প্রথম হজ্জের পরে তিনি আরো ১৩ বার হজ্জ করেন। হজ্জের পরে তিনি এক মুহাজের কাফেলার আমীর হয়ে কাবুল উপস্থিত হন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। উস্তাদে মোহতারামের সাথে তাঁর দেখা হয়। হযরত আহমাদ আলী ১৯২০ সালে লাহোরে ফিরে আসেন। ১৯২২ সালে তিনি কুরআনে হাকীমের প্রচার-প্রসারের জন্য 'আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এরপর ১৯২৪ সালে মাদরাসা কাসেমুল উলূম কায়েম করেন। ১৯৪৫ সালে আঞ্জুমানের পক্ষ হতে একটি মহিলা মাদরাসা ও ১৯৫৫ সালে সাপ্তাহিক খুদ্দামুদ্দীন পত্রিকা চালু হয়।

তাফসীর প্রশিক্ষণ

শায়খুত তাফসীর হযরত লাহোরীর দরসে কুরআন গ্রন্থখানি খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর দরসে কুরআন ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও পাওয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ শ্রেণী ও ফারেগুত তাহসীল উলামা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক দরস হত। ফারেগ আলেমগণের জন্য শাবান থেকে ৩ মাসব্যাপী একটি কোর্স পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের বিপ্লবী আলেম

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির বিশেষ মুখপাত্র। হযরত লাহোরী শাহ ওয়ালী উল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থের দরস দিতেন। তিনি ছিলেন ওয়ালীউল্লাহী চিন্তাধারার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করেই তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন।

ইন্তেকাল

হযরত লাহোরী একজন মুজাহিদে মিল্লাত ছিলেন। তিনি ১৩৮১ হিজরীর ১৮ই রমযান, মোতাবেক ১৯৬২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে ইন্তেকাল করেন।
শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর দরসে কুরআন (তাফসীরের ক্লাস) খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বড় বড় মাদরাসার ফারেগ আলেমগণ দাওরার সনদ হাসেল করার পর হযরত লাহোরীর খেদমতে হাজির হয়ে তাফসীরের দরস গ্রহণ করতেন। হযরত মাওলানা মাদানী র. শায়খুত তাফসীরের দরস সম্পর্কে বলতেন, 'আপনারা আট বছর ধরে দেওবন্দে ইলম অর্জন করেছেন, কিন্তু আপনাদের তাকমীল মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর দরসে তাফসীর থেকে হতে হবে।'
আল্লাহ পাকের এক সিংহ লাহোরের শিরাওয়ালা গেইটে বসে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের অন্তর নিজের দিকে আকৃষ্ট করছেন। তিনি আল্লাহ পাকের এমন মকবুল বান্দা যে, 'তাঁর দরসে কুরআনে অংশগ্রহণের অর্থই হলো জান্নাতের গ্যারান্টি।'
হযরত লাহোরী কুরআন পাকের প্রকৃত আশেক ছিলেন। দরসে কুরআন, কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার ব্যতীত তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তি আসতো না। এ ছিল তাঁর রূহের খাদ্য এবং ব্যথার প্রতিষেধক। এই দরসে ঠিকমত উপস্থিত না হওয়াকে তিনি গুনাহে কবীরা এবং কঠিন দোষ মনে করতেন। তিনি দরসের এমন পাগল ছিলেন যে, তাঁর একটি শিশুর ইন্তেকাল হওয়ার দিনও তিনি দরস বন্ধ করেননি। দরসের পর উপস্থিত মেহমানদেরকে এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি বাচ্চার কাফন-দাফনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আল্লামা ইকবাল

১৮৭৩ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শেখ নূর মুহাম্মদের গৃহে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নাম দেয়া হয় মুহাম্মাদ ইকবাল। পরবর্তীকালে স্বধর্মাবলম্বীদের মনে ঈমান ও ইসলাম প্রীতির উন্মেষ করতে গিয়ে তিনি যে গভীর ধর্ম জ্ঞানের পরিচয় দেন, তাঁরই ফলে তাঁর উপাধী হয় আল্লামা ইকবাল। ইকবালের পিতা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ধর্মপরায়ণতার ক্ষেত্রে তাঁর মাও পিতার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলেন না। একবার ইকবালের পিতা শিয়ালকোটের কোন এক সরকারী কর্মচারীর অধীনে কাজ নেন। ইকবালের মায়ের মতে স্বামীর উপার্জিত অর্থের একটি অংশ শরীয়ত সিদ্ধ ছিল না। তিনি তাই একবার বলে বসলেন, স্বামীর উপার্জিত এই অর্থের বিনিময়ে কোন কিছু তিনি স্পর্শও করবেন না। বাধ্য হয়ে ইকবালের পিতাকে সে চাকুরী ছাড়তে হলো।

শিয়ালকোটের প্রাচ্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত মওলবী মীর হাসান ছিলেন শেখ নূর মুহাম্মদের বন্ধু। শৈশবে তিনিই ইকবালকে অতি যত্নের সাথে আরবী, ফারসী ও ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেন। কিছুদিন পর ইকবাল মিশন স্কুলে ভর্তি হন। মীর হাসান এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। পরে স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। এই কলেজ থেকে ইকবাল এফ. এ পাশ করেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইকবাল লাহোরে যান। সেখানে গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে তিনি বি. এ ও এম. এ পাশ করেন।

ইকবালের পিতার আর্থিক সামর্থ ছিল খুবই নগণ্য। বড় ভাই শেখ আতা মুহাম্মাদ ছিলেন চাকুরীজীবী। তিনিই সহোদর ইকবালের যাবতীয় খরচ জোগাতেন। লাহোরে থাকাকালে ইকবালের কবিতা লেখা শুরু হয়। 'মুশায়েরায়' শরীক হয়ে তিনি স্বরচিত কবিতা আবৃতি করে ঐ সময় শ্রোতাদের কাছ থেকে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থাতেই ইকবাল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এম. এ. পাশ করার পর তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে আবরী ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে রচিত তাঁর কয়েকটি কবিতা শেখ আব্দুল কাদিরের সম্পাদিত 'মাখাজান' পত্রিকার প্রকাশিত হয়।

ইকবালের প্রতিপাদ্য ছিল মরক্কো থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূ-ভাগের সকল মুসলমানই এক জাতি; কেন না, কোন ভৌগোলিক সংজ্ঞা বা পরিবেশের ওপর মুসলমানের জাতিত্ব নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঈমান ও ইসলামের সাধারণ মনোবিজ্ঞান বা আদর্শের ওপর।

১৯১৪ সালে ইকবালের 'আসরারে খুদী' ও ১৯১৮ সালে 'রমুযে বে-খুদী' প্রকাশিত হয়। বই দুখানি ফরাসী ভাষায় রচিত। এতে তিনি তাঁর আত্মদর্শন বর্ণনা করেছেন। বিচ্ছিন্ন বা সমষ্টিগতভাবে মানব ও বিবেকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের উৎকর্ষ বিধানের মধ্য দিয়ে কি করে আত্মার বিকাশ সাধন করা যায় এবং তার বলে কি করে প্রকৃতিকে বশে আনা যায়, ইকবাল তাঁর এই দার্শনিক আলোচনায় তারই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্তার ইঙ্গিত সৃজনধর্মী তৎপরতায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করতেই হবে।

এরপর উর্দূ ভাষায়, 'বাঙ্-ই-দ্বারা' নামে ইকবালের একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। তার কিছু দিনের মধ্যে 'পয়ামে মাশরিক' ও 'জবুর-ই- আজম' নামে ইকবালের দুখানি ফারসী পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'বাল-ই-জিবরিল' ও জারব-ই-কলিম' তাঁর দুখানি কবিতা সংকলন। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি দান্তের ডিভাইন কমেডির জবাবে ইকবাল ফারসী ভাষায় 'জাবিদনামা' রচনা করেন। জাবিদ-নামাটি ইকবালের একটি সংকলন গ্রন্থ। আল্লামার ইন্তেকালের পর 'আর-মুঘানি-হেজাজ' নামে তাঁর অবশিষ্ট উর্দূ ও ফারসী কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়।

এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও আল্লামা ইকবাল বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি অত্যন্ত ইসলাম এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যসার ও আদর্শগত দর্শনের ওপর আলোকসম্পাত করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষী সমাজ তাঁর এই বক্তৃতাগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

রাজনীতি সম্পর্কে ইকবালের গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেও কোনদিনই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। একবার তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁকে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনপ্রার্থী হতে বাধ্য করেন। নির্বাচনে ইকবাল জয়ীও হন। সদস্য থাকাকালে তিনি পরিষদের আলোচনায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখেন। কয়েকটি জটিল সমস্যার ওপর তাঁর বক্তৃতা খুবই ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পরিষদের সদস্য পদে ইস্ত ফা দেন। এই সময় তিনি তাঁর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ভিত্তি সুসংহত না হচ্ছে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যতদিন পর্যন্ত না মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব নয়।

১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তিনি এক

গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় আল্লামা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

এই পরিকল্পনার আসল দাবীদার চৌধুরী রহমাতুল্লাহ। ইতিপূর্বে লন্ডনে যখন গোলটেবিল বৈঠক বসে তৎকালীন ভারতের হিন্দু-মুসলমান নেতারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় চৌধুরী রহমতুল্লাহ নামে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়ছিলেন। রহমাতুল্লাহ নামে কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের নেতাদের কাছে গিয়ে বলেন যে, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে তা মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিন। ভারতের বাকী অংশ নিয়ে হিন্দুরা তুষ্ট থাকুন। সেদিন এ তরুণদের কথা শুনে নেতারা বিজ্ঞের হাসি হেসে সে কথাকে নস্যাৎ করেন। আল্লামা ইকবাল এই পরিকল্পনাকে অদম্য প্রাণে সঞ্জিবিত করে তোলেন।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকাকালে বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কয়েক দফা গোলটেবিল বৈঠকের বন্দোবস্ত করেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এই সব বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রস্তাবিত নয়া শাসনতন্ত্রে ভারতের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে জেনে আল্লামা ইকবাল এই বৈঠকে শরীক হন। গোলটেবিল বৈঠকে আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের স্বার্থ ও দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে মূল্যবান চিন্তার খোরাক যুগিয়ে গিয়েছেন।

বস্তুতঃ ইকবাল ছিলেন একটি জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা বিশেষ। ইকবাল চরিত্রের দীপ্তিই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণকে চরম দুর্দিনের ঘনান্ধকারেও সঠিক পথের সন্ধান জাগিয়ে এসেছে। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা অনাগতকালেও পাকিস্তান তথা সমগ্র মুসলিম জাহানকে পথ-নির্দেশ যোগাবে।

শেষ দিকে স্বাস্থ্যের অবনতি, ক্রমাগত রোগভোগ ও আর্থিক অনটন সত্ত্বেও ইকবাল মুসলিম ভারতের খেদমত করে গিয়েছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। বিনিময়ে তিনি কিছুরই প্রত্যাশা করেননি কোনদিন। যশ, মান, সম্পদের চিন্তা তাঁকে কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মহানবীর সা. উম্মতেরা সুখ-শান্তি তে সম্মানজনক জীবনযাপনে কর্মব্যস্ততা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ১৯৩৩ সালে তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে রুজি রোজগারের একমাত্র অবলম্বন আইন ব্যবসায় ছাড়তেও তিনি বাধ্য হন। আল্লামা ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের প্রশ্নে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও হিকাঙ্ক্ষীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ভূপালের নবাব হামিদুল্লাহ

খান কবির জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা হিসেবে আজীবন ভাতা মঞ্জুর করেন। এইভাবে আল্লামা ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। কবি হিসেবে আল্লামার হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল ও অনুভূতিশীল। তবু অত্যন্ত নির্ভীকভাবেই তিনি এই বিপদের মোকাবেলা করলেন। সন্তান দুটির জন্য তাঁর সম্পত্তি উইল করে দিয়ে চারজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তাঁর তত্ত্ব-তদারকের ভার দিলেন এবং ওঁদের দেখা শোনা ও লেখাপড়ার তত্ত্বাবধানের জন্য একাজ জার্মান মহিলাকে নিয়োগ করলেন। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য আলী বখ্‌শও মনিবের সন্তান দুটোর যত্ন নিতে লাগলো। ১৯৩৮ সালে কবির রোগ বৃদ্ধি পেল। তাঁকে প্রায় সারা দিনই বিছানায় ছটফট করে কাটাতে হতো। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি কাউকে সাক্ষাত দিতে অসম্মতি জানাননি। সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে কাউকে তিনি নিরাশ করেননি– জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত।

১৯৩৮ সালের ২০ শে এপ্রিল রাত্রে কবির স্বাস্থ্যের মারাত্মক রকম অবনতি দেখা দিল। পরদিন, অর্থাৎ ২১ শে এপ্রিল সূর্য ওঠার আগেই মুসলিম জাহানের একাগ্রচিত্ত কর্মসাধক ও প্রতিভাদীপ্ত চিন্তানায়ক আল্লামা ইকবাল পরপাড়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পিছনে রেখে গেলেন শোকসন্তপ্ত লক্ষ কোটি মানুষকে।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অভাব অনটন যে মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের পথে বাধা হতে পারে না, অমর কবি আল্লামা ইকবালের জীবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রয়োজন কেবল ধৈর্য ও তিতিক্ষার আর প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত কর্মসাধনার।

আমাদের প্রিয় মহানবী তেরশ বছর আগে উদাত্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন যে, আরবে আজমে তফাৎ নাই, মুসলমানেরা সকলে ভাই ভাই। অবনতির দিকে মুসলমানরা সে মহান বাণী ভুলতে বসেছিল। আল্লামা ইকবাল সেই আত্ম-ভোলা মুসলমানদের তাঁর অপূর্ব প্রেরণাময়ী ভাষায় ডেকে বলেন–

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা,
মুসলিম হ্যাঁয় হাম, সারে জাঁহা হামারা

অষ্টম অধ্যায়

হামদর্দের বিজ্ঞান নগরীতে

✍ ইসলামাবাদ যাওয়ার পূর্বেই নোমান ভাইকে আমার করাচীর বিভিন্ন দীনী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত করার একটা সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম জানিয়েছিলাম। সে মোতাবেক ইসলামাবাদ থেকে এসেই প্রথমে মদীনাতুল হিকমত দেখার প্রস্তুতি নিই। এ ব্যাপারে নোমান ভাই তাঁর মহল্লার ডা. সালাহ উদ্দিন সাহেবের সহযোগিতা নেন। ডা. সালাহ উদ্দিন সাহেব বিজ্ঞান নগরীতে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিভাগের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি একজন পাঠান। খুবই আলাপী মানুষ। আমাকে দেখতে আসেন। অনেক আলাপ আলোচনা হয়। সকাল ৮টায় ডা. সালাহ উদ্দীন সাহেবের বাসার সামনে থাকার কথা ঠিক হয়। ঠিক ৮ টায় আমরা তার পাপোশনগরের বাসায় হাযির হলে তিনি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বের হন। আমরা গাড়িতে উঠে বসি। তিনি গাড়ি ড্রাইভ করতে থাকেন এবং হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল বিজ্ঞান নগরী এবং তাঁর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের কর্মচঞ্চল অধ্যায়গুলো উল্টিয়ে যেতে থাকেন।

করাচীর নাযেমাবাদ/পাপোশনগর হতে প্রায় ২৫/৩০ কিলোমিটার উত্তরে ধূসর মরুভূমি এলাকায় গড়ে উঠেছে শহীদ হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের মদীনাতুল হিকমত বা বিজ্ঞান নগরী। ৩৫০ একর জমির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত।

প্রায় এক ঘণ্টায় আমরা তিনজন পৌঁছে গেলাম বিজ্ঞান নগরীর দ্বার প্রান্তে। প্রথমেই মেডিকেল বিভাগে পৌঁছে ডা. সালাহ উদ্দিন সাহেব উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশ থেকে হামদর্দ ফাউন্ডেশন দেখতে এসেছি শুনে তিনি খুশি হন। পরিচয়পর্বে তিনি বলেন আমিও ঢাকা এবং চিটাগাং বসবাস করে এসেছি। আমরা চা পান করে তাঁর কাছে বিজ্ঞান নগরী দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি ডা. সালাহ উদ্দিন সাহেবকেই আমাদের সাথে দেন। দেখা শুরু হয় মেডিকেল বিভাগ থেকে। মেডিকেল বিভাগের সবকিছু দেখে আমরা চলে যাই। লাইব্রেরী দেখতে। লাইব্রেরীটি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। এটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সব চাইতে বড় লাইব্রেরী। এখানে উর্দু, ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী ভাষায় কয়েক লক্ষ বই রয়েছে। লাইব্রেরীর দায়িত্বশীলরা আমাদেরকে সকল বিভাগ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। শিক্ষানুরাগী হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ সাহেবের লাইব্রেরী দেখে খুবই খুশি হই।

নগরীর প্রায় মাঝখানে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ সাহেবের মাজার অবস্থিত। মাজারটি উঁচুতে অবস্থিত হলেও সিঁড়ি দিয়ে নিচ তলায় এসে আসল কবরের পাশে দাঁড়ানো যায়। আমরা এই মহান কর্মবীরের কবরের পাশে এসে যিয়ারত করি।
এরপর আমরা ভিজিটরদের থাকার জন্য নির্মিত মেহমানখানা, ঔষধী গাছ গাছরার জন্য নির্ধারিত এলাকাসহ প্রায় সকল বিভাগ ঘুরে দেখলাম। এতে আমাদের প্রায় ৩ ঘণ্টা লেগে গেল।
শেষ মুহূর্তে মরহুমের বিজ্ঞান নগরী হামদর্দ ইউনিভারসিটি এবং তাঁর কর্মজীবনের ওপর কিছু উর্দু এবং ইংরেজী রচনাবলী সংগ্রহ করে ডা. সালাহ উদ্দিন সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞান নগরীর সবুজ চত্বর থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি করে নাযেমাবাদের দিকে ছুটে চলি।
ছোটকাল থেকে হামদর্দের ওষুধের নাম শুনে আসছিলাম এবং হামদর্দের ওষুধের জনপ্রিয়তাও লক্ষ্য করছিলাম। বাংলাদেশ হামদর্দের ওষুধ সম্পর্কে এতটুকু ধারণা ছিল যে, এটি একটি হার্বাল ওষুধ কোম্পানীর নাম–এর বেশি নয়। হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ কোম্পানীর বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার খেয়ালও আসেনি। পরবর্তীতে করাচী যাতায়াত শুরু হলে পাকিস্তান হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ও হামদর্দের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি। করাচীতে হাকীম সাহেব মদীনাতুল হিকমত (বিজ্ঞান নগরী) গড়ে তুলেছেন– তাও শুনতে পেয়েছিলাম। বিজ্ঞান নগরী ঘুরে দেখার লোভও হয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবে সে সাধ আর পূরণ হয়নি। এবার সে সাধ পুরো করার প্রোগ্রাম সফরের পূর্বেই নিয়ে ছিলাম।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ও হামদর্দ

বংশপরিচয়

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ এর পূর্ব পুরুষের আদিবাস ছিল চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের কাশগড় এলাকায়। সপ্তদশ শতকের শুরুতে তাঁর পূর্বপুরুষ কাশগড় ছেড়ে পেশওয়ার চলে আসেন। পেশা ছিল ব্যবসা। ৮০ বছর পর পেশওয়ার ছেড়ে চলে আসেন মুলতান। এখানে ছিলেন ১৩৫ বছর। এরপর হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ– এর পরদাদা মুলতান ছেড়ে দিল্লীর হাউজ কাজীতে এসে বসবাস শুরু করেন। সুলতান বাহাদুর শাহ জাফরের স্ত্রী জিনাত মহলের পৈত্রিক নিবাস ছিল এ এলাকায়। ১৮৫৬ সনে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ পরদাদা হাউজ কাজী ত্যাগ করেন। চলে এলেন পানিপথ এলাকায়। ১৮৬৪

সনে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের দাদা হাফেজ শেখ রহিম বখশ পানি পথে জন্মগ্রহণ করেন। নানা করিম বখশ– এর জন্ম ১৮৬১ সালে। পরে শেখ রহিম বখশ পানিপথ ছেড়ে পেলিভেতে চলে আসেন। একজন কাগজ ব্যবসায়ী তাঁকে ব্যবসায় নিয়োজিত করেন। কিছুদিন পর ব্যবসায়ী স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। তখন তিনি ১৮ বছরের যুবক। এখানে ১৮৮৩ সালে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের পিতা হাকীম হাফেজ আব্দুল মজিদ এবং ১৮৮৬ সালে চাচা আবদুর রশীদ জন্মগ্রহণ করেন। পেলিভেত ৮ বছর থেকে এ পরিবার আবার ফিরে আসে দিল্লীর হাউজ কাজীতে। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও সরকারী চাকুরী করেননি। পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস সম্পর্কে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল কাশগড়। কাশগড় চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের একটি বড় শহর। আমি ওখানে গিয়েছি। ওখানকার লোকেরা অত্যন্ত সাহসী, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। মেয়েরা পুরুষের মত পরিশ্রম করতে এবং ঘোড়া চালনায় পারদর্শী।

হাকীম আব্দুল মজিদের চাচা শেখ করিশ বখশ এর বাড়ীতে ছিল কঠোর ধর্মীয় পরিবেশ। তার ছিল দুজন কন্যা সন্তান। রাবেয়া বেগম এবং ফাতেমা বেগম।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি হাকীম আব্দুল মজিদের প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তিনি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেননি। সংসারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু আব্দুল মজিদ প্রথমেই উস্তাদ খাজা মো. মাশহুদের তত্ত্বাবধানে কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। যখনই সময় পেতেন বই পড়তেন। তখনকার প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ ওমর আখুনজীর কাছে মুরীদ হয়েছিলেন। সুযোগ পেলে খাজা বাকী বিল্লাহর দরবারে গিয়ে বসতেন। এভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবসায়িক কারণে তাঁকে অনেক দূর দূরান্তে যেতে হত। দিল্লী থেকে সিন্ধুর শিকারপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি।

শেখ করিম বখশের কন্যা রাবেয়া বেগম এর সাথে হাকীম আব্দুল মজিদের শুভ পরিণয় হয়। তখন তার বয়স মাত্র সতের বছর। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ বলেন, দুজনের বিয়ে সম্পন্ন হল। কোন ধুমধাম হয়নি। অত্যন্ত সাধারণ বিয়ে। আব্দুল মজিদ সাহেব গরীব ছিলেন। রাবেয়া বেগমও আমীর ছিলেন না। দু'বেলা আহার জোটানোর জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত।

জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আব্দুল মজিদকে হাকীম আজমল খানের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। তিনি কিছুদিন হাকীম আজমল খান প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্তান দাওয়াখানায় কাজ করেন। হার্বস এর প্রতি ছিল হাকীম আব্দুল মজিদের প্রচণ্ড

ঝোঁক। ওষুধি গাছ-গাছড়া চেনার ব্যাপারে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সিদ্ধান্ত নিলেন হার্বস এর ময়দানে পা রাখবেন এবং রোগীর সেবার জন্য সমগ্র ভারত থেকে লতাগুল্ম, ওষুধি উদ্ভিদ খুঁজে আনবেন। তিনি নিজে বনে চলে যেতেন। বন্ধুরাও সাহায্য করত। স্ত্রী রাবেয়া বেগমের পরামর্শে তিনি একটি হার্বাল সপ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ বলেন, আব্বার কাছে তখন মাত্র ১০ টাকা ছিল। নানাজানের কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার নিয়ে হামদর্দ নামে ছোট্ট আকারে একটি হার্বাল সপ প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তার বন্ধু হাকীম আজমল খান হিন্দুস্থান দাওয়াখানার জন্য তার কাছ থেকেই হার্বস সংগ্রহ করতেন। অল্প ক'দিন পর হাকীম আব্দুল মজিদ হার্বাল ওষুধি তৈরি শুরু করেন। স্ত্রী রাবেয়া বেগম ছিলেন তার সার্বক্ষণিক সহযোগী। তাঁর প্রস্তুতকৃত প্রথম ওষুধ ছিল লুবুল মোকাব্বির মেদা। রাবেয়া বেগম এবং তার বোন ফাতেমা বেগম শিল পাটায় হার্বস পিষে গুড়ো করে বড়ি (হাব্ব) তৈরি করতেন।

হাকীম আব্দুল মজিদের ছিল ৫ সন্তান। হামিদী খাতুন, হাকীম আব্দুল হামিদ, মাহমুদী খাতুন, আব্দুল ওয়াহিদ এবং হাকীম মোহাম্মাদ আবু সাঈদ।

১৯২২ সনের ২৩ মার্চ বিকেল পৌনে চারটায় মাত্র ৪০ বছর বয়সে হাকীম আব্দুল মজিদ ইন্তেকাল করেন।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ এবং হামদর্দ বাংলাদেশ

মানবদরদী শহীদ হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজসেবজ ও সংগঠকসহ নানাবিধ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকীম আব্দুল মজিদ হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ মানব সেবার মহান উদ্দেশ্যে ১ লা আগস্ট ১৯০৬ সালে ভারতের দিল্লীতে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করেন। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ৯ জানুয়ারী ১৯২০ সালে ভারতের দিল্লীতে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা হাকীম আব্দুল হামিদ ভারত হামদর্দ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং উভয় ভ্রাতা পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ভারত হামদর্দসহ তাঁদের সমস্ত সম্পদ জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দেন। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ পাকিস্তানে গমনপূর্বক করাচীর নাজিমাবাদে ২৮ জুন, ১৯৪৮ সালে হামদর্দ পাকিস্তানের গোড়াপত্তনসহ পৃথকভাবে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সূচনালগ্ন থেকে বাংলাদেশ হামদর্দকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, একাগ্রতা, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন বাংলাদেশ হামদর্দের উন্নয়নের জন্য সুপরামর্শসহ বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিয়েছেন। আজ তিনি নেই কিন্তু বাংলাদেশে রেখে গেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হাকীম মোহাম্মাদ ইউসুফ হারুন ভুঁইয়াকে। যিনি হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ এর চিন্তা চেতনাকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ হামদর্দের উন্নয়নে এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দৃঢ়তার সাথে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন বাংলাদেশ হামদর্দের মাঝে, বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের মাঝে।

সবশেষে বলা যায়, হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ছিলেন একজন প্রবাদতুল্য মহান মানতাবাদী ব্যক্তিত্ব। যিনি তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন মানবতার কল্যাণে। তাঁর জীবন ছিল কঠিন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। এ সংগ্রাম ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্য নয়। মানবের সুন্দরতম জীবন, রোগমুক্ত, জ্ঞানময় আর শান্তিময় পৃথিবীর জন্য। মেধা, শ্রম, অর্থ-বিত্ত, এসব নিজের নামে বা সন্তানের নামে কিছুই রেখে যাননি। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ হামদর্দের সমুদয় সম্পদই কেবল তিনি আল্লাহর নামে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে যাননি, পরিশেষে উৎসর্গ করে গেছেন তাঁর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। তিনি সার্থক। জীবনটা সততা ও মানব কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন।

আসলে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তিনি যুবক-বৃদ্ধ-শিশু সকলের কাছে সমান সম্মান পেয়েছেন। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন ঐতিহ্যের প্রতিরূপ। ঐ সকল ঐতিহ্য এখন খুব দ্রুত এ উপমহাদেশ থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবন নিরবধি নয়। তবে হাকীম সাহেব কম সময়ের মধ্যে যে কর্মযোগ রেখে গেছেন তা মহাকালের প্রতি নিরবধি হয়ে থাকবেন। চিকিৎসা, গবেষণা ও সমাজ উন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তার দ্বারা আজীবন বিশ্বের মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আজ মহাকালের প্রতিনিধি।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ছিলেন মানবাত্মার কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধ পুরুষ। দেশ-কাল-অতিক্রম্য এক মানুষ। বিশ্ব যার সংসার, মানুষ যার ভাই, সব ঘরে যার ঠাঁই। তিনি জন্মকালে এনেছিলেন স্বপ্নালোকের চাবি। তা দিয়ে খুলে শিখেয়েছেন সহিষ্ণুতা, উৎসর্জন, নির্ভীকতা, ঋজুতা আর দৃঢ়তা, সম্মান, মর্যাদাবোধ.

ভালবাসা আর আত্মনিবেদনের শিক্ষা। নিজেও চলেছেন উচ্চশীরে অবিরাম ঐ পথে। এরই নাম মানব জীবন। জীবনের কোন মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই জীবনবাদী হাকীম মোহ া ম্মদ সাঈদের। তিনি অমর। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। বেঁচে থাকবেন পৃথিবীর সকল যোগ্য মানুষের মাঝে একজন মহর্ষী রূপে।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য তাঁর কর্মকাণ্ড এবং প্রতিষ্ঠিত অম্লান স্মৃতি ও অবদান। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী শুধু একজন চিকিৎসাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সংগঠক, লেখক ও দার্শনিক নয়, হারিয়েছে একজন মহামানব ও সেবককে। তিনি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের ছিলেন না। তাঁকে হারানোর ক্ষতি সারা বিশ্বের জন্য অপূরণীয়। আজ তিনি নেই এ নশ্বর পৃথিবীতে। কিন্তু তাঁর আদর্শ, চিন্তা, কর্ম, প্রেরণা, অংকুরিত রয়েছে মানবের হৃদয়ে। তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ মানব সেবায় সার্থক ও মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ।

দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ শহীদ হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ বাংলাদেশের মানুষকে ভালবাসতেন প্রাণভরে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের গরীব-দুঃখী-অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন মানুষ, শিশু-কিশোর, রিকশাওয়ালা ও ঠেলাগাড়িওয়ালার মতো পরিশ্রমী মানুষ, এদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন দরদ। এরকম দরদী মনের অধিকারী হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ অধিকাংশ জনগণ অধ্যুষিত এলাকাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের চিকিৎসার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হামদর্দের শুভ সূচনা করেন। চট্টগ্রামের ১৯, আইস ফ্যাক্টরী রোডে এবং ঢাকায় রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা স্টেডিয়াম গেটের বিপরীতে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ এ হামদর্দের চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করেন। ঢাকার কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ কতখানি কর্মঠ ও করিৎকর্মা ছিলেন এবং বাংলার জাতীয় নেতারাও তাঁর প্রতিভার প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হামদর্দকে ১৯৬৪ সালে তিনি মানবকল্যাণে ওয়াকফ করে দেন। ওয়াকফ অর্থ আল্লাহর নামে জনগণের জন্য উৎসর্গ করা। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই ১৯৭২ সালে হামদর্দ বাংলাদেশ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁওয়ে নিজস্ব ওষুধ

কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। কারখানার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের স্পীকার মরহুম আব্দুল মালেক উকিল।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হামদর্দের কার্যক্রমের সূচনা সম্পর্কে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ তাঁর সাঈদ সাইয়াহ ঢাকা- মে (পর্যটক সাঈদ ঢাকায়) নামক ছোটদের জন্য লিখিত বইতে উল্লেখ করেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানে হামদর্দকে সুসংহত করার পর পরই ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করি। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের চিকিৎসার পাশাপাশি এখানকার হাকীমদেরকে উপার্জন ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করা এবং হামদর্দের এখানকার কার্যক্রমে বাঙ্গালী কর্মচারীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা।

বহু বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হামদর্দ লোকসান দিতে থাকে। এতে তিনি হতোদ্যম হননি। বরঞ্চ তিনি এখানে হামদর্দের কর্মপ্রবাহের গতি সম্প্রসারণ করেন। তিনি নিজে মাসে তিনদিন ঢাকা এসে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অবিরাম চিকিৎসা-সেবার মাধ্যমে রোগীদের খেদমত করতেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত, বছরের পর বছর তিনি এ খেদমত চালিয়ে গেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে অর্জিত সমস্ত অর্থই তিনি এখানে নিয়োগ করেছেন, একটি পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাননি। আর এজন্যই তিনি বাঙ্গালীদের অন্তহীন ভালবাসা পেয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ সরকারের ওয়াকফ প্রশাসনে হামদর্দ বাংলাদেশকে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তিসহ বাংলাদেশ হামদর্দের দায়িত্ব তাঁদের হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু হামদর্দের তৎকালীন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়াসহ ১৯৭২-১৯৭৭ সন পর্যন্ত লোকসান দিতে দিতে এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে পুঁজির চেয়ে ১০ গুণ দায়-দেনা নিয়ে হামদর্দের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোহাম্মাদ ইউসুফ হারুন ভুঁইয়ার হাতে নেতৃত্ব অর্পণ হওয়ার পর এর ক্রমোন্নয়নের ধারা সূচিত হয়। বর্তমানে হামদর্দ বাংলাদেশ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ লাভ করেছে।

হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ ১২ জুন ১৯৭৯ ঈসায়ী সর্বপ্রথম হামদর্দের উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। সেদিন ঢাকা বিমান বন্দরে হাকীম সাঈদকে স্বাগত জানিয়েছেন অফুরন্ত ভালবাসা। তাদের রোগ-শোক ও কষ্টকে নিজের মনে করে নিরলস সেবা দিয়েছেন। এই ভালবাসা ও সেবার প্রতিদানের ধ্বনি প্রতিফলিত হয়েছে সেদিন সে সকল জনতার কণ্ঠে।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে এসে হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এখানকার হামদর্দের সম্পদ তার নিজের সম্পদ নয়, এটা বাংলাদেশের

জনগণের সম্পদ। বাংলাদেশ চাইলে হামদর্দের উন্নয়নে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের ওয়াকফ প্রশাসনকে জানিয়ে দেন।

- তারা যেন হামদর্দ ল্যারেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ কায়েম করেন।
- হামদর্দ–এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন।
- হামদর্দ ট্রাস্টি বোর্ড স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

উক্ত শর্তগুলো সরকার মেনে নিলে তিনি হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। গোপন তথ্যাদির সবকিছু (ওষুধ প্রস্তুত সংক্রান্ত) সরবরাহ করবেন এবং একটি শিল্পরূপে একে গড়ে তুলতে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ–এর সফর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও, পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাথে তাঁর ভালবাসা মূল্যায়ন করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হামদর্দ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদনের মাধ্যমে দেশের স্বনামধন্য জ্ঞানী-গুণীজন যারা দেশের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ৯ জন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সরকার কর্তৃক প্রথম হামদর্দ ট্রাস্টি বোর্ড ১৭-১২-৮৬ ঈসায়ী গঠিত হয়।

এক নজরে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

(১৯২০- ১৯৯৮)

জন্ম : ১৯২০ সালের ৭ জানুয়ারী ভারতের রাজধানী দিল্লীতে।

পিতা : আব্দুল মজিদ (প্রতিষ্ঠাতা হামদর্দ দাওয়াখানা, দিল্লী, ভারত।

মাতা : রাবিয়া বেগম।

বিবাহ : ১৯৪৩ সালে।

স্ত্রী : নাঈমা বেগম। (মৃত্যু ১৮ আগস্ট ১৯৮০)

সন্তান : এক মেয়ে (সাদিয়া রশিদ, প্রেসিডেন্ট হামদর্দ ফাউন্ডেশন, পাকিস্তান।)

শিক্ষা

১৯৪০ সালে দিল্লীর আয়ুরবেদী এবং ইউনানী টিবি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বি. ই. এম. এস (ব্যাচেলর অব ইস্টার্ন মেডিসিন) এবং ১৯৮৪ সালে বিকল্প মেডিসিন বহুনৈতিক সামাজিক সাইন্সে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

৯ জানুয়ারী ১৯৪৮ পাকিস্তান চলে যান।১৯৪৮ সালে করাচীতে ক্লিনিক স্থাপন করেন এবং হারবাল মেডিসিন উৎপাদন শুরু করেন। তিনি করাচীর কতওয়াল বিল্ডিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালের ১৯ জুন হামদর্দখানার উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৫৩ সালে হামদর্দ সর্বাধিক উৎপাদিত ঔধষ শিল্পে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ হামদর্দকে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ হারবাল মেডিসিন উৎপাদনকারকে এবং ওয়াকফ (ট্রাস্ট) এ রূপান্তিত করেছেন।

তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৯৫৮ সালে তিনি হামদর্দ তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে হামদর্দ আল মজিদ কলেজ এন্ড ইস্টার্ন মেডিসিন নামে পরিচিত যা হামদর্দ ইউনিভার্সিটির একটি শিক্ষা অনুষদ। পাকিস্তান পাঁচ বছর মেয়াদী ইউনানী ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রী কোর্স চালু করেছে। অনেক ছাত্র এই কলেজে শিক্ষাসম্পন্ন করেছে।

রচনাবলী

প্রায় ১৯৬টি বইয়ের মালিক, সম্পাদক এবং সংকলক। ইসলামী মেডিসিন, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও পাকিস্তান বিষয়ে ইংরেজীতে ৩৫টি বই রচনা করেছেন। শিশুদের জন্য ইংরেজীতে রচিত ৮টি বই, উর্দু ভাষায় রচিত ৪৬ টি গ্রন্থ, ইসলাম শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ বিদ্যা, মেডিসিন, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক বই রয়েছে ১২টি। উর্দু ভাষায় যুবক ও শিশুদের জন্য ৪৫টি বই এবং কচি-কাঁচাদের জন্য ৫০টি বই লিখেছেন। অনেক বই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে, তাছাড়া তিনি কিছু সংবাদপত্রও সম্পাদনা করেছেন।

(১) হামদর্দ ইসলামীকাস (একটি মাসিক ইংরেজী ম্যাগাজিন।)

(২) হামদর্দ মেডিকাস (ত্রৈমাসিক ইংরেজী ম্যাগাজিন)।

(৩) হামদর্দ লাউনেহাল (উর্দু ভাষায় শিশু শিক্ষার মাসিক পত্রিকা।)

(৪) হামদর্দ ছেহহাত (স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক উর্দু মাসিক পত্রিকা।)

(৫) পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সাময়িকী (ত্রৈমাসিক ইংলিশ)।

(৬) পিয়ানি 'ইউনেসকো' জার্নালের পাকিস্তানের উর্দু সংস্করণ।

মদীনাতুল হিকমার ১৯৮৩ সালে করাচীর শহরতলীতে মদীনাতুল হিকমা (শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নগরী) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ৩৫০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি বেসরকারী খাতে লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যথা–

(১) হামদর্দ পাবলিক স্কুল, (২) হামদর্দ ইউনিভার্সিটি (যাতে রয়েছে বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠান ও অনুষদ), (৩) হামদর্দ মেডিক্যাল কমপ্লেক্স, (৪) বাইতুল হিকমা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, (৫) বাইতুল হিকমা ল্যাবরেটরী, (৬) বিজ্ঞান যাদুঘর, (৭) স্পোর্টস স্টেডিয়াম/খেলার মাঠ, (৮) হারবাল গার্ডেন (যেখানে হারবাল মেডিক্যাল গাছের চারা চাষ করা হয়)।

হামদর্দ ইউনিভার্সিটি

বর্তমানে হামদর্দ ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে ৯৯১৫ ছাত্র বিশিষ্ট পাঁচটি অনুষদ। ইউনিভার্সিটি ও এর ক্যাম্পাসে হামদর্দ পাবলিক স্কুল। (হামদর্দ পাবলিক স্কুলে) মোট রেজিস্টারভুক্ত ছাত্র সংখ্যা ২০২০ জন।

বাইতুল হিকমাহ লাইব্রেরি

বাইতুল হিকমাহ পাকিস্তানের একটি বৃহৎ লাইব্রেরী। এখানে উর্দু, ইংরেজী, আরবী ও ফারসি ভাষার চার লক্ষাধিক বই রয়েছে। এর মধ্যে ১৮২৭টি রয়েছে দুস্প্রাপ্য বই। সেখানে ১৬২৯টি পান্ডুলিপি, ৬৪টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের ৩৬০টি অনুবাদ, ২২৫৫টি চলতি সাময়িকী এবং ২৮০১০টি অতীত সাময়িকী (ঘটনাপঞ্জি)। লাইব্রেরীতে সংবাদপত্র কার্টিংও রয়েছে। ১২১০টি বিষয়ের উপরে ৩.৬১ মিলিয়নের অধিক পেপার কার্টিং রয়েছে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ১৬৪টি দেশ থেকে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ ৩০টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এর মধ্যে কয়েকটি হল–

১. দা মিলেনারি আর ইবনে আল হাইদাম। (১৯৬৯)
২. আল বেরুনী ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস। (১৯৭৩)
৩. ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন ম্যাথমেটিক্যাল সাইন্স। (১৯৭৫)
৪. ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন সিরাত। (১৯৭৬)
৫. ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন ইসলামিক মেডিসিন। (১৯৮৬)
৬. ইন্টারন্যাশনার কুরআন কংগ্রেস। (১৯৮৫)
৭. ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ কংগ্রেস। (১৯৮৬)
৮. কংগ্রেস অন হিস্ট্রি আনড ফিলোসফি আব সাইন্স। (১৯৭৯)
৯. ইন্টারন্যাশনাল সিমপোজিয়াম অন ইলিমেন্টস ইন হেলথ আনড ডি ত্রস
   এবং আরও অনেক কনফারেন্স।

এছাড়াও তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে শতাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

সামই হামদর্দ আনড বাজামই নওনেহাল

বিগত ৩০ বছর যাবত তিনি সামই হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে শত শত বুদ্ধিজীবী ইসলাম, পাকিস্তান, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। পরে সামই হামদর্দকে হামদর্দ বেমারা (হামদর্দ উপদেষ্টা পরিষদ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন বাজামই নওনেহাল ও নওনেহাল এ্যাসেমব্লি (শিক্ষা সংগঠন)।

পদ

১. তিনি ১৯৭৯-১৯৮২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হকের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।
২. ১৯৯৩ সালে সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। ঐ সময়ে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সনদ লাভ করেন।

পুরস্কার

১. ২০০০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিশান-ই-ইমতিয়াজ (পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পুরস্কার) লাভ করেন।
২. ১৯৬৬ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতরা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার লাভ করেন।
৩. ১৯৮২ সালে কুয়েত ফাউন্ডেশন ফর এ্যাডভন্সিমের্দ অব সাইন্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইসলামিক মেডিসিন এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।
৪. পাকিস্তানের আধিবাসীদের কাছ থেকে সাদিক দসত পুরস্কার লাভ করেন।
৫. ১৯৮১ সালে ইস্তাম্বুল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব হিস্ট্রি অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি থেকে সার্টিফিকেট অব মেরিন্ট অর্জন করে।

ক্লিনিক

তিনি ১৯৪৮ সালে করাচীতে প্রথম ক্লিনিক স্থাপন করেন। এরপরে তিনি তাঁর সেবার পরিধি অন্যান্য শহরে বর্ধিত করেন। তিনি প্রতি মাসে করাচী, পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি এবং লাহোরে তাঁর ক্লিনিকসমূহে ভ্রমণ করতেন। তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কখনো কারও কাছ থেকে ফি নেননি। বরং গরীব রোগীদেরকে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক

তিনি সম্পত্তি বা টাকা পয়সা জমা করতেন না। তিনি করাচীতে তাঁর নিজের বসবাসরত বাড়িটি ব্যতীত ১৯৪৮ সাল থেকে তার ওফাতের সময় পর্যন্ত পাকিস্তান কিংবা অন্য কোথাও কোন সম্পত্তি অর্জন করেননি। তিনি একটি সাদা সেরওয়ানী পড়তেন। ঔই সেরওয়ানীটি মাঝে মাঝে নিজে ধৌত করতেন।

হামদর্দ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি অজস্র ঔষধের এক বিরাট ভাণ্ডার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম যুগে রোগ নিরাময়ের প্রধান অবলম্বন ছিল কাঁচা শিকড়-বাকড় ও গাছ গাছড়া। যুগের পরিবর্তনে এরও পরিবর্তন হয়েছে। ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারিত উপাদানে তৈরি নির্যাস, সিরাপ, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, অয়েনমেন্টস, সেমি সলিডস প্রভৃতি আধুনিক ডোসেজ ফর্মের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। ঔষধ প্রয়োগের এই বিভিন্ন প্রণালীর বিকাশে গ্রীসিয়, ফার্সীয় ও আরবীয় চিকিৎসকদের দান অপরিসীম। অবশ্য এই উপমহাদেশের চিকিৎসকগণও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেননি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তাদের অবদানও বিশেষভাবে স্বীকৃত।

২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ইউনানী চিকিৎসা গবেষণার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে ইউনানী চিকিৎসা তথা প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হয়। সে প্রেক্ষাপটে হাকীম আব্দুল মজিদ ১৯০৬ সালে দিল্লীতে হামদর্দের কার্যক্রম শুরু করেন কয়েকটি মৌলিক লক্ষ্য সামনে নিয়ে। লক্ষ্যগুলো ছিল– প্রাচ্য চিকিৎসা পদ্ধতির সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন, ঔষধনীতি প্রণয়ন, ঔষধ শিল্পের বিকাশ এবং ঔষধের মান নির্ধারণ, সুভল মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ করা; স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুশিক্ষা প্রদান ও নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা এবং জনকল্যাণে কাজ করা।

বিগত ১০০ বছরে হামদর্দ অনেক মহান কাজ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছে এবং একটি ব্যতিক্রমী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইউনানী ঔষধ তৈরির মাধ্যমে গণমানুষের স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা ও মানব কল্যাণমুখী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। হামদর্দ ব্যাপকভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে বহুল পরিচিত ঔষধগুলোর প্রস্তুত প্রণালীকে নির্দিষ্ট মানে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ করে 'হামদর্দ ফার্মাকোপিয়া অব ইস্টার্ন মেডিসিন।'

ঔষধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে হামর্দদ ইতোমধ্যেই প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। দি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইউনানী মেডিসিন হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়নের কথা বলতে

গিয়ে বলেছে– ১৯০০-১৯৯৯ সাল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী হচ্ছে হামদর্দের স্বর্ণোজ্জ্বল শতাব্দী **(1900-1999- The Hamdard Era)**। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক থেকে এ চিকিৎসার ধারক দুই প্রাণপুরুষ হাকীম আব্দুল হামিদ ও হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বিগত শতাব্দীব্যাপী হার্বাল ঔষধের উন্নয়ন এবং বিশ্ব দরবারে হামদর্দের মাধ্যমে হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সুপরিচিতি করেছেন বলে দি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইউনানী মেডিসিন তাদেরকে দুই আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব **(The two towering figure)** বলে তাদের ওয়েবসাইটে আখ্যায়িত করেছে।

শতাব্দীব্যাপী হামদর্দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আজ ইউনানী (প্রাচ্য) চিকিৎসা ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বে মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রাচ্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি এর গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

হামদর্দ ভারত প্রতিষ্ঠা করেছে গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হামদর্দ নগর, জামিয়া হামদর্দ, গালিব একাডেমী, মজিদিয়া হাসপাতাল ইত্যাদি। হামদর্দ পাকিস্তান করাচীতে প্রতিষ্ঠা করেছে মদিনাত-আল-হিকমাহ (বিজ্ঞান নগরী), হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, হামদর্দ মেডিক্যাল কলেজ, হামদর্দ হাসপাতাল ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী বায়াত-আল-হিকমাহ। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকায়ও বিজ্ঞান নগরীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেখানে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, গবেষণাগার, অত্যাধুনিক কারখানা ইত্যাদি।

হাকীম আব্দুল মজিদের সুযোগ্য উত্তরসূরী ও জ্যেষ্ঠপুত্র হাকীম আব্দুল হামিদ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীর চ্যান্সেলর ও হামদর্দ ফাউন্ডেশন ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বোচ্চ সম্মান 'ইবনে সিনা' পুরস্কার, ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, পদ্মভূষণসহ অসংখ্য সম্মানসূচক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণার আরেক দিগপাল হাকীম আব্দুল মজিদের কনিষ্ঠ পুত্র হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদ হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান এর চ্যান্সেলর, করাচী বিজ্ঞান নগরী এবং হামদর্দ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ হামদর্দের ওয়াকীফ মোতাওয়াল্লী ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য হাকীম মোহাম্মাদ সাঈদও ইবনে সিনা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পান। ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের আরেক প্রতিথযশা ব্যক্তি হাকীম মোহাম্মাদ ইউসুফ হারুন ভূঁইয়া, যিনি আধুনিক হামদর্দের রূপকার, হামদর্দ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মহাসচিব। বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে যার অসামান্য অবদান রয়েছে। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব এরিজোনা এর পক্ষে দিল্লীর **South East Asian Regional College** কর্তৃক প্রদত্ত হার্বাল মেডিসিনের ওপর গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, জাতীয় মানবাধিকার সাংবাদিক সংস্থা স্বর্ণপদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পান। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

হামদর্দ বাংলাদেশ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর উচ্চমান বজায় রাখতে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সম্বলিত সুসজ্জিত কারখানা স্থাপন করেছে, যেগুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সুযোগ্য বিশেষজ্ঞগণ। এখানে কাঁচামাল থেকে শুরু করে একেবারে তৈরি পর্যন্ত প্রতি ধাপে ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। এক কথায় ঔষধের কাঁচা অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ তৈরি আকারে রোগীর সেবন পর্যন্ত যাতে ঔষধের গুণাগুণ এতটুকু নষ্ট না হয় বা মানের অবনতি না হয়– তার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভূঁইয়া নিজে ঔষধ তৈরির যাবতীয় কাজকর্ম খুব যত্ন নিয়ে দেখাশুনা করেন, যাতে নিম্নমানের কোন উপকরণ দিয়ে ঔষধ-পত্রের মান সর্বোচ্চ স্তরে রাখার জন্য প্রশাসনিক, আর্থিক কোন কিছু বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এজন্য হামদর্দের সমস্ত ঔষধ সারাদেশে এত জনপ্রিয় এবং সকলে অটল বিশ্বাসে তা ব্যবহার করেন। হামদর্দ একটি ওয়াক্ফ লিল্লাহ প্রতিষ্ঠান যার সমুদয় আয় মানব কল্যাণে ব্যয় হয়। আপামর জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হামদর্দ সমগ্র দেশের সকল ডাক্তার, হাকীম, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কেমিস্ট, ফার্মাসিস্ট, বোটানিস্ট, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিকসহ সকল পেশার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে।

সারাদেশে হামদর্দের ৯১টি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। হামদর্দ বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বারডেম, বিসিএসআইআর, ঢাকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হামদর্দ বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে। ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে বগুড়ার হামদর্দ ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

হামদর্দ সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং গবেষণার জন্য হাতে নিয়েছে পাঁচশত কোটি টাকার প্রকল্প, বিজ্ঞান নগরী' যেখানে থাকবে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, গবেষণাগার, অত্যাধুনিক কারখানা ও ঔষধী গাছ গাছড়ার বাগান। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশীয় গাছ গাছড়া দিয়ে সুলভ মূল্যে নতুন নতুন অত্যাবশ্যকীয় ঔধষ আবিষ্কার সম্ভব হবে। অসংখ্য মানুষ স্বল্প মূল্যে পাবে চিকিৎসা সুযোগ। আর্ত-পীড়িত ও দুঃস্থ মানুষ পাবে মানবিক সহযোগিতা। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে, ঔধষি গাছ-গাছড়ার বাগান তৈরি করা হয়েছে এবং এর সম্প্রসার অব্যাহত রয়েছে।

নবম অধ্যায়

সাপ্তাহিক যরবে মোমেন ও দৈনিক ইসলাম পত্রিকা অফিসে

যোহরের নামাযের পূর্বেই নোমান ভাইসহ নাযেমাবাদের দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ সংলগ্ন সাপ্তাহিক জরবে মোমেন এবং দৈনিক ইসলাম পত্রিকার অফিসে পৌছে যাই। ইসলামাবাদের ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর বার্ষিক কনভেনশনে যরবে মোমেনের এক সাংবাদিকের সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি ঢাকা ফিরে যাওয়ার পূর্বে করাচীতে তার অফিসে দেখা করার দাওয়াত দেন। সাপ্তাহিক যরবে মোমেন পত্রিকা পাকিস্তানের অন্যতম কর্মবীর আলেম মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকাটি ওলামায়ে কেরামদের লেখনীর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টিতে কামিয়াব হয়। পত্রিকাটি দীর্ঘ দশ বছর চলছে। শুধু সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেই মুফতী সাহেব ক্লান্ত হননি। বরং তিনি দৈনিক ইসলাম পত্রিকাও বের করেন। এ পত্রিকাটিও পাকিস্তানের আলেম ওলামাদের ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যোহরের নামাযের পূর্বেই মাওলানা রশীদ আহমদের সাথে দেখা হয়। নামাযের পর তিনি যরবে মোমেন এবং দৈনিক ইসলামের সকল বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান। সত্যিই তা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বাংলাদেশের ওলামাদের পক্ষ থেকে এমন একটি মৌলিক কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই অনুভূত হচ্ছে, কিন্তু হায় তা বাস্তবতা পাচ্ছে না! যা হোক এ পত্রিকার বিভিন্ন ফিচার বিভাগ যেমন বাচ্চুও কা ইসলাম, আওরতুও কা ইসলাম প্রভৃতি পাতা সারা বিশ্বে নাম করেছে। দৈনিক ইসলাম পাকিস্তানের বিখ্যাত ৫টি জেলা শহর রাওয়ালপিন্ডি, করাচী, লাহোর, পেশোয়ার, মুলতান, মুজাফরবাদ থেকে একযোগে বের হয়। বিভিন্ন ফিচারে সমৃদ্ধ হয়ে রঙ্গীন বিশেষ বার্তাসহ এ পত্রিকা শুধু ওলামাদের নয় সাধারণ বুদ্ধিজীবী মহলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

দৈনিক ইসলামে ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর ১৯ শে নভেম্বর বার্ষিক কনভেনশনের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়। কনভেনশনের পর কয়েক দিন কনভেনশনের ওপর এবং এ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের অভিমতসহ জোরালোভাবে তুলে ধরে।

প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে নছরাতুল উলূমের শায়খুল হাদীস বিশিষ্ট কলামিস্ট মাওলানা যাহেদুর রাশেদী এতে কলাম লেখেন।

দৈনিক ইসলামের কনফারেন্স রুমে বসে ভাই বাংলাদেশের দীনী মাদরাসাগুলো কার্যক্রম নেসাব নেযাম এবং প্রেক্ষাপটে দীনী মাদরাসাসমূহের কলাকৌশলের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমার একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানতে পারিনি। জুমার নামাযের দিন মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবের বাসায় খানা খাওয়ার সময় দৈনিক ইসলামের পাতা উল্টাতে উল্টাতে দেখি মাওলানা যাহেদুর রাশেদী সাহেবের কলাম। উপরে হেড লাইন ছিল 'এক নামে তিন সালমান' কলামটি পড়ে হাসি পেল। তিনি প্রথমে ভারতের লাখনৌর নদওয়াতুল ওলামা শরীয়া বিভাগের ডীন এর জামেয়া সাইয়েদ আহমদ শহীদের ফ্যাকাল্টি, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর নাতি মাওলানা সাইয়েদ সালমান হুসাইনীর বিভিন্ন দীনী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে দক্ষিণ আফ্রিকার ডা. সালমান নদভী সাহেবের কথা। যিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমেদীন ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী র.-এর সুযোগ্য সাহেবজাদার এবং ৩য় অংশে হযরত রাশেদী সাহেব এ বান্দার কিছু কথা তুলে ধরেছেন। আলোচনা পড়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি। সাথে সাথে রাশেদী সাহেবকে ফোন করি। প্রবন্ধের কথা বলি, কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখানে আরো একটি ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তা হচ্ছে, আমরা এ ঘটনার ১ বছর পূর্বে বৃটেনের সেন্টার শহরে জনাব হাফেজ ফারুক সাহেবের মসজিদে এশার নামাযে মিলিত হই। ঘটনাক্রমে তিনজন এক সাথে একই কাতারে দাঁড়াই। নামাযের মাত্র ১ মিনিট বাকী আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় লাখনৌর মাওলানা সালমান হুসাইনী সাহেব আমার দিকে ইশারা করে বলে ওঠেন- দেখ তুমি বাংলাদেশের সালমান, আমি ইন্ডিয়ান সালমান আর আমার পাশে সাউথ আফ্রিকান সালমান। মাওলানার কথা শুনে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি।

জামেয়াতুর রশীদের পথে

সোমবার দিন মাওলানা নোমান সাহেবের বাসায় আরাম করি। পরদিন সকালে হযরত মাওলানা মুফতী রশিদ আহমাদ লুধিয়ানভী র.-এর জামেয়াতুর রশীদ দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করি। মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবেরও আমাদের সাথে যাওয়া ঠিক হয়। আমরা প্রথমেই মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবের লাচ্ছি গোটের মাদরাসায় উপস্থিত হই। সেখানে মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব বিরাট মহিলা ও পুরুষ মাদরাসায় দায়িত্ব পালন করছেন।

বেলা ১১টায় আমরা লাচ্ছি গোটের মাদরাসা থেকে প্রায় ৭/৮ মাইল দূরে আহসানাবাদের জামেয়াতুর রশীদের গেটে পৌঁছে যাই। জামেয়াতুর রশীদের কথা পূর্বেই শুনেছিলাম। লন্ডন থেকে এর আলোচনাও শুনে আসছিলাম। এমনকি ইসলামাবাদের ইসলামী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জনাব মাহমুদ আহমদ গাজী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকালে তিনিও বলেছিলেন মাওলানা, করাচীর জামেয়াতুর রশীদে অবশ্যই যাবেন। মাদরাসার গেটে যেয়ে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বলতেই আমাদেরকে অভ্যর্থনা কক্ষে বসানো হলো।

আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরই আমাদের সাথে গাইড দেয়া হয়। গাইড আমাদের মাদরাসার সকল বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান। মাদরাসা দেখে হযরত মুফতী লুধিয়ানভীর চিন্তা-চেতনা এবং রুচির সম্যক ধারণা করা গেল। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার বহু দীনী প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে। পাকিস্তানের বড় বড় দীনী প্রতিষ্ঠান যেমন দারুল উলূম করাচী, জামেয়াতুল উলুমূল ইসলামী, জামেয়া ফারুকিয়া কিন্তু জামেয়াতুর রশীদ হযরত মুফতী সাহেবের দিলের আহাজারী এবং শেষ রাতের দুআর এক বাস্ত ব ফসল। জীবন সায়াহ্নে তিনি জামেয়াতুর রশীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার পরিবর্তন করেছিলেন।

তিনি সকলের কাছে একজন আপোষহীন মুফতী হিসেবে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকাসহ মিডিয়া, প্রকাশনা, খেদমত ও তালীমের মাধ্যমে দীনী খেদমতের অনেকগুলো ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং নিজের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য শাগরেদও তৈরি করেছিলেন। তাখাচ্ছুস বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন বিখ্যাত আলেম এবং লেখক মুফতী আবু লুবাবা সাহেব এবং মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করছেন হযরত মুফতী সাহেবের খলীফা মাওলানা আব্দুর রহীম। দরস চলার কারণে এবং

আমাদের হাতে সময় না থাকায় দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হল না। কম্পিউটার ল্যাবসহ সবকিছু দেখলাম। মসজিদের নীচ তলায় মুফতী সাহেবের ব্যবহৃত গাড়িসহ সকল জিনিস হিফাজত করা হয়েছে। গাছপালা, তরুলতা ও সবুজের ছড়াছড়ি, ফুলের বাগান শোভিত হয়েছে জামেয়াতুর রশীদের চত্বর। মুফতী সাহেবের দারাজাত বুলন্দির দুআ করে এবং মাদরাসার বিশাল প্রসপেক্টাস নিয়ে আমরা হযরত মুফতী শফী সাহেব র. -এর দারুল উলূম দেখতে কৌরঙ্গীর দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দেই।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী ও জামিয়াতুর রশীদ

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর বিভিন্ন শহরের বড় বড় মাদরাসায় দীনী তালীম গ্রহণের পর ১৩৬০ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানীর নিকট বুখারী শরীফ পড়েন। হযরত মাওলানা এজাজ আলী, মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী তাঁর বিখ্যাত উস্তাদগণের অন্যতম।

ফারেগ হওয়ার পর তিনি সিন্ধুর হায়দারাবাদের মদীনাতুল উলূম মাদরাসায়, সিড়ির দারুল হুদা মাদরাসায়, দারুল উলূম কৌরঙ্গীতে হাদীস এবং ফিকাহ এর দরস দিতে থাকেন। ১৩৮৩ হিজরীতে তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদের ইশারায় নাযেমাবাদে কায়েম করেন আশরাফুল মাদারিস। পরে এ মাদরাসার নাম পরিবর্তন করে দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ রাখেন। এখানে শুধু ফারেগ ওলামাদের ভর্তি করা হত।

হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ প্রথমে হযরত মাদানীর হাতে বায়াত হন। হযরত মাদানীর ইন্তেকালের পর হযরত থানভীর অন্যতম খলীফা জামেয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতী হাসান সাহেবের হাতে বায়াত হন। এরপর তিনি সুলতানুল আরেফীন হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরীর হাতে বায়াত হন। হযরত ফুলপুরী তাঁকে খেলাফত দান করেন। নাযেমাবাদে হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেবের ইসলাহী মজলিস খুবই কামিয়াবীর সাথে প্রতিদিন আসরের পরে চালু ছিল। যার ফলে হাজারো মানুষের তওবা নসীব হয়েছে।

মুফতী সাহেব একজন কর্মবীর আলেম ছিলেন। কলমী ময়দানসহ বিভিন্ন ময়দানে তিনি বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর

শুরু করা কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি চৌকষ টীম তৈরি করে গেছেন। করাচীর অদূরে আহসানাবাদের জামেয়াতুর রশীদ, সাপ্তাহিক যরবে মোমেন, দৈনিক ইসলাম, আর রশীদ ট্রাস্ট ইত্যাদি কার্যক্রম মুফতী সাহেবকে অমর করে রাখবে। মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে পাকিস্তানের দীন-দরদী ইসলাম পিপাসুরা তাঁকে চিরদিন স্মরণ রাখবে।

২০০২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তিনি করাচীতে ইন্তেকাল করেন। ওছিয়ত অনুযায়ী তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত ফুলপুরীর কবরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

জামিয়াতুর রশীদ –এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ তাআলার অগণিত ভাণ্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাজানা বা ভাণ্ডার হল হেদায়েতের খাজানা। যে বস্তু আমাদের জন্য যত বেশি প্রয়োজন ও গুরুত্বের দাবীদার আল্লাহ তাআলা সে বস্তু তত বেশি সহজলভ্য ও ব্যাপক করে দেন। রাসূলুল্লাহ সা. -এর পরবর্তী যুগে আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে নিঃস্ব ছেড়ে দেননি। যেখানে, যখন, যে ধরনের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তাআলা সে অনুপাতে ওলামায়ে কেরাম ও ফকীহে রব্বানী সৃষ্টি করেন, যারা খোদাভীতি, ইলম ও আমলের পরিপক্কতা, তাকওয়া ও তাহারাত এবং জাহেরী ও বাতেনী কামালাতে সজ্জিত হয়ে সাধারণ মানুষের এসলাহ ও তারবিয়াতের পাশাপাশি তাদের সফলতা ও উন্নতির জন্য সমুজ্জ্বল কার্যক্রম আঞ্জাম দেন। হযরত মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব র. সেই মোবারক কাফেলার একজন গর্বিত সদস্য। যার চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টিজ্ঞানের ফলে কেবল পাকিস্তানের মুসলমান নয়, পুরো মুসলিম উম্মাহ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচীর আহসানাবাদে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অবস্থিত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা নিকেতন জামিয়াতুর রশীদ পাকিস্তানের সাবেক মুফতীয়ে আজম, মুফতী রশীদ আহমদ সাহেবের তাকওয়া, সমুন্নত চিন্তা-চেতনা, গভীর রাতের ক্রন্দন, ব্যথাভরা হৃদয়ের মুনাজাত ও দুআর ফসল। সমসাময়িককালে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নজির পাক–ভারত উপমহাদেশে বিরল বললেই চলে।

জামিয়াতুর রশীদের বিশেষত্ব ও পরিচয় তুলে ধরার পূর্বে মুফতী রশীদ আহমদ র. এর কিছু সংস্কারধর্মী কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি যে সব সমুন্নত সংস্কারধর্মী কার্যক্রম আঞ্জাম দেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

১. মানবসেবা
হযরত মুফতী সাহেব র. এই বিস্মৃত সেক্টরকে পুনরুজ্জীবন দান করেন এবং এ লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আর রশীদ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। যা অল্প দিনের মধ্যেই মানবসেবা, অধিকার সংরক্ষণ, অসহায় ও গরীবদের সাহায্য, পারস্পরিক সহানুভূতি ও কুরবানীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে।

ইসলামী সংবাদপত্র
প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সেক্টরটি প্রায় সামগ্রিকভাবে ধর্মহীন ও অনৈসলামী শক্তির হাতেই দীর্ঘদিন ধরে আবর্তিত হচ্ছে। এই কলুষিত ময়দানকে নিষ্কলুষ করার প্রয়োজনীয়তার তাগিদে মুফতী সাহেব র. সাপ্তাহিক যরবে মোমেন প্রকাশ শুরু করেন, যার পাঠক সংখ্যা অল্প দিনের মধ্যেই ১৫ লাখ থেকে ২০ লাখে উন্নীত হয়। এছাড়া রোজনামায়ে (দৈনিক) ইসলাম, বাচ্চাদের ইসলাম, মহিলাদের ইসলাম, ইংরেজী যরবে মোমেন এবং ইংরেজী ম্যাগাজিন দ্যা ট্রুথ প্রকাশ করেন। যার সর্বমোট পাঠক সংখ্যা লাখের মধ্যেই হিসাব করা হয়। এসব পত্র-পত্রিকা জামেয়াতুর রশীদের ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। ছবিবিহীন এসব সংবাদপত্রের প্রচার-প্রকাশ ও জনপ্রিয়তা দেখে বড় বড় পেশাদার সাংবাদিকদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। তাদের প্রশ্ন হল- কোন সংবাদপত্র কিংবা ম্যাগাজিন কি ছবি ছাড়াও চলতে পারে?

২. চিকিৎসা সেবা
মানবসেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা গুরুত্বের দিক দিয়ে শীর্ষস্থানীয়। মুফতী সাহেব র. এক্ষেত্রেও বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে আর-রশীদ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, আর-রশীদ ক্লিনিকস্‌, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, অসহায় ও দরিদ্রদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি অনুসারে বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহ করে। মানব সেবার এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল বললেই চলে। বর্তমানে শরীয়াভিত্তিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন আল-আযীয মেডিকেল প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে।

৩. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শরয়ী নিয়ম-নীতির অধীনে আনা
মুফতী সাহেব র. এর ইচ্ছা ছিল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শরয়ী নিয়ম-নীতির অধীনস্ত ও অনুসারী করা। সে অনুসারে তার ভক্ত-অনুরক্তরা 'সুফফা সেভিয়ার' শিক্ষা পরিকল্পনার সূচনা করেন। এ পরিকল্পনার মূল কথা হল-

আধুনিক শিক্ষার বিপরীতে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ আকলের পরিবর্তে ওহীর ওপর। আর ওহীর আলো ব্যতীত আকল ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হয়। মাশাআল্লাহ! এক্ষেত্রেও বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি হচ্ছে।

৪. দীনী শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শিক সংস্কার বাস্তবায়ন

হযরত মুফতী সাহেব র. আধুনিক চাহিদার আলোকে দীনী মাদরাসার সংস্কারের পক্ষপাতি ছিলেন এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আশা পোষণ করতেন যাতে কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহ শাস্ত্রে সুদৃঢ় ও গভীর যোগ্যতার অধিকারী ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম তৈরি হবে এবং যারা আমলের ময়দানে সুন্নাতের অনুসরণ ও অপছন্দনীয় বিষয় বর্জন এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতার ক্ষেত্রেও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবেন।

মাশাআল্লাহ! বর্তমানে জামেয়াতুর রশীদ হযরত মুফতী সাহেব র. এর সেই মহান স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে, যা নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো দেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গণ্য হচ্ছে। আর যা তার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, তরবিয়াত, নিয়ম-শৃংখলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। নিম্নে জামেয়াতুর রশীদের কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরা হল-

পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচীর অনতিদূরে আহসানাবাদে এক মনোরম পরিবেশে এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সুশৃংঙ্খলিতভাবে ছড়িয়ে আছে এই জামেয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও ভবন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, স্থানে স্থানে ফুলের বাগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উন্নত রুচিবোধ এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শরীর চর্চা ও খেলাধুলার উন্নত ব্যবস্থাপনা, পার্ক, সুইমিংপুল, চিকিৎসার সুব্যবস্থাপনা, পড়াশুনার উন্নত মান, সুশৃঙ্খলিত নিয়মকানুন প্রভৃতি এ প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। এতে যারা ফেকাহ শাস্ত্রে তাখাচ্ছুছ পড়ে তাদেরকে ইংরেজীর পাশাপাশি কম্পিউটারও শিখানো হয়। এতে গ্রাজুয়েটদের জন্যে একটি চার বছরব্যাপী কোর্স আছে যাতে বাছাইকৃত ছাত্রদেরকে মাসিক পাঁচ হাজার রূপী করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মূল বিশেষত্বসমূহ নিম্নরূপ-

ক. পরামর্শ পরিষদ : এই জামেয়ার প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ কাজ, অর্থ ব্যবস্থা, সবকিছু আলাদা আলাদা পরামর্শ পরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর এসব পরিষদ তত্ত্বাবধান করার জন্য রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ।

খ. **বিভাগসমূহ (শিক্ষা বিষয়ক) :** জামেয়ার শিক্ষা বিষয়ক বিভাগসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। এক. মৌলিক শিক্ষাক্রম, যা সারা বছর অব্যাহত থাকে। যাতে হেফজ, নাজেরা, তাজবীদ, কেরআত, দরসে নেজামী, তাখাচ্ছুছ ফিল ফিকহ্. আরবী সাহিত্য বিভাগ, কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ শিক্ষাক্রম যাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সবগুলোর গুরুত্ব ও সময়সীমা এক রকম নয়। এসবের মধ্যে আরবী কথোপকথন, ইংরেজী কথোপকথন, সাংবাদিকতা, ইসলামী ব্যাংকিং, ভূগোল ও জ্যোতিষশাস্ত্র, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থায় দরসে নেজামীর মধ্যে কিছু যুগোপযোগী সংস্কার আনা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্তরে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে ভূগোল এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ. **কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহ (শরীয়াহ কলেজ) :** এটাকে দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা চলে। এই বিভাগে উচ্চ শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে চার বছরব্যাপী এক দীনী কোর্সের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান দান করা হয়। জামেয়ার পক্ষ থেকে এ বিভাগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হলে ২৫টি আসনের জন্য ২৪০ জন গ্রাজুয়েট ও বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষিত চাকুরীজীবী দরখাস্ত পেশ করে। এতে করে সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে দীনী শিক্ষা অর্জনের এক ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। যারা এই কোর্স সমাপন করবে তাদেরকে পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়-

- ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বীমা
- সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম
- তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি
- সাধারণ ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ

ঘ. **ইফতা ও তাখাচ্ছুছ :** যদিও ইফতা বিভাগ জামিয়াতুর রশীদের বর্তমানে একটি বিভাগের মর্যাদা লাভ করেছে, প্রকৃতপক্ষে এটিই জামিয়াতুর রশীদের মূল বুনিয়াদ। কেননা, বর্তমানের জামিয়াতুর রশীদ 'দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ' নামেই প্রস্ফুটিত এক ঝর্ণাধারা। যারা এই বিভাগে পড়াশুনা করে তাদের ইংরেজীর পাশাপাশি কম্পিউটারও শিখানো হয়।

ঙ. ইসলাহ, তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধি : এই জামেয়ায় পড়াশুনা ও বিভিন্ন কর্মতৎপরতার পাশাপাশি ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি এবং সৎকর্মপরায়ণ করে ছাত্রদের গড়ে তোলার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষতঃ জামাআতের সাথে নামায আদায়, নামাযের কাতার সোজাকরণ, প্রথম কাতার ও সুন্নাতের পাবন্দী, জিকির-আযকার. মাসনূন কেরাত ও দুআ, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। স্তরভিত্তিক সাপ্তাহিক ও ইসলাহী মজলিসেরও আয়োজন করা হয়।

চ. নিয়ম-শৃঙ্খলা : দীনী আদব-আখলাক, সুন্নাতে নববী সা. এর অনুশীলন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ছাত্ররা যাতে একটি শৃঙ্খলিত জীবনের অনুসারী হতে পারে সে জন্যে ২৪ ঘণ্টার একটি রুটিন রয়েছে। প্রতিটি ছাত্রের কাছে যার একটি করে কপি সরবরাহ করা হয় এবং প্রত্যেকে তার পাবন্দী করার চেষ্টা করে। এভাবে পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রদের একটি সুশৃঙ্খল জীবন উপহার দেয়ার জন্যে ২৪ ঘণ্টা তত্ত্বাবধান করা হয়।

ছ. প্রচার ও প্রকাশনা : প্রচার-প্রকাশনা, সংবাদপত্র ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরাম অনেক পেছনে অবস্থান করছে। এ শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে জামেয়াতুর রশীদ সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে রোজনামায়ে ইসলাম, সাপ্তাহিক যরবে মোমেন, বাচ্চাদের ইসলাম, মহিলাদের ইসলাম, ইংরেজী যরবে মোমেন, দ্যা ট্রুথ প্রভৃতি পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকে, যা জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া জামেয়ার প্রকাশনা বিভাগের শাখা কিতাব ঘর ও দারুত তাসনীফ থেকে মুফতী সাহেব র. এর বিভিন্ন মাওয়ায়েজ, রাসায়েলসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী ও ধর্মীয় বইপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

জ. স্বাস্থ্যসেবা : ছাত্রদের পড়াশুনার পাশাপাশি যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকে, যা পড়াশুনার জন্য নেহায়েত জরুরীও বটে, সেজন্যে চিকিৎসা সেবা, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ, চিকিৎসা ব্যয়, বিনোদন ও খেলাধুলা, সুইমিং পুল, দৈনিক এসেম্বলী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিরও সুব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও জামেয়াতুর রশীদ আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

দশম অধ্যায়

দারুল উলূম করাচী

✍ জামেয়াতুর রশীদ থেকে বের হয়ে আমরা দারুল উলূম করাচী চলে যাই। আমরা গিয়ে দেখি জোহরের নামায শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রথমেই নামায পড়ে নেই। দারুল উলূমের বর্তমান নতুন মসজিদটিকে এশিয়ার বড় মসজিদ বলা যায়। নতুন মসজিদটি পুরোনো মসজিদের সাথে মিশে গিয়েছে। নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। পুরোনো মসজিদের পশ্চিম পাশে যে কবরস্থান ছিল তা এখন মসজিদের পাশে এসে পড়েছে। তাই কবরস্থান যিয়ারত করার অনেক সুযোগ হয়েছে। এখানে শুয়ে আছেন হাকীমুল উম্মতের খলীফা, মুফতীয়ে আজম, দারুল উলূম করাচীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী র.। হাকীমুল উম্মতের অপর বিশিষ্ট খলীফা আরেফ বিল্লাহ ডা. আব্দুল হাই সাহেব র. হযরত মুফতী সাহেবের জামাতা এবং মাদরাসার প্রথম নাযেম হযরত নূর আহমদ সাহেব, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সোবহান মাহমুদ সাহেব সহ প্রায় শতাধিক আলেম ওলামা এবং পীর মাশায়েখ কবর যিয়ারত করেই আমরা চলে যাই দারুল উলূমের ইফতা বিভাগের নায়েবে নাযেম হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের বাসায়। মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব বাংলাদেশের সিলেটের অধিবাসী। দারুল উলূম করাচীর পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি জেনারেল লাইনের পড়াশুনাও শেষ করেন। তারপর দারুল উলূমের ইফতা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রায় ১৫/২০ বছর যাবত তিনি এখানে দরস দিচ্ছেন। মাওলানা আবদুল গফুর ভাইসহ দুপুরে আমাদের সকলের দাওয়াত ছিল মুফতী সাহেবের বাসায়। পরদিন মুফতী আব্দুল মান্নান সাহবের হজ্জ ফ্লাইট ছিল। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের জন্য ভাত মাছসহ সুস্বাদু খানার ব্যবস্থা করেন। খানা খেয়ে নতুন দারুল ইফতায় চলে যাই। বিশাল দারুল ইফতা। প্রায় দশ-বারোজন মুফতী ফতোয়া লিখছেন। ফতোয়া বিভাগের পাশেই নতুন দারুল হাদীস। দারুল হাদীস দেখতে ঠিক পার্লামেন্ট হাউসের মতই। সবক চলছিল মাইকের মাধ্যমে। কয়েকশত ছাত্র দাওরায়ে হাদীস পড়ছে।

আফসোস এ দরসের প্রাণপুরুষ শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলো না। ইতোপূর্বে বহুবার করাচী এবং ইউরোপে হযরত তাকী

উসমানী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলেও এবার মাহরূম হলাম। খবর নিয়ে জানা গেল জোহরের পূর্বে তিনি ছিলেন। নামাযের পর বাসায় চলে গিয়েছেন। ইতোপূর্বে দারুল উলূমে এসে হযরত তাকী সাহেবের তিরমিযী শরীফের দরসে বসার এবং গুলশানে ইকবাল এলাকার দক্ষিণ দিকের বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রতি রবিবার/শুক্রবার বাদ আসর বয়ান শোনার এবং লাশবেলা চকের মসজিদে তাঁর পিছনে জুমার নামায পড়ার সুযোগ হয়েছিল। এখন তিনি বুখারী শরীফের দরস দেন। তাঁর দরসে তিরমিযী হাদীসের ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয়। এবারে খেয়াল করলাম, জুমার দিন বায়তুল মোকাররম মসজিদে হযরতের পিছনে ইনশাআল্লাহ জুমা পড়ব। যাহোক মুফতী আবদুল মান্নান সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দারুল উলূমের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ অফিসে চলে গেলাম।

মাসিক আল বালাগে হাজিরা

২০০৬ সালের এক বছরের পত্রিকা সংগ্রহ করলাম। মাদরাসার শুরু থেকে হযরত তাকী উসমানীর সম্পাদনায় এ মাসিক পত্রিকা বের হয়ে আসছে। করাচী গেলেই এ পত্রিকা সংগ্রহ করি। পত্রিকা নিয়ে তাড়াতাড়ি মাদরাসার পাবলিকেশন্স 'ইদারাতুল মা'আরিফে' চলে যাই। খুব তাড়াতাড়ি করে কয়েকশ টাকার কিতাবদি খরিদ করি। আসরের নামাযের সময় হয়ে আসছিল। দারুল উলূমের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। বর্তমান দারুল উলূমের এ নয়নাভিরাম দৃশ্য আরেকবার দেখে নিলাম। চারিদিকে নারিকেল গাছের সারি। নতুন নতুন বিল্ডিং, মাঝে মাঝে সবুজ উদ্যানে দারুল উলূমের এক মনোরম দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলো। প্রাণভরে শ্বাস নিলাম।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবকে এ চর্মচোখে দেখার ভাগ্য হয়নি, তাঁর হাতের লাগানো দারুল উলূমের এ বাগানে আসার তাওফীক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। ট্যাক্সী আমাদের সাথেই ছিল। নোমান ভাই, আব্দুল গফুর ভাই এবং আমি ট্যাক্সীতে উঠে বসতেই ড্রাইভার নাযেমাবাদের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। গুলশানে ইকবাল এসে আব্দুল গফুর ভাইকে নিয়ে জিয়াউল হক কলোনীর দিকে চলে গেলে নোমান ভাই এবং আমি রাস্তার পাশে একটি মসজিদে আসর পড়ে মাগরিবের পূর্বেই পাপোশনগরের বাসায় পৌঁছে যাই।

হযরত মুফতী সাহেব র. দেওবন্দে ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি করাচী হিযরত করেন এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে দারুল উলূম করাচী দেওবন্দের মত একটি দীনী ইদারা কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালান। করাচী ছিল তখন ধূসর মরুভূমি। সরকারীভাবে নিউ টাউনে তিনি একটি বড় জায়গা পেলেও জায়গাটির দখল নিতে পারেনি। ফলে আজ সে স্থানে ইসলামিয়া

কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। হযরত মুফতী সাহেব খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে শহরের নানক ওড়ায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে দুআ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! আমার মাদরাসার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ পাকের ফয়সালা হল। শুনেছি সাউথ আফ্রিকার এক ব্যক্তি মাদরাসা করার জন্য বর্তমানের এই বিরাট জায়গা হযরতকে দিয়ে দেন। তখন এ স্থানটি ছিল মরুভূমি। হযরত নানক ওয়াড়া থেকে মাঝে মাঝে এদিকে আসতেন আর কিছু কিছু এলাকা আবাদ করতেন। কয়েক বছর পর হযরত মুফতী সাহেব একেবারে এসে পড়েন। চারিদিকে নূতন নূতন রাস্তা ঘাট হতে থাকে। মাদরাসার কাজও পুরোদমে এগিয়ে যায়। মুফতী সাহেবের জামাতা মাওলানা নূর আহমাদ ছিলেন একজন কর্মঅনুরাগী মানুষ। তারই রাত দিন প্রচেষ্টার এবং হযরতের এখলাস এবং দুআয় আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে এ দীনী বাগিচাটিও পাকিস্তানে ১টি বড় মাদরাসায় পরিণত হয়।

দারুল উলূম করাচীর প্রধান আকর্ষণ সেখানকার ইফতা কোর্স। এই কোর্সের দায়িত্ব আছেন বর্তমানে বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা তাকী উসমানী মা. জি.। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব দারুল উলূমে অবস্থান করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার সেক্রেটারীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে সালাম মুসাফা করে নিজের পরিচয় দিয়ে আমেরিকা সফরে যাওয়ার কথা বলি। বেশ কিছু সময় তার সোহবতে থেকে আলাপ আলোচনা করি। তিনি রোযার পর ১টি কনফারেন্সে ঢাকায় যাচ্ছেন শুনে খুশী হই।

মাওলানা তাকী উসমানী বর্তমানে বিশ্বের একজন নামকরা আলেম এবং চিন্তাবিদ। তিনি হযরত মুফতী সাহেবের দ্বিতীয় সাহেবজাদা এবং দারুল উলূমের ভাইস প্রিন্সিপাল। বড় সাহেবজাদা দারুল উলূমের প্রিন্সিপাল।

নিউ টাউন থেকে সোজা পূর্ব দিকে গুলশান ইকবালের দিকে যেতে রাস্তায় ডান পাশে বিরাট এলাকা নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদ। আমাদের ঢাকার বায়তুল মোকাররম এর মত না হলেও মসজিদটি বড় এবং সুন্দর বাগান নিয়ে সজ্জিত। ছোট একটি মাদরাসা ও বড় বড় সেমিনার সেম্পোজিয়াম করার ব্যবস্থা আছে এ মসজিদের পাশে।

হযরত তাকী সাহেবের দারুল উলূমের আওতায় তারই নেগরানিতে এ মসজিদ পরিচালিত হয়। তিনি করাচী থাকলে এখানে জুমার নামায পড়ান আর বাদ আসর ইসলাহী বয়ান করেন। ইতোপূর্বে করাচী আসা হলে সব সময় হযরতের পিছনে জুমা পড়া এবং রবিবার দিন বায়তুল মোকাররমে আসর বাদ বয়ান শোনার ইহতিমাম করতাম। এবারও সেই আশায় পূর্ব দিন

দারুল উলূমে সাক্ষাত না হওয়ার আজ আযানের পূর্বেই মসজিদে হাযির হয়েছি আযানের পর হতেই আজ কে নামায পড়াবেন তার খবর নিতে থাকি কিন্তু কোন সুরাহা করতে না পেরে অপেক্ষা করতে থাকি। সকলের নজর উত্তর দিকের গেটের দিকে। হঠাৎ দেখা গেল দারুল উলূম করাচীর একজন মাওলানা সাহেব এগিয়ে আসছেন। তিনি চেয়ারে বসলেন এবং বয়ান ও নামায শেষ করলেন। আফসোস রয়ে গেল হযরতের পিছনে নামায পড়া সম্ভব হলো না। বিকেলে আসর বাদ হযরতের বয়ান হবে কিনা তাও জানা সম্ভব হল না ফলে নামায পড়ে চলে গেলাম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবের বাসায়। সেখানে জুমার পরে দুপুরের খানার দাওয়াত ছিল। খানাপিনা খেয়ে পাশের এক মসজিদে আসরের নামায পড়ে চলে যাই গুলশান ইকবালের খানকাহে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ায়।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র.

(মুফতীয়ে আজম, পাকিস্তান)

জন্ম ও শৈশব

মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফী র. সাহারানপুর জেলার অন্ত র্গত বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ এলাকা দেওবন্দে ২০ শে শাবান ১৩১৪ হি. জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ মুবীন। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব র. সন্তান জন্মের সংবাদ জানিয়ে আপন শায়খ রশীদ আহমদ গঙ্গুহী র.–এর নিকট চিঠি লিখলে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ শফী'।

মুফতী সাহেব র.–এর পিতা মাওলানা ইয়াসীন র. বুযুর্গানে দীনের প্রতি সুধারণা ও অত্যধিক মহব্বত রাখতেন। ফলে বুযুর্গানে দীনের প্রতি ভালবাসা ও সুধারণা পোষণ করার এই মহান গুণটি হযরত মুফতী সাহেব উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। ছোটবেলায় খেলাধুলায় মত্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর খুব কমই ঘটেছে। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখনই একটু সুযোগ মিলত তখনই স্বীয় পিতার সাথে বুযুর্গানে দীনের বরকতময় মজলিসে বসে যেতেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

মাওলানা মুহাম্মাদ শফী র. পাঁচ বছর বয়সে দারুল উলূম দেওবন্দে হাফেজ মুহাম্মাদ আজীম সাহেবের নিকট পবিত্র কুরআন শরীফের নাযেরা পড়তে শুরু করেন। তাঁর পিতা মুজাফফরনগর জেলায় কাজী ছিলেন। তাই ছোটবেলায় তিনি মুজাফফরনগরে বেশি বেশি যাতায়াত করতেন। একবার কোন এক

কারণে তাঁকে বেশি সময় নিয়ে সেখানে গমন করতে হয়। তখন তাঁর পিতা পড়ালেখার ধারাবাহিকতা চালু রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে মুজাফফরনগরের কোন এক মক্তবে ভর্তি করে দেন। কিন্তু সেখানকার গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি দারুল উলূম দেওবন্দেই নাযেরা শেষ করেন।
হযরত মাওলানা শফী র.–এর পিতার ইচ্ছা ছিল সন্তানকে হাফেজে কুরআন বানাবেন। ফলে তিনি কয়েক পারা মুখস্থও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ছোটকাল থেকেই তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন বিধায় হিফজের মেহনত তাঁর বরদাশত হয়নি। কিন্তু যে কয় পারা মুখস্থ করেছিলেন, আজীবন তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছেন। এ পারাগুলো তিনি অধিকাংশ সময় নফল ও তাহাজ্জুদ নামাযে পাঠ করতেন। পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করার পর দারুল উলূম দেওবন্দে পিতার নিকটেই তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে উর্দূ ফারসীর যাবতীয় কিতাবের তালীম লাভ করেন। তাছাড়া তিনি অংক, জ্যামিতি প্রভৃতি স্বীয় চাচা জনাব মুন্সী মনজুর আহমদ সাহেবের নিকট এবং তাজবীদ কারী মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। নাহু, ছরফ, ফিকাহর প্রাথমিক কিতাবসমূহ, ফুসূলে আকবরী, হেদায়াতুন্নাহু, মুনইয়াতুল মুছল্লি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং আরবীর প্রাথমিক কিতাবসমূহ পাঁচ বছরে সমাপ্ত করেন।

হযরত থানভীর দরবারে

হযরত মুফতী সাহেব র.–এর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন র. ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. একই সাথে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু হযরত গঙ্গুহী র.–এর ইন্তিকালের পরে মাওলানা ইয়াসীন র. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.কেই আপন শায়েখের স্থলাভিষিক্ত মনে করতেন। তাই তিনি প্রতি বছর শাবান মাসের শেষের দিকে থানাভবন তাশরীফ নিতেন এবং হযরত থানভী র.–এর যিয়ারত লাভ করতেন। ১৩২৩ হিজরীর শাবান মাসে তিনি একাই থানা ভবন গমন করেননি বরং স্নেহের পুত্র শফীকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, এটাই থানভী র.এর– প্রথম সাক্ষাত। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।

শায়খুল হিন্দ র.–এর সাথে ইছলাহী সম্পর্ক

হযরত গঙ্গুহী র.এর– ইন্তিকালের পর নিম্নের তিন বুযুর্গই ছিলেন লোকদের ভক্তি ও মহব্বতের কেন্দ্রবিন্দু। (১) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান র. (২) শায়খুল ওলামা মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব রায়পুরী র. (৩) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী র.। মুফতী সাহেব র. উল্লিখিত তিন বুযুর্গের সাথেই সমানভাবে মহব্বত রাখতেন।
হযরত মুফতী সাহেব র. বাল্যকাল থেকেই শ্রদ্ধেয় পিতার সাথে অত্যন্ত মহব্বত ও আগ্রহভরে তাঁদের দরবারে উপস্থিত হতেন। হযরত শায়খুল হিন্দ

র. দারুল উলূম দেওবন্দের ছদরে মুদাররিস ছিলেন। তিনি যেদিন বুখারী শরীফ প্রথম ছবক দিতেন সেদিন সকল ক্লাশের ছাত্ররা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্য তাঁর দরসে উপস্থিত হত। অনুরূপভাবে খতমে বুখারীর সময়ও সকল ছাত্রদের সমাগম ঘটত। হযরত মুফতী সাহেব র. যখন ফারসী খানায় পড়তেন, তখন থেকেই তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি বছর বুখারী শরীফের ছবক শুরু ও শেষের দিন মাওলানা মাহমুদ হাসান র.–এর দরসে উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া শায়খুল হিন্দ র.–এর দরবারে পিতার সাথে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। প্রতিদিন এভাবে আসা যাওয়ার ফলে তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা, এত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল যে, পরবর্তীতে একা একাই তিনি শায়খের নিকট শুধু ছবকের পরেই নয়, বরং ছবকের ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু ফুরসত মিলত তখনই হাজির হতেন। এভাবে শায়খুল হিন্দ র.–এর সুদৃষ্টি হযরত মুফতী র.–এর ওপর পড়েছিল।

কর্মজীবনে পর্দাপণ

হযরত মুফতী সাহেব র. ২২ বছর বয়সে ১৩৩৫ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীস অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। সে সময় বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি কিতাব পড়া তাঁর বাকী রয়ে গিয়েছিল। তাই ১৩৩৬ হিজরীতে তিনি এ সকল কিতাব পড়ে নেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ও আসাতেযায়ে কেরামের নেক নজর পূর্ব থেকেই তাঁর ওপর পড়েছিল। তাই দারুল উলূমের উস্তাদ হিসেবে তাঁকে রেখে দেওয়া ছিল তাঁদের মনের ঐকান্তিক কামনা। ফলে ঐ বছরই তাঁরা পরামর্শ মোতাবেক মাওলানা মুহাম্মাদ শফী র.কে কিছু ছবক পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এবং এ বছরই তিনি আনসারী খান্দানের কারী সাহেবের নেক বখত কন্যাকে নিজের সহধর্মিনী হিসেবে গ্রহণ করেন।

শায়খুল হিন্দ র.–এর হাতে বায়আত

দীর্ঘ পাঁচ বছর মাল্টার জেলে বন্দী থাকার পর ১৩৩৮ হিজরীতে মাওলানা মাহমুদ হাসান র. মুক্তি লাভ করে দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। তখন তাঁকে দেখার জন্য চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোকজন আসতে লাগল। হযরত তখন স্বীয় দুর্বল ও অসুস্থ শরীর নিয়েই তাদের সাথে সাক্ষাত দিতে ছিলেন। এদিকে মুফতী শফী র. তাঁর হাতে বায়আত হওয়ার জন্য সুযোগ মিলে গেল। সেদিন শায়খুল হিন্দ র.–এর হাতে মুফতী শফী র. হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যেব সাহেব এবং আরো কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্ব বায়আত গ্রহণ করেন।

হযরত থানভী র.–এর খেলাফত লাভ

হযরত শায়খুল হিন্দ র. মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের ছয় মাস পর ১৮ ই রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এর ২/৩ বছর পর

মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী র. এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। তাই হযরত মুফতী সাহেব র. পুনরায় হযরত থানভী র.–এর নিকট গমন করলে তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত আমল বাতলে দেন–
(১) জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার তাকওয়া অর্জন করা।
(২) লা-ইয়ানী অর্থাৎ এমন কাজ কর্ম থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা যা দীন দুনিয়ার কোন কাজেই আসে না।
(৩) নিজের হিম্মত ও ফুরসত মোতাবেক দৈনিক কিছু তেলাওয়াত করা। পরিশেষে তিনি বলেন, এ তো হল আপনার কাজ। বাকী যদি মনে চায়, তাহলে সকাল-সন্ধ্যায় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০০ বার করে এবং এস্তেগফার ও দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবেন। প্রত্যেক নামাযের পরে তাসবীহে ফাতেমীর আমল করবেন। মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. এই আমলগুলো গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে থাকেন। পরিশেষে ১৩৪৯ হিজরীতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী র. তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

হাকীমুল উম্মতের দৃষ্টিতে মুফতী সাহেবের ফতওয়া

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. হযরত মুফতী সাহেব র.–এর ফতোয়ার ওপর কতটুকু আস্থা রাখতেন, তা নিম্নের চিঠি ও তার জবাবের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।
একদা হযরত থানভী র.–এর প্রার্থিতা একটি ফতোয়ার জবাব হযরত শফী র. প্রেরণ করেন এবং চিঠি লিখেন যে, আপনি আমার নিকট যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন, তা পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মাঝে জরুরী সফর উপস্থিত হওয়ায় পুরো করতে পারিনি। আজকে যা কিছু আসল তা পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি এর শুদ্ধতা কিংবা ভুল সম্পর্কে অবহিত করবেন। যদি কোন অংশ প্রয়োজনীয় কথা বাদ গিয়ে থাকে, তাহলে সে সম্পর্কেও জানিয়ে বাধিত করবেন।
হযরত থানভী র. জবাবে লিখেন, আপনার চিঠি পেয়ে দুইটি কারণে আনন্দিত হয়েছি– (১) সন্দেহের নিরসন (২) আমি দেখছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা দীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিবেন।

ইন্তেকাল

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. ১০ শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

দারুল উলূম করাচী

দারুল উলুম করাচী দীনী দরসগাহের (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের) পবিত্র শিকলের একটি কড়া, যা আল্লাহর নেক বান্দারা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার কালো রাতে এই উপমহাদেশে দীনের বাতি প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথীরা ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বিরোধী জিহাদে সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়ার পর তাঁরা অনুভব করতে পারলেন, এখন যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ইংরেজদের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হল মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত করার পর মানসিকভাবেও নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেওয়া, যে কারণে তাঁরা এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যাচ্ছে যা মুসলমানদের অন্তরে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার ছাপ অংকিত করবে। এই শংকা থেকে তাঁরা তলোয়ার ফেলে দিয়ে মাদরাসার প্রতিরক্ষা ব্যূহ আঁকড়ে ধরেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান হেফাজতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেন।

তখন ইসলামী জ্ঞান বুকে ধারণকারীদের উপার্জনের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাঁরা কোন রকমে হালকা-পাতলা আহার করে, মোটা-ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরা জানবাজ ও নির্ভীক ওলামায়ে কেরামের এমন এক বড় দল তৈরি করেন যারা পার্থিব জৌলুস ও চাকচিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে কাঁচা বাড়ি ও সংকীর্ণ কক্ষে বসে দীনী ইলমের প্রদীপকে সময়ের ঝঞ্ঝাবায়ু থেকে রক্ষা করতে থাকেন, যাতে এই রাজনৈতিক পরাজয়ের সময়কালে মুসলমানরা নিজেদের সামাজিক জীবন, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী এবং পারস্পরিক আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের রীতি-নীতিকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে শুরু না করে। আর পুনরায় যখন মুসলমানরা রাজনৈতিক আধিপত্য ফিরে পাবে তখন তারা যেন দু'জাহানের বাদশাহ, মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মাদ সা. এর– আনীত দীনকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে যায়। এভাবে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব মুহাদ্দেসে দেহলভী র. কর্তৃক লাগানো পুষ্পিত উদ্যান, যার উপর হেমন্তকাল তাঁবু গেড়ে বসে সৌন্দর্য বিলুপ্ত করে দিয়েছিল, তা পুনরায় সবুজ ও সুশোভিত হয়ে ওঠে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে জ্ঞান-গরিমা, জ্ঞানসাগর, সুন্নাতের অনুসরণ এবং দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার যে সকল চন্দ্র, সূর্য উদিত হয়েছে তাদের পূতঃপবিত্র কর্মকাণ্ড দেখে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের সোনালী যুগের স্মৃতি অন্তরে দোলা দিয়ে যায়। তাদের তালীম ও তাবলীগের বারিধারায় এ উপমহাদেশের প্রতিটি অঞ্চল সিক্ত হয়। তাঁদের জ্ঞান-গবেষণা ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শরীয়ত ও তরীকতের সে সকল জটিল সমস্যাসমূহ নিরসন হয়, যা মুসলমানদের পতনের যুগে দীর্ঘদিন ধরে রহস্যাবৃত হয়ে থাকে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. এর– নেতৃত্বে সেসব ওলামায়ে কেরাম ভারতবর্ষকে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে যে একনিষ্ঠ চেষ্টা-সাধনা ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. -এর ইশারায় শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী সাহেব র., শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওসমানী সাহেব র. ও পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব র. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐতিহাসিক ও চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালান তাও সেই দারুল উলূম দেওবন্দেরই অবদান।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যখন মুসলমানরা রাষ্ট্রক্ষমতা পেল, তখন উচিত ছিল সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমত ও রাষ্ট্রের উপযোগী এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেখানে কুরআন ও হাদীসের পরিপূর্ণ শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধর্মহীনতার জীবাণু থেকে পবিত্র করে তার পরিপূর্ণ ও আদর্শ পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণ থাকবে। ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যবর্তী দূরত্বকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে। না এখানে দারুল উলূম দেওবন্দের সে ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত ছিল, যা ইংরেজদের ধর্মহীন যুগে ভারতবর্ষে বাধ্য হয়ে প্রবর্তন করা হয়েছিল; না এখানে আলীগড়ের ধর্মহীন শিক্ষার কোন অবকাশ ছিল; আর না নদওয়ার সেই শিক্ষা যথেষ্ট ছিল যাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে কেবল ইতিহাস ও সাহিত্যকে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্র বানানো হয়েছিল। আবশ্যক ছিল ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ধরনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পুরো দেশে প্রচলন করা। কিন্তু পাকিস্তানের সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত তার উপর দিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলের হঠকারিতার যে ঝড় বয়ে চলেছে তা সবার সামনে রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে এখানকার শাসন-ব্যবস্থা ও আইনে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানদের অন্তরের আওয়াজ ধ্বনিত হয়নি।

ফলে এখনো পর্যন্ত ইংরেজদের প্রণীত ব্যবস্থা অনুযায়ীই এখানকার স্কুল, কলেজের শিক্ষা চালু রয়েছে। আর তাও নেহায়েত দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। আর হয়ত সেখানে ধর্মীয় তালীম-তরবিয়তের কোন বালাই নেই। আর থাকলেও তা কেবল নামসর্বস্ব।

এছাড়া এটি এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, ইলম বিশেষতঃ ইলমে দীনের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতের অনুসরণ ও পূর্বসূরীদের আযমতের প্রাণশক্তি না থাকবে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের কাঁটছাঁট থেকে শুরু করে চিন্তা-চেতনা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের তারবিয়াতের এহতেমাম করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইলম, চাই তা জ্ঞান-গবেষণার যত উঁচু মার্গেরই হোক না কেন ইসলামে তার কোন মর্যাদা নেই।

এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা মনন-মস্তিষ্ককে এমনভাবে বিষাক্ত করে ফেলেছে যে, যদি ধরে নেয়া হয়, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উলূমে ইসলামিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েও যায়, তবুও ইত্তেবায়ে সুন্নাত, আযমতে আসলাফ ও নিষ্কলুষ দীনী তরবিয়াতের সে পরিমাণ ব্যবস্থা, যা ইসলামী মাদরাসাসমূহে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে এবং যা সেসব মাদরাসার প্রকৃত প্রাণশক্তি, তা সেসব আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণাঙ্গরূপে স্থানান্তরিত করার জন্যে সুদীর্ঘ ও সুশৃংখলিত চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন। যার বাস্তবায়ন ও সফলতা অদূর ভবিষ্যতে নজরে আসছে না। আর যতদিন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নিষ্কলুষ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার রঙ না লাগবে ততদিন একটি কল্পিত ধারণার উপর ভরসা করে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। আর যেখানে এমনটি করা হয়ছে সেখানে সাধারণ জনসাধারণের শোচনীয় ধর্মীয় অবস্থা চোখের সামনে রয়েছে।

এজন্যই দীন হেফাজতের মানসিকতা লালনকারী ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণ পাকিস্তানে পুরনো ধাঁচের ইসলামী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও তা চালু রাখা আবশ্যক মনে করেছে।

করাচীতে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান হিজরতের পর ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. দু'টি কাজকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন। এক. পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের চেষ্টা-সাধনা, দুই. করাচীতে এখানকার উপযোগী দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা।

প্রথম দুই বছর লক্ষ্য স্থির ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা, যা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় চলছিল, এতটুকু ব্যস্ত ছিলেন যে, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠায় সফল হতে পারেননি।

করাচী, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তার রাজধানী হওয়ার পাশাপাশি লাখ লাখ মুসলমান অধিবাসীদের শহর ছিল, তাতে এমন কোন কেন্দ্র ছিল না যা এখানকার ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। এজন্যে এখানে এ ধরনের তেমন একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। তাই পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরান্বিত করুন, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কেবল আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে মাত্র একজন শিক্ষক ও কিছু ছাত্র নিয়ে নানকওয়াড়া নামক মহল্লায় একটি পুরনো স্কুল ভবনে একটি ইসলামী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যার নামকরণ করা হয় দারুল উলূম করাচী। এই দারুল উলূম শাওয়াল ১৩৭০ হিজরী মোতাবেক জুন ১৯৫১ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের সকল প্রদেশ ও জেলা থেকে ছাত্ররা সেখানে জমা হয়। অধিকন্তু ভারত, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম দেশ থেকেও সেখানে ছাত্ররা আসতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! যার ফলে দারুল উলূম নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে দীনের এক মজবুত কিল্লার মর্যাদা লাভ করে। যা দেখতে দেখতে তালেবানে এলমে নবুওয়াত ও ধর্মপ্রাণ লোকদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আর দেখতে এক বড়সড় ভবন ও ছাত্রদের আধিক্যের কারণে সংকীর্ণ অনুভব হতে থাকে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া এবং হযরত মুফতী সাহেব র. এর– ক্রমাগত দুআ ও তাঁর সদিচ্ছার বদৌলতে কৌরঙ্গীতে একটি দু'তলা বিশিষ্ট ভবন, পানির কুয়া, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতিসহ ৫৬ একর বিশিষ্ট বিশাল ভূসম্পত্তি-দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী হাজী ইবরাহীম দাদা ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে দারুল উলূমের জন্য ওয়াকফ করে দেন। এই জমিতে ভবন নির্মাণ করার জন্যে মরহুম হাজী আব্দুল লতীফ বাওয়ানী এক লক্ষ রুপী নিজ ও নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে, আঠার হাজার রুপী নিজের বন্ধুমহল থেকে সরবরাহ করেন। অতঃপর ১৫ শা'বান ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯৫৭ ঈসায়ী সালে দারুল উলূম কৌরঙ্গীর বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং নানকওয়াড়ায় হেফজ, নাজেরা, তাজবীদ ও কেরআতের বিভাগসমূহ অবশিষ্ট থাকে।

দারুল উলূম করাচী পাকিস্তানে উলূমে দীনের তালীম-তারবিয়াতের এক বড় কেন্দ্র। এটি সেই দারুল উলূম যা হাজার হাজার আলেম-ওলামা, মুহাদ্দেস, মুফাস্‌সির, ফকীহ, সাহিত্যিক, কাযী, মুফতী, যাহেদ, মুত্তাকী, নির্ভীক মুজাহিদ ও মুবাল্লিগে ইসলামের জামাত সৃষ্টি করে প্রতিটি মুহূর্তে দীনের হেফাজত ও প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইলম ও হেকমতের এই কেন্দ্রটি এই বস্তুবাদী বিশ্বে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যার আলোকশিখা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

দারুল উলূম করাচীর ষোলসালা নেসাব

দারুল উলূম করাচীর নেসাবে তালীম নিম্নবর্ণিত ছয় স্তরে বিভক্ত

১. মারহালায়ে ইবতেদাইয়া	(প্রাথমিক)	- সময়সীমা -৫ বছর
২. মারহালায়ে মুতাওয়াসসিতা -	(নিম্ন মাধ্যমিক)	- সময়সীমা -৩ বছর
৩. মারহালায়ে সানবীয়া আম্মা -	(মাধ্যমিক)	- সময়সীমা -২ বছর
৪. মারহালায়ে সানবীয় খাচ্ছা -	(উচ্চ মাধ্যমিক)	- সময়সীমা -২ বছর
৫. মারহালায়ে আলীয়া	(স্নাতক/বি.এ)	- সময়সীমা -২ বছর
৬. মারহালায়ে আলমিয়া	(স্নাতকোত্তর/এম.এ)	- সময়সীমা -২ বছর
	মোট সময়সীমা	-১৬ বছর

এই নেসাবের তালীম তাদরীসের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়–

১. **লিখন চর্চা :** খোশখত, উর্দু, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত, ফার্সী ইনশা এবং আরবী ইনশার ক্লাসে লিখন চর্চা আবশ্যক। আসাতিযায়ে কেরাম খাতা দেখে সংশোধন করে স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন।

২. **অধ্যয়ন ও তাকরার :** ছাত্রদের জন্য প্রতিটি বিষয়ে দু'টি কাজ আবশ্যক। এক. আগামী দিনের পাঠের জন্য কিতাব অধ্যয়ন (মুতালাআ) যাতে ছাত্রদের মন পাঠ শোনা ও বুঝার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং সেই দৃষ্টিজ্ঞান ও সচেতনতার সাথে উস্তাদের সামনে সবক অনুধাবন করতে পারে। দুই. শ্রেণীকক্ষে প্রদত্ত উস্তাদের পাঠকে তাকরার করা।

৩. **পরীক্ষা :** প্রতিটি জামাতে বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম সাময়িক (ত্রৈমাসিক), দ্বিতীয় সাময়িক (ষান্মাসিক) এবং বাৎসরিক (বার্ষিক)। আর পরীক্ষায় ভাল নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়।

৪. **সনদসমূহ :** প্রত্যেক স্তর সমাপনকারী ছাত্রদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং পুরো নেসাবে তালীম সমাপনকারীদের যথানিয়মে সনদ বিতরণ করা হয়। পাকিস্তানে এই সনদকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামিয়াত ও আরবীতে এম.এ. এর– সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে।

৫. **নেসাব বহিভূর্ত তৎপরতা :** এসব কর্মতৎপরতার মধ্যে নেসাব বহির্ভূত বইপত্র পড়া, ছুটির সময় বয়ান-বক্তৃতা অনুশীলনের জন্যে সভা-সেমিনারের আয়োজন, ছাত্রাবাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার খেদমত আঞ্জাম দেওয়া, শরীর চর্চার জন্যে অবসর সময়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা (কেবল দারুল উলূমের মাঠে) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. **মারহালায়ে ইবতেদাইয়া :** এই স্তরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। বিষয়গুলো হল- নূরানী কায়েদা, নাজেরায়ে কুরআন মজীদ, তাজবীদ ও আমপারা হেফজ, উর্দূ, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, হস্ত শিল্প, ইসলাম শিক্ষা, শরীর চর্চা, সিন্ধু ভাষা ইত্যাদি।

২. **মারাহালায়ে মুতাওয়াসসিতা :** এই স্তরে সরকারী নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ, সমাজ বিজ্ঞান, উর্দূ. গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজী সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া তাজবীদুল কুরআন, হাদর, ইলমে তাজবীদ, ফারসী ভাষা, সুন্দর হস্তলিপি, আকায়েদ, ইবাদাত, আচার-আচরণ, আখলাক ও সীরাতের উপর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. **মারহালায়ে সানবিয়া আম্মা :** এই স্তরে নিয়মমাফিক দরসে নেজামী শুরু করা হয়। বিষয়গুলো হল- কেরআতের অনুশীলন, তাফসীরে কুরআন, হাদীস, নাহব, ছরফ, আরবী সাহিত্য, ফেকাহ ও মানতিক।

৪. **মারহালায়ে সানবিয়া খাচ্ছা :** এই স্তরের বিষয়বস্তুগুলো হল– তাফসীরুল কুরআন, হাদীসে রাসূল সা. ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ, নাহব, ছরফ, মানতিক, আরবী সাহিত্য।

৫. **মারহালায়ে আলীয়া :** এই স্তরের বিষয়গুলো হচ্ছে– তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, ইলমুল ফারায়েজ, উসূলে ফিকাহ, বালাগাত, আরবী সাহিত্য, মানতিক, ফালসাফা (দর্শন), ইনশায়ে আরবী, (আরবী সাহিত্য) ইলমুল যদল বা মুনাজিরা (তর্কশাস্ত্র), ইলমুল কালাম, ইলমে আরুয (ছন্দ বিদ্যা)।

৬. **মারহালায়ে আলমিয়া** : এই স্তরে দরসে নেজামীর নেসাব পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং সকল বিষয় ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে শেষ স্তরে পৌঁছে যায়। বিষয়গুলো হল– তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ইলমে হাদীস, উসূলে হাদীস, ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ, ইলমে কালাম, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি।

উপরোল্লেখিত নেসাবটি ষোলসালা নেসাবের সার নির্যাস, নাজেরা ও হিফজুল কুরআন বিভাগ, তাজবীদ ও কেরাত বিভাগ এবং তাখাচ্ছুছ স্তরের জন্যে আলাদা নেসাব রয়েছে।

অধিকন্তু, বর্তমানে দারুল উলূমে মাদরাসার সানবিয়া তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাতে সরকারী পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের পাশাপাশি দীনী তা'লীম-তারবিয়াতের অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া

২৯.১১.০৬ তারিখ সকালে ফজরের নামাযের পর নোমান ভাই এবং তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ আমরা চলে যাই সদরের একটি হোটেলে সকালের নাস্তা করার জন্য। সদর এলাকাটা আমাদের গুলিস্তানের মতই করাচীর প্রাণকেন্দ্র। সকল রোড এখানে এসে মিলিত হয়। এখানেই জাহাঙ্গীর পার্ক অবস্থিত। পাশেই বড় মসজিদ। আমরা হোটেলে এসে পায়ার অর্ডার দিলাম। রুটি পায়া দিয়ে নাস্তা করে চা পান করে আমরা আবার নাযেমাবাদের দিকে ফিরতে থাকি। দূর থেকে কায়েদে আযম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর মাযার দেখা যায়। মাজারকে ডানে রেখে আমরা গুরুমন্দর এলাকার কাছে চলে আসি। পাশেই বিন্নুরী টাউনের রাস্তার পাশে আমি নেমে যাই। মাওলানা নোমান সাহেব পাপোশনগর চলে যান।

বিন্নুরী টাউন নাম হয়েছে মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী সাহেবের দিকে নেসবত করে পূর্ব নাম ছিল নিউটাউন। মাওলানা বিন্নুরী আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর খাছ শাগরিদ। শাহ কাশ্মিরীর ইলমী আমানতের বোঝা হযরত বিন্নুরী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই পাঠান আলেম ভারতের ডাভেলসহ বিভিন্ন স্থানে দরস দেয়ার পর করাচীর নিউটাউনের বড় মসজিদে অনেক দুআ ও এস্তেখারার পর জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন, যা পরবর্তীতে মাওলানার এখলাস ও মেহনতের ফলে আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে পাকিস্তানের এক ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসায় পরিণত হয়। মজার বিষয় মাদরাসাটি শুরু হয় দাওরায়ে হাদীস ফারেগীনদের নিয়ে তাখাচ্ছুছ ক্লাশের মাধ্যমে। পরে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেরা এখানে পড়াশুনা করে। নিউটাউনের বিশাল জামে মসজিদের পূর্ব পাশে একেবারে মসজিদের সাথেই মাদরাসাটি অবস্থিত। খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে ফুলের বাগান। দারুল হাদীস পাঠাগার, দারুত তাসনীফ ইত্যাদি দেখার মত। সকাল ৮টার দিকে মাদরাসায় হাজির হই। প্রথমে হযরত বিন্নুরীর মাজার যিয়ারত করলাম। রণক্লান্ত এ মুজাহিদ মসজিদের উত্তর পূর্বকোণে চির নিদ্রায় শায়িত। বাংলার আলেমকুল শিরোমনী

মর্দে মুজাহিদ আলেম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর সমসাময়িক ছিলেন মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী। হকের নিশান বরদার সংগ্রামী আলেম ছিলেন তিনি। তৎকালীন পাকিস্তানের আইয়ূব বিরোধী এবং কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত বিন্নুরীকে দেখার ভাগ্য এ অধমের না হলেও তাঁর সাথে ছিল আমার আত্মার যোগাযোগ। গহরডাঙ্গা পড়াকালে বিন্নুরী টাউন মাদরাসায় মাসিক পত্রিকা বাইয়েনাতসহ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বড় বড় মাদরাসার মাসিক পত্রিকা খুব মজা করে পড়ার সুযোগ হত। এ পত্রিকার মাধ্যমেই মূলত হযরত মাওলানা ইউসূফ বিন্নুরী সাহেবের তাকওয়া, পরহেজগারী, ইলম এবং চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হই। মাসিক বাইয়েনাতের সম্পাদকীয় কলাম 'তাবছিরা'গুলো হত খুবই আকর্ষণীয়। হযরতের ইন্তেকালের পর তাবছিরাগুলো একত্রিত করে বিরাট বই বের হয়েছে। গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় পড়াকালে পত্রিকার মাধ্যমে হযরত বিন্নুরীর ইন্তেকালের খবর পেয়ে মর্মাহত হই। বাইয়েনাতে এলান হয় বাইয়েনাতের ইউসুফ বিন্নুরী সংখ্যা বের হবে। আমি আশায় দিন গুণতে থাকি। কারণ, বাংলাদেশে না হলেও হিন্দুস্তানী এবং পাকিস্তানী বুযুর্গরা ইন্তেকালের সাথে সাথে কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের ওপর বিশেষ সংখ্যা বের হয়ে যায়। অবশ্য এ বিশেষ সংখ্যা বাংলাদেশে কিভাবে পাওয়া যাবে তা নিয়ে ছিল উৎকণ্ঠা। কেননা পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে ঐ দেশের পত্র পত্রিকা আসা এবং যোগাযোগ প্রথম দিকে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক আশা ছিল এ বিশেষ সংখ্যা যেমন করেই হোক হাসিল করব। আমি ছিলাম এ ধরনের বিশেষ সংখ্যার আশেক। আর আশেক তো প্রচেষ্টা ছাড়ে না। ইতোমধ্যে আমি ১৯৭৯ সালে দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হই। কিছুদিন পর শুনতে পাই মদীনা শরীফ থেকে হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব সাহারানপুর আসছেন এবং তিনি হাদীসে মুসালসালাতের দরস দিবেন। সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি সাহারানপুর মাদরাসায় চলে যাই। হযরত শায়খের সাথে দেখা করি, দরসে বসি, সনদ নেই। এক ফাঁকে মাদরাসার আশেপাশের কুতুবখানাগুলোতে গাশত শুরু করি।

হঠাৎ দেখতে পাই ৭/৮ শত পৃষ্ঠার একখানি মোটা কিতাব পাতলা সাদা কাগজে মোড়ানো। কিতাবখানি খুলে দেখি এটি করাচী বাইয়েনাতের ইউসুফ বিন্নুরী নম্বর। শরীর চমকে উঠে। বুক ধড়পড় করতে থাকে। আল্লাহ পাক বিন্নুরী সাহেবের আশেককে বাইয়েনাতের বিন্নুরী নম্বর মিলিয়ে দিয়েছেন। এ কুদরতী নেজাম দেখে চোখে পানি এসে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর

আদায় করি। কিতাব খরিদ করে দেওবন্দ রওয়ানা হই। পথে বাসে বসে খুব মজা করে হযরত বিন্নুরীর ত্যাগী জীবনের পাতাগুলো উল্টাতে থাকি। বিশেষ করে নিউটাউন মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তিনি যে কুরবানী দিয়েছেন তাঁর চিন্তা করে আকল হয়রান হয়ে যাচ্ছিল। দেওবন্দে যাওয়ার পরও এ সুন্দর কিতাব খানি খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়ি। প্রায় সাড়ে আটশ পৃষ্ঠার কিতাব। সুন্দর কাগজ, ভালো বাইডিং, মাদরাসা মসজিদের সুন্দর সুন্দর ছবি সম্বলিত বইখানি পড়েছি আর কেঁদেছি। কিতাবখানি এখনো আমার বুক সেলফে সোভা পাচ্ছে। সে সময় থেকেই আল্লাহ পাকের কাছে এ মনীষীর মাদরাসায় হাযিরা দেয়া এবং তার মাজার যিয়ারতের বায়না ধরি। আল্লাহ পাক এ অধমকে ১৯৮৭ সালে সে সুযোগও করে দেন। ঐ বছরই প্রথম করাচী যাওয়ার সুযোগ হলে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা বিন্নুরী টাউনের মাদরাসায় হাযির হই। মনভরে মাদরাসা দেখি, বিরাট মসজিদে নামাজ পড়ি। মসজিদের পাশেই হযরতে বিন্নুরীর কবর যিয়ারত করি। ঐ সময় বিন্নুরী টাউন মাদরাসায় প্রায় ৩০/৪০ জন বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশুনা করত। যাহোক মাদরাসায় হাযির হয়ে হযরতের মাযার যিয়ারত করে বংলাদেশী কয়েকজন ছাত্রের সাথে দেখা করি। তারা সবাই বিন্নুরী টাউন মাদরাসায় ইফতা পড়েছে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু নসিহত করলাম। এরপর কিছু আরাম করে গোসল সেরে জুমার প্রস্তুতি নিতে থাকি।

১২টার দিকে এক বাংলাদেশী ছাত্র ভাইকে নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে হযরত মুফতী তাকী সাহেবের পিছনে জুমার নামায পড়ার আশায় রওয়ানা হই।

আল্লামা ইউসুফ বিননূরী র. -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলেম হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননুরী র. ১৩২৬ হিজরীর ৬ই রবিউস্‌সানি পেশোয়ারের এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়েদ মুহাম্মাদ জাকারিয়া র.। তিনি একজন আলেম এবং কামেল বুযুর্গ ছিলেন। জন্মের কিছুদিন পর তাঁর আম্মার ইন্তেকাল হয়, ফলে তিনি তাঁর ফুফুর নিকট লালিত-পালিত হন। হযরত বিননূরীর প্রপিতামহ সাইয়েদ আদম বিননূরী র. মোজাদ্দেদে আলফেসানীর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। বিননূর নামক স্থানে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করতেন বলে এ খান্দানের সকলের নামের শেষে বিননূরী শব্দ ব্যবহার করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

কুরআন পাক এবং উর্দূ, পশতু ও ফারসীর প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পিতা-মাতার হাতেই লাভ করেন। আরবীর প্রাথমিক তালীম মাওলানা আব্দুল্লাহ পেশোয়ারীর

নিকট লাভ করেন। এরপর তিনি পিতার কর্মস্থল কাবুলে চলে যান। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা আমার লেখাপড়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাননি। এমন কি একদিন তিনি আমাকে দরজির শাগরেদরূপে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের কুদরত অন্য কিছু ছিল, তাই ইলমে-দীন থেকে আমি মাহরূম হইনি।' কাবুল অবস্থানকালে মাওলানা বিননূরী, মাওলানা আব্দুল কাদের এবং অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট আরবীর মাধ্যমিক জ্ঞানার্জন করেন। ঐ সময় কাবুলের আমীরের জনৈক উজীর তাঁর ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে, তাঁকে মিশরে মুদ্রিত আরবী সাহিত্যের কয়েকটি কিতাব উপহার দেন। পরবর্তীকালে এ উপহার তাঁকে আরবী ভাষা এবং সাহিত্যে নূতন উদ্দীপনা লাভে বেশ প্রেরণা যুগিয়েছিল।

দেওবন্দের পথে

কাবুল থেকে ফিরে এসে তিনি ১৩৪৫ হিজরীতে এশিয়ার আল-আজহার দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য উপস্থিত হন। দারুল উলূমে আসার পর তিনি হযরত মাওলানা আনোয়ার কাশ্মিরীর নিকট আরবী ভাষায় একটি দরখাস্ত লিখে শাহ সাহেবের কাছ থেকে ইলমী ফায়দা হাসেল করার আবেদন জানিয়েছিলেন। দরখাস্ত পাঠ করে শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'আপনি আরবী সাহিত্য কোথায় পড়েছেন?' তিনি বলেছিলেন, 'কোথাও না।' পরে শাহ সাহেব বলেছিলেন, এরপর আর আরবী সাহিত্য পড়ার প্রয়োজন নেই। এ ঘটনা আল্লামা কাশ্মিরীর অন্তরে হযরত বিননূরীর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।
মাওলানা বিননূরীর মেশকাত শরীফ অধ্যয়নের পর দাওরায়ে হাদীসের বছর দুর্ভাগ্যক্রমে দারুল উলূম থেকে হযরত শাহ সাহেব, মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ডাভেল চলে যান। হযরত মাওলানা ইউসূফ বিননূরী ও শাহ সাহেবের সাথে ডাভেল যান এবং সেখানেই দাওয়ায়ে-হাদীস অধ্যয়ন করেন। শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আল্লামা কাশ্মিরীর খেদমতে

দেওবন্দে আসার পর হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ র.এর– সাথে হযরত বিননূরীর সম্পর্ক বাড়তে থাকে এবং শেষে তা অত্যন্ত গভীরতর হয়। ডাভেল থেকে ফারেগ হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন তিনি উস্তাদের খেদমতে ইলমী এবং রূহানী ফায়দা অর্জন করার জন্য অবস্থান করেন। একবার শাহ সাহেব র. আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীর যাওয়ার এরশাদ করলে, তিনিও অনুমতি নিয়ে সফরের সাথী হন। এ সফরে মাওলানা বিননূরী রাত ১১টা

থেকে ২টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন। শায়খের জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই তাঁর চোখ খুলে যেতো। তিনি অজুর পানি গরম করে শাহ সাহেবের ওজুর ব্যবস্থা করতেন। হযরত মাওলানা বলেন, সে অবস্থায় সম্পর্ক এমন হয়েছিল যে, শাহ সাহেবের চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম, তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন। মরুভূমিতে মুষলধারে বৃষ্টি হলে যেরূপ জমিন নরম হয়ে যায়, ঠিক সেরূপ এ শহরে আল্লামা কাশ্মিরীর ইলমী এবং রূহানী কামালাতের বর্ষণে হযরত ইউসুফ বিননূরীর অন্তর সজীব হয়ে ওঠে, এমনকি তিনি শাহ কাশ্মিরীর ইলমী আমানতদার হিসাবেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

হযরত বিনুরীর মধ্যে ইলমী পিপাসার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জনের পিপাসাও ছিল অপরিমিত। তিনি ১৩৫৭ হিজরীতে হজ্জের সময় হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খলীফা হযরত হাজী শফিউদ্দীন নগিনবীর নিকট বায়আত হন। হযরত নগিনবী বিদায়কালে বলেছিলেন, "হিন্দুস্তানে ফিরে গিয়ে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বা হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সাথে এ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার চেষ্টা করো।" পরে তিনি এ সম্পর্ক কায়েম রাখেন এবং খেলাফতও লাভ করেন।

অধ্যাপনা

পেশোয়ারে কয়েক বছর দীনী খেদমত আনজাম দেওয়ার পর আল্লামা কাশ্মিরী র. ইন্তেকাল করলে, তাঁরই সুযোগ্য শাগরেদ উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত ডাভেল মাদ্রাসার শায়খুল-হাদীস এবং প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি ডাভেল ত্যাগ করেন এবং হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওসমানীর প্রতিষ্ঠিত এবং হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানভীর পরিচালিত মাদ্রাসায় তিন বছর হাদীস এবং তফসীরের দরস দেন।

জামেয়াতুল উলূমের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনার পরেও নতুন করে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, হযরত মাওলানা বিননূরীর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। বহু এস্তেখারা, মক্কা-মদীনা শরীফে মোরাকাবা, বুযুর্গানে দীনের পরামর্শ এবং বহু চিন্তা-ভাবনার পর, মনের মত করে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা-নিকেতন গড়ার জন্যে তিনি পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর করাচীকে বেছে নেন এবং ১৯৫৩ সালে জামে মসজিদ নিউ টাউন, করাচীতে মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মাদরাসার কাজ শুরু হলেও হযরত মাওলানা

ইউসুফ বিননূরী (রঃ)এর– এখলাস এবং কুরবানীর বদৌলতে অতি শীঘ্রই এটা পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদরাসায় পরিণত হয়। এ মাদ্‌রাসা কোন কোন দিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিনা বেতনে পড়ানোর জন্যে মাত্র দু'জন উস্তাদ নিয়ে কাজ শুরু করেন। এ মাদ্রাসায় হাদীস, ফেকাহ এবং দাওয়াত ও এরশাদ বিভাগে তাখাচ্ছুছ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানলাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া উন্নতমানের লাইব্রেরী, রচনা বিভাগ, দারুল ইফতা, একটি উচ্চাঙ্গের ইলমী 'মাসিক আল-বাইয়্যেনাত' মাদ্রাসার সৌরভকে আরো ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইলমে হাদীসের খেদমত

খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ইলমে-হাদীসের বিভিন্ন দিকে ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি একাধারে শায়েখ আল্লামা আনোয়ার শাহ র. এবং মিশরের আল্লামা জাহেদুল কাওসারীর নিকট থেকে ইলমে-হাদীসে বিশেষ এসতেফাদা করেন। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প সময় হযরত শাহ সাহেবের সোহবত লাভ করলেও ইলমী-কামালাত তিনিই বেশী লাভ করেছিলেন। স্বীয় উস্তাদের অনুসরণে তিনি হাদীসের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতেন। মজলিসে-ইলমীর পক্ষ থেকে ফয়জুল বারী, নসবুর রায়া ইত্যাদি কিতাব প্রকাশের ব্যাপারে তিনি মিশর যান এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হন। তিরমিযী শরীফের শরাহ মায়ারিফুছসুনান তাঁর ইলমে-হাদীসে দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি ছিলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের অন্যতম।

বাতেলের মোকাবেলায়

বাতেলের মোকবেলায় হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী ছিলেন বজ্রকঠোর। হযরত শাহ কাশ্মিরী সাহেব কাদিয়ানী ফেৎনা উৎখাতের অগ্রনায়ক ছিলেন। তিনি হযরত শাহ আতাউল্লাহ বোখারীকে শুধু এ কাজের জন্য নিযুক্ত করে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের কাছে থেকে বয়াতও নিয়েছিলেন। পাকিস্তানে এ ফেৎনা মাথা চাড়া উঠলে সেখানকার সজাগ ওলামায়ে কেরাম একটি মজলিস কায়েম করে এ ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৯৭৪ সালে হযরত বিননূরী এ মজলিসের আমীর নিযুক্ত হন এবং তাঁর শায়েখের কাজকে নিজের দায়িত্ব মনে করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এছাড়া মাশরেকী আওয়াজ বুলন্দ করেন। শেষ জীবনে মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধেও তিনি আরবী এবং উর্দুতে বই লিখে গেছেন।

মুসলিম জাহানে

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ছিলেন। আকাবেরে ওলামায়ে দেওবন্দের চিন্তাধারা এবং ইলমী খেদমতকে মুসলিম বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্যে তিনি মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেন। ঐ সব দেশের প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আরব-বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর দাওয়াত আসতো। তিনি সে সব দাওয়াত কবুল করতেন। তিনি আরব-জাহানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। উত্তর আফ্রিকা, লেবানন, ফিলিস্তীন, জর্দ্দান, লিবিয়া, কুয়েত এবং ইরাক সফর করেন।

তাবীলীগ জামাত এবং হযরত বিননূরী

তাবলীগ জামাতের সাথে হযরত মাওলানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আমীরে জামায়াত হযরত মাওলানা ইউসুফ দেহলভীকে লক্ষ্য করে বলতেন, "আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্য হয়ে যাই; যিনি তাবলীগি সফর এবং পড়াশুনায় ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও 'আমানিউল-আহবার' এবং 'হায়াতুসসাহাবা' কিতাব রচনা করতে পারেন। করাচীতে হযরত মাওলানা ইউসুফ দেহলভী বা মাওলানা সাঈদ খান সাহেব উপস্থিত হলে তাঁদেরকে মাদরাসায় দাওয়াত দিতেন। এছাড়া বিভিন্ন এজতেমায় অংশগ্রহণ করতেন। এ মোবারক জামাত সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান রচনাবলী পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

হকের নিশানবরদার

হককে প্রকাশ করতে হযরত মাওলানা কোনদিন ভয় পাননি। একবার হজ্জের সময় মিনায় বাদশাহ ফয়সল মরহুমের সঙ্গে দেখা করে মুছাফার সময় বলেছিলেন, হাজীদের কুরবানীর সময় গানের আওয়াজ আসে-এটা আপনি বন্ধ করে দিন। শহীদ ফয়সল বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আর এমন হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মিনার আশে-পাশে রেডিও ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। একবার আইয়ুব খানের আমলে, ওয়াকফ বোর্ডকে মাওলানা বিননূরীর মাদ্রাসাকে কব্জা করে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা মাদ্রাসায় এলে, মাওলানা তাকে সব কিছু দেখান। কুতুবখানায় যেয়ে বলেন যে, 'এটা একটা ইলমের বাগান। আচ্ছা আপনি বলুন তো, কোন বাগানে চারা লাগাবার পর, ফল আসার সময় যদি কোন জালেম ওটাকে নষ্ট করে, তবে কেমন লাগে? ঠিক তদ্রুপ এ মাদ্‌রাসা সাজাতে, এর কুতুবখানায় বিভিন্ন দেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য কিতাবপত্র এনে পূর্ণ করতে আমার কত যে কষ্ট হয়েছে!' এরপর আকস্মিক তিনি ঐ অফিসারের জামার কলার ধরে গম্ভীর

স্বরে বলেন, 'কেয়ামতের দিন তোমার কলার ধরে আল্লাহ্ পাকের কাছে নিয়ে গিয়ে বলব, এই জালেম আমার ইলমী বাগিচাটি বিরান করেছিল।' তখন ঐ অফিসার কেঁদে উঠে বলেন, 'মাদরাসার কোনই অসুবিধা হবে না। আমি সরকারকে নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়ার পরামর্শ দেব।'

রচনাবলী

হযরত মাওলানা ইউসূফ বিননূরীর মাতৃভাষা পশতু হলেও তিনি উর্দূ এবং আরবীতে উঁচুমানের লেখক ছিলেন। উর্দূর চেয়ে আরবীতেই তাঁর রচনা বেশি। আল্লাহ পাক তাঁর লেখার মধ্যে অফুরন্ত বরকত দিয়েছিলেন। 'মায়ারিফুস সুনান' নামে আরবীতে তিরমিযী শরীফের ৫ জিলদে (অসমাপ্ত) শরাহ লিখেছেন। এছাড়া 'নাফহাতুল-আম্বার' নামে আল্লামা কাশ্মিরীর জীবনী লিখেছেন। ছোট বড় মিলিয়ে তাঁর আরো অনেক কিতাব ও প্রবন্ধ রয়েছে।

ইন্তেকাল

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসূফ বিননূরী র. শুধু পাকিস্তানেরই খ্যাতনামা আলেম ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা মুসলিম জাহানের গৌরব। পাকিস্তান সরকারের ইসলামী মশওয়ারাতি কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানের জন্যে তিনি ১৯৭৭ সালের ১৩ই অক্টোবর ইসলামাবাদ যান। বৈঠকে যোগদানের পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জেনারেল জিয়াউল হক সাহেবের সাথে সাক্ষাতসহ অন্যান্য সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দেওয়া হয়। তিনি গলায় ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭ই অক্টোবর সেখানকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন)।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব হযরত বিননূরীর জানাযার নামায পড়ান। পরে নিউ টাউন করাচীতে মাদরাসার সীমানার মধ্যেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত বিননূরী র. আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর কর্মবহুল জীবনের মহান আদর্শ এবং ইলমের অক্ষয় উত্তরাধিকার চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জামেয়ার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন

'যদি দীনী মাদরাসা পার্থিব স্বার্থে বানানো হয় তবে তা হয় আখেরাতের জন্য আযাব। আর যদি পরকালের জন্য বানানো হয় তবে তা হয় দুনিয়ার আযাব।' হযরত ইউসুফ বিনুরী র. এ কথা সর্বপ্রথম তখনই বলেন যখন একজন বিশিষ্ট আলেমে দীন একটি নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরামর্শ চান। এরপরে অনেক সভা-সমাবেশে তিনি এই বিজ্ঞোচিত কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। নিঃসন্দেহে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দীন ইলমের সুদৃঢ় দুর্গ হওয়া উচিত তা যদি পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম বানানো হয় তবে তা পরকালে অনেক বড় বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হবে। আর যদি তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালে সফলতা অর্জন হয় তখন জায়েয-নাজায়েয ও হালাল-হারামের সীমারেখা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে পার্থিব নানাবিধ বিপদ-আপদ সমস্যা সংকট ও পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

তাঁর এই কথা কোন কবিসুলভ ধারণার বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং ষাট বছরের দীর্ঘ সময় ধরে মাদরাসার সাথে থাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রায় চল্লিশ বছর যাবত একটি বড় দীনী প্রতিষ্ঠানের এহতেমাম ও পরিচালনার দায়িত্বভার পালন করার পর তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। হযরত র. বলতেন, "মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর যেসব সমস্যা-সংকট সামনে আসে, যদি তা পূর্ব থেকেই অনুভব করা যেত তাহলে সম্ভবতঃ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হত না।" সবসময় তাঁর এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছিল যে, ধর্মীয় মাদরাসাগুলো যেন কেবল পরকালের সফলতা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাতে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ও কামনা-বাসনার সংমিশ্রণের অবকাশও না থাকা চাই। যখন তিনি দেখতে পেতেন কোন মাদরাসার মাধ্যমে এই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না, তখন তা তাঁর সহ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে যেত। যেমনটি দারুল উলূম টেন্ডুবুল্লাহ ইয়ার এবং মাদরাসা লাযিয়ূহ করাচী'র অভিজ্ঞতা তার সাক্ষ্য বহন করে আছে।

নিউ টাউনে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত র. বুযুর্গানে দীনের পরামর্শ, ইস্তেখারা, হারামাইন শরীফাইনে মুরাকাবা, মুকাশাফা এবং দুআর পর একটি পৃথক দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। এজন্যে তিনি নিউ টাউন করাচীর জামে মসজিদের আশপাশের এলাকাকে নির্বাচন করেন এবং আঞ্জুমানের জিম্মাদারদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমাকে একটি নির্ভেজাল দীনী

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা কেবল জায়গা দেবেন। আমি মাদরাসা নির্মাণ ও তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আপনাদের কাছে কোন আর্থিক সাহায্য চাই না। আর না অন্য কোন ধরনের সহযোগিতার আবেদন জানাই। আঞ্জুমানের জিম্মাদারগণ সন্তুষ্টচিত্তে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কেননা, তারা প্লটটি মাদরাসা ও মসজিদের নামে লাভ করেছিল। আর তাঁরাও চাচ্ছিলেন এখানে একটি মকতব প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তাদের জন্য জামে মসজিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট দোকান নির্মাণের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করাই কষ্ট হচ্ছিল। মাদরাসার ভবন নির্মাণ কিংবা তজ্জন্যে আর্থিক সহযোগিতা করা তো অনেক দূরের কথা। মসজিদের জিম্মাদাররা তখন কেবল মসজিদের ছাদ ঢালাই করেছিলেন। না তার প্লাস্টারের কাজ সমাধা হয়েছিল, আর না বারান্দা পাকা করা হয়েছিল। ওযুখানা এবং পেশাবখানাও তখন নির্মিত হয়নি। মোটকথা, এমন পরিস্থিতিতে আঞ্জুমানে মসজিদ নিউ টাউনের কিছু নিষ্ঠাবান জিম্মাদার মাদরাসা নির্মাণের এই প্রস্তাবকে অদৃশ্যের সহযোগিতা মনে করে মঞ্জুর করে নেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় মসজিদে বসে পঠন-পাঠনের অনুমতি দেন।

ধৈর্যের পরীক্ষা ও হতাশাব্যঞ্জক পুঁজিস্বল্পতা

হযরত মাওলানা র. কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের এক দুর্দিনের সাথী বলুন কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু, উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব এবং দরজায়ে 'তাকমীল' এর– দশজন কষ্ট সহিষ্ণু ছাত্র নিয়ে জামে মসজিদ, নিউ টাউনে স্থানান্তরিত হন। তখন মসজিদের আওতায় টিনের চালা বিশিষ্ট কেবল একটি কক্ষ ছিল। সেই কামরাতেই হযরত মাওলানা র. ও উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব নিজেদের অল্প-স্বল্প সামান রাখেন। আর রাতের বেলা শোয়ার জন্য নিজেদের এক দীর্ঘ দিনের সাথী হাজী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের (যিনি অত্যন্ত নেককার, দীনদার ও হযরত র. এর অনুরক্ত দোস্ত ছিলেন।) কুঠিতে- (যা মাদরাসা থেকে কয়েক ফার্লং দূরত্বে ছিল) চলে যেতেন। আর ছাত্ররা মসজিদেই দিনের বেলায় পড়ত এবং মসজিদেই রাতে ঘুমাত। নিজেদের খাওয়া-পড়ার সরঞ্জাম ও আবশ্যক সামান মসজিদেই রাখত। মসজিদ সে সময় নিঃসন্দেহে অরক্ষিত ও চারদিকে খোলা ছিল। ছাত্রদের সামান হেফাজতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সময় সময় সামান (সরঞ্জাম) চুরি হয়ে যেত। এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বর্তমান কক্ষের ছাদ পাকাকরণ ও তার সাথেই ছাত্রদের জন্য অন্য একটি কক্ষ নির্মাণের জন্য হযরত নিজেই তার সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে তিনশ রূপী আনেন এবং কমিটিকে দেন। এভাবে অন্য একটি কক্ষ নির্মিত হয়। সবচেয়ে বড় মসিবত, যা অধিক মনোকষ্টের কারণ ছিল তা হল, না মসজিদের কোন গোসলখানা ছিল, না ছিল কোন

পায়খানা। আর না পেশাব করার জন্য কোন সংরক্ষিত স্থান ছিল। কেবল ওযু করার জন্য অস্থায়ীভাবে কিছু গুড়ি লাগানো ছিল। এর ফলে দিনের বেলা পেশাব কিংবা প্রয়োজন সারার জন্য উভয় বুযুর্গের প্রত্যেককে হাজী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের ঘরে যেতে হত, যা ছিল অনেক দূরে।

যেসব শিক্ষক বিনিময় ব্যতিরেকেই পড়াতেন

হযরত র. এই মাদরাসার সূচনা করেন (দরজায়ে তাকমীল) দাওরায়ে হাদীসের মাধ্যমে। শুরুতে বিনা বিনিময়ে কাজ করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে দু'জনকে দাওয়াত দেন। এক বুযুর্গ তো মাদরাসা লাযিয়্যুহের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিউ টাউনে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই হিম্মতহারা হয়ে নিজের বাসভূমে ফিরে যান। কেবল হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব তাঁর সাথে নিউ টাউনে আসেন। এই অসহায় অবস্থায় না ছাত্রদের কোন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, না ছিল শিক্ষকদের খেদমতের হক আদায় করার কোন উপায়। হযরত মাওলানা র. নিজের মুখলেছ বন্ধুদের কাছ থেকে ধার কর্য নিয়ে কোনভাবে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ- নিউ টাউন স্থানান্তরিত হওয়ার পর হযরত র. তাঁর একজন ব্যবসায়ী বন্ধু হাজী আলীমুদ্দীন জওহরী থেকে তিনশ (৩০০) রূপী ঋণ নেন, যা সম্ভবত হাজী সাহেব দুই কিস্তিতে দিয়েছিলেন। এই তিনশ রূপী দশজন ছাত্রকে জনপ্রতি ত্রিশ রূপী হিসেবে এক মাসের খরচের জন্য ভাগ করে দেয়া হয়। মাদরাসার সূচনা হয় এভাবেই। অনুরূপভাবে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যেও যারা করাচীতে স্থানাভাবে তখনও পর্যন্ত টেন্ডুল্লাহ ইয়ারেই ছিলেন, কিছু সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং কিছু নিজের মালিকানাধীন দুর্লভ কিতাবাদি বিক্রি করে খোদায়ী সাহায্যের আশায় প্রহর গুনছিলেন।

পরিবার-পরিজনের নিঃসঙ্গতা, দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যশীলতার ঘটনাবলী

মানুষ সত্তাগতভাবে নিজের সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নেয়। কিন্তু একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের দুঃখ কষ্ট কোনভাবেই বরদাশত করতে পারে না। সে তার সকল সামর্থ সর্বপ্রথম নিজের ছেলে সন্তানদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করার জন্য ওয়াকফ করে দেয়। কিন্তু মাওলানা র. নেহায়েত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজের সকল শক্তি-সামর্থকে আল্লাহ তাআলার দীনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়াকফ করেছেন। কেবল এজন্যই তিনি মাদরাসা ডাভেলের শায়খুল হাদীসের পদমর্যাদা, মোটা বেতন, শানদার আবাসস্থলের উঁচু মাপের আরাম-আয়েশ ছেড়ে এই আশায় পাকিস্তান আসেন যে, ডাভেলে চাহিদামাফিক উপকৃত

হওয়ার মত ছাত্র ছিল না। তাঁর সেখানে অবস্থান করা খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার নষ্ট করারই নামান্তর ছিল। দারুল উলূম টেন্ডুল্লাহ ইয়ারে তার সম্ভাবনা অধিক উজ্জ্বল ছিল। সেখানে মাওলানা আব্দুর রহমান তাহের কামেলপুরী সাবেক সদরুল মুদাররিসীন মাজাহেরে উলূম সাহরানপুর এর– মত বুযুর্গ ব্যক্তি, মাওলানা বদরুল আলম মুহাজেরে মাদানীর মত মাওলানার শ্রদ্ধাভাজন আলেম সেখানে প্রথম থেকেই বর্তমান ছিলেন। অতএব নেহায়েত সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন।

দারুল উলূম টেন্ডুল্লাহ ইয়ারের অবস্থা যখন কলুষিত হয়ে পড়ে যা উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না, হযরত মাওলানা র. তা সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যখন দারুল উলূম টেন্ডুল্লাহ ইয়ারের সংশোধন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন করাচী তাশরীফ আনেন এবং হাব নদীর পাশে কিছু বুযুর্গানে দীনের সাথে দীনী ইলমের খেদমত শুরু করেন। যখন কিছু সহকর্মীর পক্ষ থেকে অসহনীয় জ্বালাতনের ধারা শুরু হয় তখন তিনি তা সংশোধনে অপারগ হওয়ার পর ইস্তেখারা, দুআ (যার আলোচনা প্রথমে এসেছে) এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমে নিউ টাউন জামে মসজিদের আওতায় একটি আলাদা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এখানেও প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতার কঠিন কঠিন পরীক্ষা সামনে আসে। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ছাড়াও সবচেয়ে বড় মনোকষ্টের কারণ ছিল টেন্ডুল্লাহ ইয়ারে পরিবার-পরিজনের নিঃসঙ্গতা, যা অন্তরে কাঁটা হয়ে বিঁধত। কেননা, মাওলানা চলে আসার পর সেখানে কোন পুরুষ লোক ছিল না। কেবল মহিলা ও বাচ্চারা ছিল। করাচীতে তখন নিজেরই কোন ঠিকানা ছিল না, পরিবার-পরিজনের থাকার বাসার প্রশ্ন তো ওঠতেই পারে না, সে সময় খাদেম হিসেবে মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেব (যিনি হাজী সুমার ফ্যাক্টরীতে ইমাম ও খতীব ছিলেন।) নিজে বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে ঘরে পৌছে দিতেন কিংবা কোন শাগরেদের মাধ্যমে এই খেদমতটা নিতেন। হযরত র. মাসে একবার কেবল দু'তিন দিনের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং চিনি, চা পাতা, সাবান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সাথে করে নিয়ে যেতেন। তখন আসা-যাওয়া বর্তমানের মত এত সহজ ছিল না। হায়দারাবাদ থেকে 'মীরপুরে খাস' পর্যন্ত বড় লাইন ছিল না। হায়দারাবাদ থেকে অনিবার্যভাবে গাড়ি পরিবর্তন করতে হত এবং ছোট লাইনের গাড়ির জন্য অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত। নিতান্ত কষ্ট-ক্লেশে জর্জরিত হতে হত। বাস ব্যবস্থা ছিল নেহায়েত দুর্বল, বরং তা না থাকারই বরাবর ছিল।

নৈরাশ্যব্যঞ্জক ঘটনা

একদিনের ঘটনা। করাচী থেকে হায়দারাবাদ যাওয়ার গাড়ি লেট হয়ে যায়। ফলে হায়দারাবাদ অনেক দেরীতে পৌঁছে। যার কারণে হায়দারাবাদ থেকে টেন্ডুল্লাহ ইয়ার যাওয়ার গাড়ি বেরিয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় গাড়ির জন্য রাতের একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। শীতকাল ছিল। বৃষ্টিও পড়ছিল। রাত দুটোয় গাড়ি টেন্ডুল্লাহ ইয়ার পৌঁছে। স্টেশনে কোন বাহনও উপস্থিত ছিল না। বৃষ্টির কারণে বিদ্যুতও চলে যায়। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। সাথে ছিল কমপক্ষে এক মণ ওজনের বোঝা। ঘর ছিল স্টেশন থেকে কয়েক ফার্লং দূরে। সামান বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে কোন কুলিও ছিল না।
এমন পরিস্থিতিতে হযরত র. সামান আপন মাথায় উঠিয়ে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা ও গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাড়ী রওয়ানা হয়ে যান। হযরত বলতেন, সেই রাতের দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ আমার মনোবল ভেঙ্গে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলাম, হে আল্লাহ! এখন আমার এর চেয়ে অধিক কষ্ট বরদাশত করার হিম্মত নেই। তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়ে করাচীতে বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন।
তিনি বলেন, এরপর যখন করাচীতে ফিরে আসেন তখন মসজিদ কমিটির সদস্যরা নিজ থেকেই হযরত র. এর কষ্ট জোরালোভাবে অনুভব করতে শুরু করল এবং বলতে লাগল, মাওলানার জন্য শীঘ্রই বাড়ী বানানো দরকার। তা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্য। অতএব, বলেন, সেই রাতের পর কেবল একবারই টেন্ডুল্লাহ ইয়ার যেতে হয়েছে। আর তাও গৃহবাসীদের এই সংবাদ দিত যে, করাচী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। দ্বিতীয়বার তো তাদের আনার জন্যই যেতে হয়েছিল।

বড়মাপের কুরবানী

এই বিপদ সংকুল সময়ে বাহ্যতঃ কোন আশ্রয় ছাড়া পরিবার-পরিজন টেন্ডুল্লাহ ইয়ারে পড়ে থাকাই হযরতের জন্য কম কষ্টের ছিল না। বিপদের উপর বিপদ এই আসল যে, সেখানকার কিছু হীনমনা, বিদ্বেষী ও দুষ্ট স্বভাবের লোক হয়তো হযরতের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গৃহবাসীদের নানাভাবে জ্বালাতন করতে থাকে। এমনকি বাড়িতে শাকসবজি, তরিতরকারী ইত্যাদি পৌছানোও কঠিন করে তোলে। এমনি সময়ে হযরতের মেয়ে মরহুমা ফাতেমা বোনের চোখে কঠিন অসুখ হয়। এদিকে হযরত র. করাচীতে মাদরাসার কাজে ব্যতিব্যস্ত এবং বিভিন্ন জটিলতায় চিন্তিত। অন্যদিকে মরহুমা তার মাতার কাছে টেন্ডুল্লাহ ইয়ারের বাড়িতে রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। না ছিল

কোন সেবা-শুশ্রুষাকারী, না ছিল ঔষধ পথ্যের কোন ব্যবস্থাপক। এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কি উপায় ছিল? ফল এই দাঁড়াল যে, চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেতে থাকে। যখন গৃহবাসী করাচীতে স্থানান্তরিত হল এবং তাকে কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেখানো হল তখন জানা গেল, চোখের জ্যোতি পুরোপুরি লোপ পেতে যাচ্ছে এবং বাহ্যতঃ তার সুস্থতার কোন সম্ভাবনা নেই।

মরহুমার দীনদারী, সৎকর্মপরায়ণতা, তাক্বওয়া, অসুস্থতা ও অসহায়ত্বের কারণে হযরত তাঁকে অপরিসীম মহব্বত করতেন। কেঁদে কেঁদে বলতেন, এই দীনী মাদরাসার জন্য আমি আমার কলিজার টুকরো আদরের মেয়েকেও কুরবান করে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমার কুরবানীকে কবুল করেন। আর যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা নিজেদেরকে, পরিবার-পরিজনকে উৎসর্গ করেছি স্বীয় রহমত ও করুণায় যেন সেই উদ্দেশ্যে সফলতা দান করেন।

যাই হোক, উস্তাদ মুহতারাম হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব যেহেতু পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল ও জমিদার ছিলেন। তাই চার মাস যাবৎ বিনা বেতনে কাজ করতে থাকেন। অতঃপর ফসল কাটার সময় আসে এবং তিনি এক মাসের জন্য বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত মাওলানা র. হেসে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, শিক্ষকদের জন্য কিছু পয়সা আমার হাতে এসে গেছে। কিছু অপেক্ষা করুন। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব হেসে বললেন, জ্বী, হ্যাঁ, বিড়াল তো স্বপ্নে ইঁদুরই দেখে। ঘণ্টাখানেক পর হযরত র. মুচকি হেসে তাশরীফ আনেন এবং বলেন, মওলভী সাহেব! ইঁদুর এসে গেছে।

মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব বলেন, কোন ব্যক্তি (সম্ভবতঃ মরহুম হাজী ওয়াজীহুদ্দীন) মাদরাসায় ছয়শ রূপী চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। এ ছিল মাদরাসার শিক্ষকদের ফান্ডে প্রথম চাঁদা। এ থেকে আমাকেও দু'শ রূপী দেওয়া হয় এবং আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাই। ছুটি শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসি। যা হোক, বছরের শেষ দিকে মাদরাসার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়ে যায়।

নজীরবিহীন খোদাভীরুতা

নিষ্ঠা ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে হযরতের মান-মর্যাদা ছিল বিস্ময়কর। তিনি কাজ নিজেই করতেন। কিন্তু নামের জন্য সবসময় অন্যদের সামনে বাড়িয়ে দিতেন। যেমনটি মাদরাসার সকল চেষ্টা-সাধনা ও সংকট সমস্যার মোকাবেলা তিনি নিজেই করতেন। এতদসত্ত্বেও হযরত র. হাজী মুহাম্মাদ খলীল সাহেব র. কে (যিনি নিউ টাউন জামে মসজিদ কমিটির বর্তমান সেক্রেটারী সাইয়েদ জামিল সাহেবের পিতা এবং আপাদমস্তক এখলাস, নিষ্ঠা

ও প্রথম যুগের মুসলমানদের নমুনা ছিলেন।) মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ার মুহতামিম বানান। আর মরহুম হাজী মুহাম্মাদ ইয়াকুব কালিয়াকে (যিনি নেহায়েত দীনদার এবং বিশেষতঃ মাদরাসার ছাত্রদের খুব বেশি কদর করতেন।) মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ বানানো হয়। আর এভাবে দু'চারজন দীনদার লোককে সদস্য বানিয়ে মাদরাসার একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করেন। এছাড়া মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলানোর সুযোগ দিতেন না। আর তিনি বলতেন, মাদরাসা ও দরস-তাদরীস এর– ব্যাপার কেবল অভিজ্ঞ আলেমরাই বুঝবেন। গায়রে আলেম লোক এসব সূক্ষ্ম বিষয় কখনো বুঝতে পারবে না।

হযরত মাওলানার পরামর্শ পরিষদ

তিনি মাদরাসার কোন কাজই পরামর্শ ছাড়া করতেন না। কিন্তু পরামর্শ করতেন বড় বড় আলেমে দীন, আধ্যাত্মিক সাধক, বিশেষতঃ মাদরাসার আহলে রায় আসাতেযায়ে কেরাম ও নিষ্ঠাবান সহযোগিদের সাথে। চাই তা মাদরাসার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হোক কিংবা কোন শিক্ষককে রাখা-না রাখা সংক্রান্ত বা ছাত্রদের আচার-আচরণ সংক্রান্ত। কিতাব সংক্রান্ত ব্যাপার হোক কিংবা কুতুবখানা সংক্রান্ত। ছাত্রদের প্রয়োজন ও বেতন সংক্রান্ত হোক কিংবা কোন কর্মচারীর অভিযোগ সংক্রান্ত। মোটকথা, মাদরাসার যে কোন ছোট-বড় বিষয়- তা যে বিভাগের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন, নিজের একক মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন না, বরং অন্যান্য আসাতেযায়ে কেরাম ও আহলে রায়দের সাথে পরামর্শ এবং আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা ও ইস্তেখারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন। অনুরূপভাবে মাদরাসার বিশেষ রেজিস্টারে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকৃত বিষয় নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হত।

নজিরবিহীন অমুখাপেক্ষিতা

যেখানে নিষ্ঠা ও খোদাভীরুতার এত উঁচু মাকাম ছিল সেখানে অমুখাপেক্ষিতা ও আত্মমর্যাদাবোধের অবস্থাও ছিল অভাবনীয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা সংঘঠিত হয়। হযরত র. হারামাইন শরীফাইনে ইস্তেখারার পর যখন টেন্ডুল্লাহ ইয়ারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং সে সময় পর্যন্ত নতুন মাদরাসার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন, তখন মরহুম মুহাম্মাদ ইউসুফ হযরতের কাছে আরয করেন, 'আপনি মাদরাসা বানান এবং হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব কানপুরীকেও আপনার সাথে নিয়ে নিন। আমি আপনাদের দু'জনের পাঁচ বছরের মাসোহারা বাবদ পঞ্চাশ হাজার রূপী ব্যাংকে জমা করে দিচ্ছি।

হযরত র. তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি কিছু কারণে মাদরাসা শুরু হওয়ার পূর্বে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে অক্ষম। হ্যাঁ, মাদরাসা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন যে সাহায্যই করবেন কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে। মরহুম জানতেন যে, হযরত র. মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তায় আছেন এবং অন্যদিকে তিনি সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। ঋণ নিয়ে পরিবারের খোরাকী চালাচ্ছিলেন। সেজন্যে তিনি হযরত র.কে খুব বেশি অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু তার অনুনয়-বিনয় হযরতের প্রত্যাখ্যানকে আরও সুদৃঢ় করে। অবশেষে মরহুম তার সাথীকে পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, মাওলানা তো আমার কথা শুনতেই চাচ্ছেন না। হযরত র. বলতেন, আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের মাদরাসার সূচনা আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা ব্যতীত অন্যান্যদের ওপর ভরসা করার মাধ্যমে হোক।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাবধানতা

মাদরাসায় আগত টাকা পয়সা ও তা ব্যয় করার ব্যাপারে হযরত মাওলানা র. খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতেন। যার নজীর তৎকালীন জামানায় কোন ছোট-বড় মাদরাসা কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যেত না। মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ মরহুম হাজী মুহাম্মাদ ইয়াকুব কালিয়া সাহেবকে হযরত র. বলেছিলেন, মৌলিকভাবে মাদরাসার দু'টি ফান্ড এবং ব্যাংকে আলাদা আলাদা দু'টি একাউন্ট হওয়া চাই। একটি যাকাত ফান্ড, অন্যটি যাকাত ভিন্ন সাহায্য ফান্ড। আর উভয় ফান্ডকে এমনভাবে পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে যাতে মিশ্রিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই বাকি না থাকে এবং উভয় ফান্ডের অর্থকে নিম্নলিখিত পন্থায় ব্যয় করা হবে-

যাকাত ফান্ড- যাতে যাকাত ছাড়াও ছদকায়ে ফিতর, মান্নত, কাফফারা ও অন্যান্য ওয়াজিব ছদকার টাকা পয়সাও জমা করা হয়। সেই ফান্ডের ব্যাপারে এই নির্দেশনা ছিল যে, যাকাতের টাকা কেবল উপযুক্ত ছাত্রদের খাওয়া পরা ও সাধারণ প্রয়োজনাদি সমাধা করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাতার নামে হাতে হাতে নগদ প্রদান করা হবে। ছাত্ররা মাদরাসা থেকে মাসিক ভাতা নিয়ে খোরাকি বাবদ নির্দিষ্ট মূল্যে মাতবাখের জিম্মাদারের কাছে জমা দেবে। মাদরাসা কেবল তার তত্ত্বাবধান করবে। এতদ্ব্যতীত এই ফান্ড থেকে ছাত্রদের অন্যান্য প্রয়োজনাদি, কাপড়-চোপড় কিংবা শীতের মওসুমে লেপ-তোষক, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

অন্য সাহায্য ফান্ডের অর্থ কেবল শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন কিংবা প্রয়োজনীয় দরসী কিতাবপত্র ক্রয়ে ব্যয়িত হবে। আর এতেও তিনি এত বেশি সতর্ক ছিলেন যে, তা থেকে নির্মাণ, গায়রে দরসী কিতাব ক্রয়,

বিদ্যুতের বিল প্রদান তথা সাধারণ প্রয়োজনে কোন অর্থ ব্যয় করতেন না। বরং নির্মাণ ও মাদরাসার সাধারণ প্রয়োজনে সেখান থেকেই ব্যয় করতেন, যেসব অর্থ নির্দিষ্ট নামে মাদরাসায় আসত।

অনুরূপভাবে ছাত্রদের ফান্ডে যদি কখনও স্বল্পতা দেখা দেয় তবে যথাসম্ভব শিক্ষকদের ফান্ড থেকে তা পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কখনও শিক্ষকদের ফান্ডে স্বল্পতা দেখা দেয় তবে কখনও ছাত্রদের ফান্ড থেকে নিয়ে তা পূরণ করা হবে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা হবে যেন তিনি আপন অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে অর্থ পাঠিয়ে দেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণিত কিছু ঘটনা, যা মাদরাসার চব্বিশ বছরের ইতিহাসে সংঘঠিত হয়েছে, উল্লেখ করার মত-

১. মাদরাসা শুরুর দ্বিতীয় বছর যাকাত ফান্ডের অবস্থা আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছে। একদা যাকাত ফান্ডে পঁচিশ হাজার টাকা জমা ছিল। কিন্তু গায়রে যাকাত ফান্ড ছিল শূন্য। যখন বেতন দেওয়ার সময় আসল তখন মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ হযরত মাওলানার কাছে আরয করলেন, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য কোন অর্থকড়ি জমা নেই। যাকাত ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে শিক্ষকদের বেতন আদায় করাই মুনাসেব মনে হচ্ছে।
   তিনি উত্তরে বললেন, কখনও না। আরও বললেন, এই ঋণ আদায়ের জিম্মাদার কে হবে? হায়াত-মউতের কোন ভরসা নেই। যদি এই অবস্থাতেই মৃত্যু এসে পড়ে তবে এই ঋণ কে পরিশোধ করবে? আমি শিক্ষকদের আরাম-আয়েশের জন্য দোযখের ইন্ধন হতে চাই না। শিক্ষকদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং দুআ করা চাই, যাতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের ফান্ডে কিছু পাঠিয়ে দেন। আর যে শিক্ষক ধৈর্য ধরতে পারবেন না, তিনি ইচ্ছা করলে মাদরাসা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।
২. ইতোপূর্বে এক সময় ভুলবশতঃ বর্ণিত কোষাধ্যক্ষ সাহেব যাকাতের টাকা থেকে হযরতকে না জানিয়ে কিছু ঋণ নিয়ে মাসোহারা বাবদ আদায় করেন। যখন এ কথা হযরত র. জানতে পারলেন, তখন নেহায়েত রাগ ও ক্রোধান্বিত হয়ে কোষাধ্যক্ষকে বললেন, এর জিম্মাদার আমি নই। আপনাকেই জাহান্নামে যেতে হবে। অতঃপর খুব তাড়াতাড়ি এই ভুল শোধরানোর জন্য আদেশ দিয়ে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্থ আদায় করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বেতন নেব না।
   অতএব, আল্লাহর রহমতে খুব শীঘ্রই এই ঋণ পরিশোধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী মাসে সময়মত বেতন বণ্টন করা হয়।

৩. প্রথম যুগে একবার এমন হয়েছে যে, এক সময় মাদরাসার বেতন ফান্ডে কোন অর্থ ছিল না। কিন্তু যাকাত ফান্ডে অর্থ মজুত ছিল। হযরত র. কে তা জানানো হয়। তিনি তখন বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মাসোহারা ফান্ডে অর্থ আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বেতন পাওয়া যাবে না। নিউ টাউন জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব হাজী মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেব মায়মুনও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, মাওলানা! যাকাত থেকে বেতন দেওয়া কি জায়েয নয়? হযরত র. বললেন, যাকাত থেকে বেতন দেওয়া জায়েয নেই। তিনি আরও বললেন, যাকাত থেকে আপনি কি আপনার কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেন? তিনি বললেন, না। হযরত বললেন, তবে মাদরাসার কর্মচারীদের বেতন কীভাবে যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে? এ কথা শুনে তিনি চলে যান এবং কিছুক্ষণ পর পাঁচ হাজার রূপীর নোট নিয়ে হযরতের কাছে পেশ করেন এবং বলেন, এটা যাকাতের অর্থ নয়। আপনি বেতন দিয়ে দিন।

যাকাতের মালের ব্যাপারে হযরতের দৃষ্টিভঙ্গি

যখন কোন মালদার যাকাত দেওয়ার জন্য আসত তখন হযরত মাওলানা কখনোই তাতে আনন্দ প্রকাশ করতেন না। আর তিনি বলতেন, যাকাত তো সম্পদের সেই উচ্ছিষ্টাংশ, যার ওপর আগের যুগে আসমান থেকে আগুন নেমে এসে তা পুড়িয়ে ফেলত। আমার মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য গায়রে যাকাত যদি দিতে পার তবে কিছু দাও। সেজন্যে হযরত র. গায়রে যাকাত দানকারীদের, চাই তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন সম্মান করতেন। এর ফলে হযরতের স্বভাব-সচেতন নিষ্ঠাবান সম্পদশালী লোকেরা যে পরিমাণ যাকাতের অর্থ দান করতেন ঠিক একই পরিমাণ গায়রে যাকাতও দান করতেন।

হযরত র. সাধারণতঃ যাকাত ফান্ডে এক বছরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা হতে দিতেন না। এক বছরের প্রয়োজন পরিমাণ যাকাত মজুত হয়ে গেলে অতিরিক্ত কেউ দিতে চাইলে তিনি তা ফেরত দিতেন। আর যদি দাতারা অনুনয়-বিনয় করতেন এবং বলতেন, হযরত! এগুলো আপনি নিয়ে অন্য মাদরাসায় দিয়ে দিন। তখন হযরত বলতেন, এই কাজ তো তুমি নিজেই করতে পার। কেন শুধু শুধু আমাকে মধ্যস্থতাকারী বানাচ্ছ? আবার কখনো তা নিয়ে এমন মাদরাসায় দিয়ে দিতেন যে মাদরাসার পরিচালনা পরিষদ সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, তারা যাকাতের মাল ব্যয় করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে। এভাবে বিভিন্ন মাদরাসায় তাঁর মাধ্যমে প্রতি বছর বড় অংকের অর্থ যাকাত ফান্ডে পৌঁছত। এই কারণেই

মাদরাসার পুরো ইতিহাসে কখনও হযরত র. তামলীক করেননি। যদিও ফেকাহ্ শাস্ত্রমতে সহীহ্ হীলায়ে তামলীক বৈধ হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি হযরত র. তা সর্বদা অপছন্দ করতেন। এজন্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একবারের জন্যেও তিনি যাকাতের অর্থ হীলায়ে তামলীকের মাধ্যমে গায়রে যাকাত ফান্ডে ব্যয় করেননি।

তিনি বলতেন, যাকাতের অর্থ কেবল যাকাতের ফান্ডেই ব্যয় হওয়া চাই। যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। গায়রে যাকাতের ব্যয়ের জন্য দান ও যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সাহায্যের অর্থ আসা আবশ্যক। এই নীতির ওপর অটল থাকা সহজ কাজ ছিল না। বিশেষতঃ প্রথম দিককার সময়ে। কিন্তু হযরত র. এর মত মুতাওয়াক্কেল (আল্লাহ্র ওপর ভরসাকারী) ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই নিয়মের অনুসরণ করে চলেন এবং কখনোই তা থেকে বিচ্যুত হননি। অধিকন্তু হযরত র. প্রায়ই বলতেন, মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষক ও কর্মচারীদের আল্লাহ্ তাআলার এই এহ্সান ও নিয়ামতের কদর করা চাই যে, তারা খেদমতের বিনিময়ে গায়রে যাকাতের পুত-পবিত্র অর্থ পাচ্ছেন। আর তাও এমন নিষ্ঠাবান লোকদের পক্ষ থেকে যারা নিজেদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেন না এবং যারা لا تعلم شماله ما تنفق يمينه এর বাস্তব নমুনা।

হযরত মাওলানা র. এর– নিষ্ঠা ও আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে মাদরাসাকে সাহায্য করতেন এবং মানুষের অন্তরে মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়াতে দান করার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতেন। আর মুহিব্বীন ও মুখলিস লোকেরা নিতান্ত ইখলাস ও আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে গোপনে নাম ও প্রশংসার প্রত্যাশী না হয়ে হযরত র. এর খেদমতে হাজির হয়ে অর্থকড়ি দান করতেন। আর জোরালোভাবে আবেদন জানাতেন, আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। আল্লাহ্র অনেক বান্দা এমন ছিল যারা ইতোপূর্বে হযরতকে চিনতেনও না, তারপরও হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করতেন, স্বপ্নে আমি এ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, যাও! মাদরাসায় সাহায্য কর। আর যে অর্থকড়ি সাথে নিয়ে আসতেন, তা পেশ করে দিতেন। এ ধরনের স্বপ্ন হযরতের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করত। ফলে পরবর্তীতে তারা মাদরাসার জন্য বড় অংকের অর্থ দান করতেন অথচ নাম পর্যন্ত প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না।

এর বিপরীতে অনেক সময় কিছু মুহিব্বীন মাদরাসায় আর্থিক সাহায্য করত। কিন্তু হযরত র. সম্ভবত তাঁর দৃষ্টিজ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, এই লোক প্রশংসা ও গুণকীর্তন শোনার জন্য অপেক্ষমান। তখন তিনি বলতেন, তুমি

আমাদের ওপর কোন এহ্সান করনি। বরং তোমার এজন্য আমাদের ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া চাই যে, তুমি সঠিক পাত্রে তোমার অর্থ দান করতে পেরেছ। আর যাকাতদাতাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আমরা কখনো এ কথা পছন্দ করি না, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে জান্নাতে যাবে আর আমরা এই সম্পদকে অপাত্রে ব্যয় করে জাহান্নামে যাবো। বরং আমরা তো তোমাদের প্রদত্ত অর্থ সঠিক ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র ব্যয় করে তোমাদের পূর্বে জান্নাতে যেতে চাই। যদিও মাদরাসার কোন স্থায়ী আয়ের উৎস ছিল না, তারপরও হযরতের সুন্দর কর্মপন্থা ও নিষ্ঠার বরকতে প্রথম দিককার এক-দু'বছর ব্যতীত কোন বিভাগে অভাব দেখা যায়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য অদৃশ্যের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। মাদরাসার বিভিন্ন বিভাগ বিশেষতঃ নির্মাণকাজে লাখ লাখ টাকা ব্যয়িত হতে থাকে। কিন্তু কেউ জানে না যে, এই অর্থ কোথা হতে আসে?

এক সময়ের ঘটনা, বিদেশী ছাত্রদের প্রয়োজনের তাগিদে অতি শীঘ্র মাঝখানে একটি দ্বিতীয় তলা ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু নির্মাণ ফান্ডে কোন অর্থ মজুত ছিল না। অথচ প্রয়োজন ছিল পৌনে তিন লাখ রূপী। এমন সময় হযরত র. এর মুহিব্বীনদের মধ্য থেকে একজন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর সাথে একজন অপরিচিত লোকও ছিলেন। কথায় কথায় আলোচনা হল। পরদিন সেই অপরিচিত লোকটি সকাল সকাল হযরতের দৌলতখানায় উপস্থিত হয়ে দরজায় কড়া নাড়েন।

ভাই খালেদ আহমদ বিন্নুরী দরজার গিয়ে দেখেন এবং ফিরে এসে বলেন, একজন মুসাফির ধরনের লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। হযরত র. তাকে ভেতরে আসার জন্য বললে লোকটি প্যান্টের পকেট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার রূপী বের করে নির্মাণ ফান্ডে দান করেন এবং পরদিন আরও অধিক অর্থ নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। অতএব, পরদিন সোয়া দু'লাখ রূপী তাঁর খেদমতে পেশ করেন। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা ছাত্রাবাস নির্মাণের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করেন। এরপরে লোকটি হযরতের এমন যে ভক্ত হয়ে যায় যা বর্ণনাতীত।

তাই হযরত র. বলতেন, দু'টি কথার ওপর আমার পূর্ণ ইয়াকীন রয়েছে এবং তার ওপরই আমার বিশ্বাস। একটি হল এই, মাল-দৌলতের সকল ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলার কবজায় আছে। আর দ্বিতীয় কথা হল, বনী আদমের অন্তরও আল্লাহ তাআলার হাতে রয়েছে। যদি আমরা ইখলাসের সাথে কাজ করি তখন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তর আপনাআপনি আমাদের অভিমুখী করে স্বীয় ভাণ্ডারসমূহ থেকে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের কোন মানুষের

তোষামোদ করার প্রয়োজন নেই। তাই যে প্রয়োজনই আমাদের আসুক আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে বলি এবং তার কাছেই সাহায্য চাই। তিনি এমন স্থান থেকে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, যা আমাদের ধারণাই হয় না। অতএব, কেন আমরা মানুষের কাছে হাত পাতব কিংবা খোশামোদ করব? আল্লাহ তাআলার সাথে সেই প্রবল সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি বলতেন, আমার কাছে হযরত সিদ্দীক আকবার রা. এর– এই বাক্যটি খুব বেশি পছন্দনীয় এবং তার ওপরই আমার আমল أسمعت من ناجيت।

ঘটনাটি হল এই, একদিন নবী করীম সা. শেষ রাতে ওঠে সাহাবায়ে কেরাম রা. এর– ইবাদতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। সাইয়েদুনা হযরত সিদ্দীক আকবার, সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারুক, সাইয়েদুনা হযরত বেলাল প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রা. কে ইবাদতরত অবস্থায় দেখেন। প্রত্যেকের ইবাদতের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কে দেখলেন, তিনি নিতান্ত আস্তে আওয়াজে কুরআন মজীদ পড়ছিলেন। সকাল বেলা সিদ্দীক আকবার রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন আস্তে আস্তে পড়ছিলেন? তিনি উত্তর করলেন, أسمعت من نـاجيت অর্থাৎ যার সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলাম, (কানাকানি করছিলাম) তাকেই শুনাচ্ছিলাম। তাই আমাদের হযরত র. একথাই বলতেন যে, আমরা যার জন্য এসব কিছু করছি তাঁকেই আমরা অবস্থা অবগত করি এবং তাঁর কাছেই আমরা প্রার্থনা করি। অন্য কারো সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? খোদায়ী সাহায্যের প্রতি এমন দৃঢ় ইয়াকীন ও ভরসা আর খ্যাতির প্রতি বিমুখতা ও ঘৃণা পোষণ করার কারণে হযরত র. খ্যাতি ও প্রচার-প্রচারণার যত মাধ্যম রয়েছে তা থেকে কেবল পরহেজই করেননি; বরং তাকে এখলাছ ও খোদাভীরুতার বাস্তবিক পরিপন্থী মনে করতেন।

তাই না কখনো ফারেগ ছাত্রদের দস্তারবন্দী ও সনদ বিতরণের নামে, বুখারী শরীফ খতমের নামে কখনও বার্ষিক-অবার্ষিক কোন সম্মেলন করেন, আর না মাদরাসার কোন পরিচিতি কিংবা চাঁদার বিবরণ প্রকাশ করেন। আর না কোন বিজ্ঞপ্তি কিংবা চাঁদার আবেদন প্রকাশ করেন। না মাদরাসায় কোন চাঁদা সংগ্রাহক নিয়োগ দেন। এটি মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়ার বিস্ময়কর এক বিশেষত্ব। তিনি বলতেন, আমরা যার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি তাঁর সবকিছু জানা আছে। তিনি নিজেই যখন যেভাবে ইচ্ছা করবেন, সরঞ্জাম ও উপকরণ সৃষ্টি করে দিবেন। তিনি আরও বলতেন, আমরা কেবল সঠিক কাজ করার জন্যই বাধ্য। যদি সঠিকভাবে মাদরাসা চালানো সম্ভব না হয়, তবে তা বন্ধ করে

দেব। আমরা দীনের কোন ঠিকাদার নই যে, (সহীহ বা গায়রে সহীহ) সঠিক কিংবা বেঠিক, জায়েয কিংবা নাজায়েয যেভাবেই সম্ভব মাদরাসা চালু রাখব। আমরা বেঠিক ও নাজায়েয পন্থা অবলম্বনে মাদরাসা চালু রাখার চেয়ে বন্ধ করে দেয়া উত্তম বরং পরকালের ধরপাকড়ের হিসেবে আবশ্যক মনে করি।

কষ্টসহিষ্ণু নীতিমালা এবং নেহায়েত বুযুর্গী ও সতর্কতা

মাদরাসার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতিমালা ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, গায়ের যাকাতের সে সব অর্থও কেবল শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও গুরুত্বপূর্ণ দরসী প্রয়োজনাদি পূরণে ব্যবহৃত হবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ফান্ডের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামে অর্থ আসবে না ততক্ষণ তাতে ব্যয় হবে না। সে জন্যেই সকল আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম, দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা, বাইরে বসার জন্য চেয়ার, সোফা, মেঝেয় বিছানোর জন্য গালিচা ইত্যাদিও জেনারেল ফান্ডের টাকা থেকে কেনা হয়নি। যেমনটি প্রথমে জানা গেছে।

প্রথম দিকে আসরের পর হযরত র. এর- মুহিব্বীন ও শিক্ষকরা তাঁর খেদমতে সাক্ষাতের জন্যে আসতেন এবং বাইরে তার সাথে খাটের উপরই বসতেন। অনেক সময় খাটে সংকুলান হতো না। এই অবস্থাদৃষ্টে একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি দু'তিনটি বেঞ্চ মাদরাসার জন্যে বানিয়ে দেয়। সে সময়েরই একটি ঘটনা। কুয়েত সরকার তদঞ্চলে আরবী শিখানোর জন্যে একটি আরবী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে স্কুলটি যথাযথ উপকারী ও ফলদায়ক না হওয়ার কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। স্কুলের সাজ-সরঞ্জাম তথা টেবিল, সোফা, চেয়ার পাখা প্রভৃতির ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিল। এরই মধ্যে তারা হযরত মাওলানা র. এর- সাথে সাক্ষাতের জন্য মাদরাসায় তাশরীফ নিয়ে যান। মাদরাসা দেখে তারা খুব সন্তুষ্ট হন। একটি কামরা যেখানে তিনি বসতেন, সেখানে তাদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদেরকে সেসব বেঞ্চে বসতে দেন।

গরমকাল ছিল। কামরায় পাখারও ব্যবস্থা ছিল না। তারা মাদরাসার বর্তমান কার্যক্রম এবং মাওলানা র. এর- ভবিষ্যত পরিকল্পনা শুনে স্বতঃস্ফুর্ত মনে বন্ধ হওয়া স্কুলের সাজ-সরঞ্জাম মাদরাসার জন্য দেয়ার প্রস্তাব করলেন। হযরত র. তাকে গায়েবী সাহায্য মনে করে কবুল করে নিলেন। এভাবে মাদরাসার জন্য বহু সংখ্যক চেয়ার, ডেস্ক, শ্রেণীকক্ষের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, দপ্তরের জন্য সোফা ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দেন। প্রথমবারের মত এবারই মাদরাসা কিছু আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম পেয়ে যায়। এরপর দরজা খুলে যায়। হযরত মাওলানার স্বচ্ছল মুহিব্বীনরা আসতেন এবং যে জিনিসের অভাব অনুভব করতেন তার ব্যবস্থা করে দিতেন। এভাবে কুতুবখানা এবং দারুত তাসনীফ এর- সকল

মূল্যবান ও শানদার আলমারি, পাখা, ঘড়ি, দারুল হাদীসের আজীমুশ্শান হলের গালিচা, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি আল্লাহ তাআলা মাদরাসাকে দান করেন।

এমনি অবস্থার প্রাথমিক যুগের কথা। মাদরাসার দপ্তরে পাখা ছিল না। গরমকাল ছিল। একদিন দপ্তরে হযরত উপস্থিত ছিলেন। মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ হাজী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব মরহুমও কোন কাজে দপ্তরে আসেন। দপ্তরে পাখার ব্যবস্থা নেই- এ দৃশ্য দেখে তিনি বলতে শুরু করেন, গায়রে যাকাত ফান্ড থেকে দপ্তরের জন্যেও একটি পাখা কেনা দরকার। হযরত র. বললেন, হাজী সাহেব! আমি অর্ধেক টাকা আমার পকেট থেকে দিচ্ছি এবং বাকী অর্ধেক আপনি দেন। দপ্তরের পাখা এসে যাবে।

উদ্দেশ্য ছিল- আমাদের বিধি অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামে অর্থ আসবে না ততক্ষণ পাখাও আসতে পারে না। ঘটনাক্রমে সে সময় মাওলানার একজন মুখলিস দোস্তও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝে আবেদন করলেন, আমাকে যেন এই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ দেয়া হয়। যাতে আমি দপ্তরের জন্য একটি পাখা কিনে আনতে পারি। এ ধরনের শত শত ঘটনা রয়েছে যে, হযরত মাওলানা র. এর– ভক্ত অনুরক্তরা নিজে নিজে এসে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও অভাব অনুভব করতেন এবং তার ব্যবস্থা করে দিতেন। আর সেটাকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের পুঁজি মনে করতেন।

অন্য একটি বিস্ময়কর ও বিরল নীতি এও ছিল যে, মাদরাসার অর্থফান্ডে মেহমানদের জন্যে কোন খাত ছিল না। মেহমানদের ব্যয়ভার হযরত নিজেই বহন করতেন। অনুরূপভাবে ডাক খরচও কোন সময় মাদরাসা থেকে নেননি। তিনি বলতেন, আমরা এ সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে বিবিধ ও আসা-যাওয়ার ভাড়ারও কোন ফান্ড ছিল না। মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ার পয়সাও সেসব খাতে ব্যয় হত না। বরং সেসব নামে মাদরাসায় কোন ফান্ডই ছিল না। আসা-যাওয়ার ভাড়ার জন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, যখনই মাদরাসার কোন কাজে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত তখন সেখানে নিজের কোন না কোন ব্যক্তিগত কাজ বের করে নিতেন এবং নিজের কাজকে মূল কাজ ও মাদরাসার কাজকে প্রাসঙ্গিক কাজ বানিয়ে ভাড়া নিজের পকেট থেকে আদায় করতেন। এজন্যে হযরতওয়ালা মাদরাসার জন্যে কোন গাড়ি কিনেননি। কেননা, গাড়ির মূল্য, তেল খরচ, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদির ভার মাদরাসার ওপর পড়বে এবং নিজের ও অন্যদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাবধানতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তা থেকে বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব। অথচ যদি হযরত র. ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর একটি মাত্র ইঙ্গিতে বহু গাড়ি মাদরাসার জন্যে বিনামূল্যে পাওয়া যেত।

কিছু মুখলিস বান্দা মাদরাসার জন্যে গাড়ি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত র. তা মঞ্জুর করেনি। অনেক সময় কিছু কিছু মুহিব্বীন অনুনয়-বিনয় করতেন এবং বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরতেন। তখন হযরত মাওলানা র. হেসে বলতেন, বাজারে যত টেক্সী সবসময় প্রস্তুত থাকে- তাতো আমাদেরই। যখন ইচ্ছা ডেকে নাও। টেক্সী হাজির হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বে মাদরাসার জন্যে গাড়ি কিনে পরকালে জবাবদিহিতার বোঝা মাথায় নেয়ার কি বা প্রয়োজন? তিনি আরও বলতেন। আমরা তো চাই গাড়িও ফ্রি হবে এবং ড্রাইভারও।

অতএব, শেষদিকে আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানার এই বাসনাও পূর্ণ করেন। কিছু মুখলিস বান্দা প্রয়োজনের সময় নিজেদের গাড়ি এনে নিজেরাই ড্রাইভারীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং হযরতের এই খেদমতকে তারা নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন।

উদার মানসিকতা, পরোপকারিতা ও আত্মগোপনের বেনজীর ঘটনাবলী

অনুরূপভাবে হযরত মাওলানা র. এর– নিষ্ঠা, উদারতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি তাঁর সে সব উন্নত গুণাবলীর অন্তর্গত, যা না কেবল মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ার চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এক এক করে প্রকাশ পেয়েছে, বরং তাকে নিয়ে প্রকাশিত স্মরণিকার প্রত্যেক প্রবন্ধকারের রচনায় এই উন্নত গুণাবলী মধ্যাহ্নে সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে এমন কিছু বেনজীর ঘটনাবলী রয়েছে, যা প্রকাশ না করাকে হযরতের হক নষ্ট করা বলা যেতে পারে।

১. নিউটাউনে মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর প্রথম বছর নেহায়েত অসহায়তা, দরিদ্রতা ও টানাপোড়েনের যুগ ছিল। সে সময় তিনি যে পরিমাণ চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং যে ধরনের বিপদ আপদের তিনি মোকাবেলা করেছেন তা আপনারা ইতোপূর্বেও পড়েছেন। তার পরোপকারিতা ও বিনয়ের এমন অবস্থা ছিল যে, 'আলিফ' থেকে 'ইয়া' পর্যন্ত ছোট বড় মাদরাসার সকল কাজ তিনি নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন। অথচ মাদরাসার মুহতামিম বানান হযরত হাজী মুহাম্মাদ খলীল সাহেব র.কে। আর তা সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁর পূতঃপবিত্রতা, নিয়তের পরিশুদ্ধতা ও খোদাভীরুতার কারণে নিজের কীর্তিকে গোপন করার উদ্দেশ্যে। নতুবা ঘরে-বাইরের সকলেই জানতেন যে, মুহতামিম প্রকৃতপক্ষে হযরত মাওলানা নিজেই।
২. মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছর যখন মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস শুরু হয় এবং শিক্ষক বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তিনি তাঁর আহলে ইলম সাথীদের মধ্য থেকে হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব র. কে

মাদরাসায় আনেন এবং তাকেই সদরে মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস নিযুক্ত করেন। বুখারী শরীফ পড়াতে দেন। অথচ সে যুগেও হযরত র. এর– দরসে বুখারীর খ্যাতি ছিল এবং সকল আহলে ইলম তা স্বীকার করতেন। তা ছিল হযরত র. এর– এখলাস ও বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩. যখন মাওলানা র. এর– খোদাভীরুতা, নিষ্ঠা ও নেক নিয়তের কারণে আল্লাহ তাআলা আপন মহিমা ও দয়ায় মাদরাসার ভেতর-বাহির, বস্তুগত-অবস্তুগত সকল সৌন্দর্যকে উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দেন এবং এই মাদরাসা না কেবল পাকিস্তান, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান গরিমায় বেনজীর বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ্যে প্রকাশ পায়, তখন কিছু খ্যাতি লিপ্সু ও প্রবৃত্তিপূজারী লোক চাইলেন এই মহান দীনী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে নিজেদের নাম জুড়ে দিতে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত র.কে এত বড় হিম্মত ও এত উন্নত মন দান করেছিলেন এবং সুনাম ও খ্যাতির প্রতি এত নির্লিপ্ত বানিয়ে ছিলেন, যার অনুমান এ থেকে করুন যে, যখন তাঁর সামনে এ ধরনের কথাবার্তা আলোচনা হয় তখন তিনি নিতান্ত প্রশান্তি ও দৃঢ়তার সাথে বলতেন, "যদি কেউ নিজের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে তুষ্টি লাভ করে তবে তাকে তা করতে দাও। আমরা তো যা কিছু করেছি আল্লাহর জন্যই করেছি।"

সুবহানাল্লাহ! কতই না মহান এই বিনয়! কতই না মহান এই উদারতা! কতই না মহান এই নিষ্ঠা, যা সুনাম ও খ্যাতির বিন্দু বিস্বর্গ হতেও পবিত্র। আর কতই না মহান এই লিল্লাহিয়াত ও তা'আল্লুক মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক)। এটিই ছিল তার কারণ- হযরত মাওলানা র. এটিও পছন্দ করতেন না যে, তাঁকে মুহতামিম কিংবা সদরে মুদাররিস কিংবা শায়খুল হাদীস বলা কিংবা লেখা হোক। তিনি বলতেন, আমি এই মাদরাসা এজন্যে প্রতিষ্ঠা করিনি যে, আমাকে মুহতামিম কিংবা শায়খুল হাদীস বলা হবে। উত্তেজিত হয়ে তিনি কখনো বলতেন, এই ধারণার ওপর অভিশাপ। অতঃপর বলতেন, যদি কেউ মাদরাসা পরিচালনার ভার ও বুখারী শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব আপন জিম্মায় নিয়ে নেয় তবে আমি খুশি হব। আর আমি একজন সাধারণ খাদেমের ন্যায় মাদরাসার তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কাজ করতেও লজ্জাবোধ করব না।

মাদরাসার শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক এবং আচার-আচরণ

মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে তিনি ভাইয়ের মত সম্পর্ক রাখতেন। বিনয় ও কোমলতার পরিচায়ক ভ্রাতৃস্বরূপ আচরণ করতেন। তাঁর কাছে ছোট-বড় ও উঁচু-নিচুর কোন প্রভেদ ছিল না। বিভিন্ন ঘরোয়া পরামর্শ সভায় নবীন শিক্ষকদের মতামতকেও সবিশেষ গ্রাহ্য করার বিরল মানসিকতাই যার বাস্তব

প্রমাণ। মাদরাসার প্রায় শিক্ষকই তাঁর হাতে গড়া ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার এমন হয়েছে যে, নিজের মতের বিপরীতে গুটি কয়েক তরুণ শিক্ষকের মতকেই প্রধ্যান্য দিয়েছেন। হযরতের সীমাহীন স্নেহ আমাকে এতটা বেয়াড়া বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর মত মহৎ ব্যক্তিত্বের মতের বিপরীতে মত দেয়ার মত দুঃসাহসও দেখাতাম কিন্তু সচ্চরিত্র ও মহানুভবতার এ মহান প্রতিচ্ছবি সেদিকে দৃষ্টিপাতই করতেন না। কদাচিৎ সাময়িক রাগ করলেও রাগ প্রশমিত হওয়া মাত্র বিপরীত মতকে সাদরে গ্রহণ করতেন।

হযরতের তাকওয়া ও তাআল্লুক মাআল্লার প্রভাবে মাদরাসার শুরু থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিরাজমান রয়েছে এবং তারা কখনো পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপে আক্রান্ত হননি। বর্তমানে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর দুআর বরকতে পূর্বোক্ত চিত্রপটে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তাই সবাই একযোগে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা হযরতের হাতে গড়া বাগানের সেবা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় করেছেন তাঁর অবর্তমানেও করবেন। যে সব মূলনীতির আলোকে তিনি মাদরাসা পরিচালনা করতেন সেই মূলনীতির ভিত্তিতেই মাদরাসা পরিচালনা করবেন। হযরত মাওলানা মাদরাসার সকল শিক্ষক-কর্মচারীর সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে, কোন শিক্ষক কখনো অনুভব করতে পারেনি, তিনি কারো অধীনে চাকরি করেন। তিনি বলতেন, আমাদের দৃষ্টান্ত মেশিনের যন্ত্রাংশের ন্যায়, যার ছোট-বড় সব অংশই সমান গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি এও বলতেন, আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী, যাকে তীরে পৌঁছানো আমাদের সবার দায়িত্ব।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনের গুরুত্ব

মাদরাসার বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে ছাত্রদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি চরিত্র গঠনের গুরুত্বের প্রতি তিনি কতটা জোর দিতেন তার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলতেন, শিক্ষকবৃন্দ যেভাবে ছাত্রদেরকে কিতাবাদি শিক্ষা দেয়া নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন তেমনি তাদের সঠিক দীক্ষাদানের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া দরকার এবং পাঠদানকালে আমল-আখলাকের পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উপদেশ দেয়া উচিত। এও বলতেন, আমল-আখলাকই আসল বিষয়। এতদ্ব্যতীত ইলম একেবারে নিরর্থক। তিনি আরো বলতেন, একজন দুর্বল মেধার আমলওয়ালা চরিত্রবান ছাত্র আমার কাছে আদরনীয়, কিন্তু বেআমল মেধাবী ছাত্র আদরনীয় নয়। তাই তিনি ছাত্রদের চরিত্র গঠনমূলক অনেক আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং সে কানুন কঠিনভাবে বাস্তবায়নও করা হতো। নামাজের জামাতের খুব গুরুত্ব দেয়া হতো। ফজরের

আযানের অব্যবহিত পরেই ছাত্রাবাস নিয়ন্ত্রকগণ সকল ছাত্রকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন। হাঁটুর ব্যথাজনিত কারণে সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায়শঃ হযরত নিজেই ছাত্রদের রুমে রুমে গিয়ে ডেকে দিতেন। আযানের পরেও যাকে শোয়াবস্থায় দেখতেন তার ওপর ভীষণ রাগ করতেন। এ ধরনের ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য হুশিয়ার করে দিতেন।

তিনি বলতেন, যখন ফজরের নামাযের জন্য বের হই এবং অযুখানায়, মসজিদে অধিক সংখ্যক ছাত্রদের দেখতে পাই, আমার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। এর ব্যতিক্রম দেখলে ভীষণ আফসোস হয়। মুখ দিয়ে انا لله و انا اليه راجعــــون ধ্বনি বেরিয়ে আসে এবং (দৈহিক কারণে) অক্ষমতা সত্ত্বেও নামাযে অবহেলাকারীদের কামরায় গিয়ে খুব প্রহার করতে ইচ্ছে করে। সর্বদা তিনি এ ব্যাপারে জোর দিতেন যে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে যেন ইলম শেখা না হয়। শিক্ষাবর্ষের সূচনালগ্নে সকল ছাত্রকে সমবেত করে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রদের অঙ্গীকার নিতেন এবং ইলমে দীনের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, যেহেতু এটি ইলমে নববী তাই কেবলমাত্র আল্লাহকে খুশি করার নিমিত্তেই এটি শিক্ষা করো এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের দেখানো পথে চলার প্রতিজ্ঞা করো আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহই দিবেন। আর যেহেতু এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলম সেহেতু এ পথে কষ্ট, বিড়ম্বনা সহ্য করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিনি বলতেন, আমরা এ মাদরাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রতিষ্ঠা করেছি, আমরা চাই ছাত্ররা শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মানসেই এই ইলম শিক্ষা করুক। যদি কারো দুনিয়াবী কোন গরজ থাকে, চাই সার্টিফিকেটের, পদের, নামের যে কোন উদ্দেশ্যই হোক, তবে দোহাই খোদার সে যেন এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায়। এখানে থাকতে হলে দীনের সিপাহী হবার শপথ নিতে হবে। হাত উঁচিয়ে এ ব্যাপারে ছাত্রদের অঙ্গিকার নিতেন এবং বলতেন, আমরা সংখ্যা বাড়ানোর প্রত্যাশী নই, আমরা চাই অল্প হলেও কাজের লোক, সুযোগ্য ব্যক্তিই তৈরি হোক। এ কারণেই ভর্তি পরীক্ষার সময় এসব বিষয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো, অসংখ্য ভর্তিচ্ছু ছাত্রের মধ্য হতে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে ভর্তি করা হতো।

ইদানীং সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, মাদরাসায় ছাত্রদের কিছু কাজ শেখানো উচিত, যেন শিক্ষা সমাপনের পর অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার না হয়। আধুনিকমনা লোকেরা ফলাও করে প্রচার করে, আলেমদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। একবার ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাসউদ সাহেব মাদরাসা পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের কারিগরী

প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন। এর জবাবে হযরত বলেন, আমরা দুনিয়া কামানোর চিন্তাকে দাফন করতে চাই। আমরা চাই তালেবে ইলমরা শুধু আল্লাহর দীনের সিপাহী হিসেবে গড়ে উঠুক। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যের কল্পনাও আমাদের মনে উদয় হয় না। আল্লাহ তাআলার ওপর আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা আছে, তিনি আমাদের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন ছাড়াই তাঁর দীনের খেদমত নিবেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য করাচীকে নির্বাচনের কারণ

এই দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু ইলমে দীনের শিক্ষা বিস্তারই নয় বরং ক্রমবর্ধমান ধর্মহীনতা, নাস্তিক্যবাদের চেতনা মোকাবেলার কেন্দ্র স্থাপনও এর লক্ষ্য। বাইয়্যিনাত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছে। তার তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর অদ্যাবধি তাঁর স্মরণিকা হয়ে একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়ে আসছে, আগামীতেও প্রকাশ হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

যাহোক এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি এমন এক কেন্দ্রীয় স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন যেখান থেকে ধর্মহীনতা, নাস্তিক্যবাদ গজিয়ে উঠছিল এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। যেন এই নতুন ফেতনার মূলোৎপাটন সময়মত সম্ভব হয়। আর বলাই বাহুল্য যে, এর জন্য করাচীর চেয়ে উত্তম জায়গা দ্বিতীয়টি হতে পারে না। এটি একটি আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হয়েছে এবং তৎকালে পাকিস্তানের রাজধানীও ছিল।

হযরত করাচীতে ইদারা কায়েমের ইচ্ছে করলে কেউ কেউ তাঁকে পত্র মারফত লিখেন, আপনি এ দীনী প্রতিষ্ঠানটি দেশের মধ্যবর্তী কোন শহর; যেমন- লাহোর, মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি ইত্যাদি কোন শহরে, যেখানে চারদিক থেকে সহজে ছাত্ররা এসে পৌঁছতে পারে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করুন। হযরত জবাব দেন, করাচী হলো আন্তর্জাতিক নগরী রাজধানী হওয়ার পাশাপাশি সকল ফিতনার সূতিকাগারও বটে। তাই আমি এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করছি।

মাদরাসার ছয় বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে লিখেন, এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড করাচীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে জাল ক্রমবিস্তার লাভ করছে, বিভিন্ন শক্তি যেভাবে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তৃত করার ফন্দি ফিকিরে লিপ্ত হয়েছে তাতে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এদিকে নজর না দেয় তবে আমাদের অন্তরের ধন তথা ইসলামের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। ইতোপূর্বে যেমন আলোচনা হয়েছে, মাদরাসার সূচনা হয়েছিল নিতান্ত দারিদ্র্য ও অবলম্বনহীনতার মধ্য দিয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনায় হযরত স্বয়ং বলেন,

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঐসব উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে ৩ মুহররম ১৩৭৩ হিজরীতে মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া উদ্বোধন করা হয়। থাকার জায়গা ছিল না, কিতাবাদি ছিল না, ছিল না শূরা কমিটি, চাঁদা উঠানোর জন্য কোন কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়নি। সাহায্যের আবেদন করা হয়নি সংবাদ মাধ্যম বা প্রচারপত্রের মাধ্যমে। বাকিতে এক হাজার টাকার কিতাব খরিদ করা হয়। ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় বহনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হয়।

হযরত মাওলানা সমকালীন প্রচার-প্রচারণার জগৎ থেকে দূরে নির্জনে দীনের শির উঁচু করার সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যদি নাম ছাড়া প্রতিষ্ঠান চলত তবে এ প্রতিষ্ঠানের কোন নামই রাখতাম না। যেহেতু এটা অকল্পনীয় তাই প্রাথমিকভাবে সাদামাটা একটি নাম তথা 'মাদরাসায়ে আরাবিয়া' রাখা হয়। ঘটনাক্রমে কুয়েত সরকারের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত একটি স্কুলের নামও ছিল মাদরাসায়ে আরাবিয়া। যেখানে আরবী ভাষা শেখানো হত। সেটিও ছিল একই এলাকাতেই, একই এলাকায় অভিন্ন নামে দুটি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ায় ডাক এবং অন্যান্য যোগাযোগ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানের চিঠি ওখানে, ওখানকার বার্তা এখানে আসতো। এ বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য উক্ত নামের সাথে ইসলামিয়া শব্দ যোগ করে দেয়া হয় এবং পুরো নাম মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়া নির্ধারণ করা হয়। দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ এ নামেই পরিচালিত হয়ে আসছে। অথচ আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী এ দীনী প্রতিষ্ঠান মাদরাসা নয় বরং বর্তমানে এটি একটি বিরাট জামেয়ার (বিশ্ববিদ্যালয়) রূপ ধারণ করেছে।

একবার আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি শাইখ আব্দুল হালিম মাহমুদ মাদরাসা পরিদর্শনে এসে এর সকল বিভাগ ও উচ্চতর গবেষণা শাখাসমূহ দেখে বলেছিলেন, আরে! এটা তো মাদরাসা নয়। এটি একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়।

হযরত মরহুমকে বারবার নাম পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তিনি এতে সাড়া দেননি বা উৎসাহ দেখাননি। বিশেষতঃ নামের কারণে বিদেশের মাটিতে মাদরাসার প্রভূত ক্ষতি হচ্ছিল তবুও তিনি নাম পরিবর্তনে রাজি হননি। উল্টো আমাদের প্রবোধ দিয়ে বলতেন, নামই সব নয়। যার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা তিনি সব জানেন। মানুষ যদি এটাকে মাদরাসা (প্রাইমারী) ভাবে তাতে কি অসুবিধা? পরিশেষে মাদরাসার নির্বাহী ও শিক্ষা কমিটি একযোগে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অনেক কষ্টে হযরতকে রাজি করাতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর মাদরাসার নাম হয়, জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া।

'হযরত মরহুম 'জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঃ কিছু কথা' শীর্ষক প্রসপেক্টাসের ভূমিকায় লিখেন, এখানে উল্লেখ্য, আমি চেয়েছিলাম এই প্রতিষ্ঠান তার সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যাবলী, যা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে দাঁড় করিয়েছে এবং এসব বিদ্যায় সীমিত না থেকে বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে; সত্ত্বেও এর নামকরণে বিনয়ের আশ্রয় নেব এবং এতে আড়ম্বর বা জাঁকজমক থাকবে না। তাই সূচনালগ্নে এর নাম রেখেছিলাম মাদরাসা আরাবিয়া। যদি নাম ছাড়া কাজ চলত তবে আমি এর নামই দিতাম না। হযরত মাওলানার বিবরণের আলোকে আপনারা জেনেছেন, মাদরাসার সূচনা হয়েছিল নিতান্ত অবলম্বনহীনতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু হযরতের নিষ্ঠা ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের বরকতে অদৃশ্য আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যেও পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে যায়।

বর্তমানে আল্লাহর বিশেষ রহমতে, মরহুমের ইখলাসের বরকতে মাদরাসায় গড়ে উঠেছে বিশাল জৌলুসপূর্ণ কত ইমারত। সকল শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীকক্ষ, ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য ছাত্রাবাস, স্টাফ কোয়ার্টার। যেখানে রয়েছে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের চুলা, ওয়াটার কুলারসহ যাবতীয় আধুনিক সুবিধাদি। আছে তাহফিজুল কুরআন থেকে তাখাচ্ছুস তথা প্রাইমারী থেকে হায়ার লেবেল পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা হযরতের ইখলাসের বরকতে প্রতিষ্ঠানটিকে এমন জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন, যার নজীর মেলা ভার। একদিকে প্রচার বিমূখ হওয়ার কারণে আশপাশ এলাকার জনগণ ছিল মাদরাসা সম্পর্কে বেখবর। অপরদিকে জনপ্রিয়তার এ চিত্র ছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ইলম পিপাসু ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচারে ত্যাক্ত-অতিষ্ট লোকেরা জ্ঞান অন্বেষণ ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে ভীড় করছিল। একদিকে দেখা যেত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসা ছাত্ররা জ্ঞান আহরণে বিভোর, অপরদিকে দেখা যেত বহির্বিশ্ব থেকে আসা ছাত্ররা জ্ঞানের বাগিচায় বিচরণে মশগুল। এক অপূর্ব দৃশ্য!

স্বল্পকালের মধ্যেই প্রায় ছয় শতাধিক ওলামায়ে কেরাম শিক্ষা সমাপন করে দেশে-বিদেশে দীনের সেবায় নিয়োজিত হন। তন্মধ্যে দেড়শ আলেম আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, মালয়েশিয়া, আরবের বিভিন্ন রাষ্ট্রসহ বিশ্বের নানান দেশে ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। মরহুম হযরত বলতেন, দীনী মাদরাসার ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই যেখানে, আমেকিার শ্বেতাঙ্গ, কৃষাঙ্গ নওমুসলিমদের মধ্যে কেউ আলিফ বা থেকে নিয়ে

শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই দীনী প্রতিষ্ঠানকে এই বিরল সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন যে, দুই মার্কিন নওমুসলিম এখান থেকে ইলমের ভূষণে অলংকৃত হয়ে শিক্ষা সমাপন করেছেন।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিষদ

মজলিসে শূরা এবং মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়া (বর্তমানে জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া) এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী র. এর– বিয়োগান্তক মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি জামেয়া পরিচালনা করবেন। এরা হযরত মরহুমের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত হবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে। কমিটির সদস্যরা হলেন-

১. মাওলানা মুফতী আহমাদুর রহমান।
২. মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ মুখতার।
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ বিন্নুরী।

মাওলানা মুফতী আহমাদুর রহমান সাহেব হযরত মরহুমের অসিয়ত অনুযায়ী যথারীতি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং মৌলভী মুহাম্মাদ বিন্নুরী সেসব বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন যে সব বিভাগ মরহুম তার ওপর অর্পণ করেছিলেন।

জামেয়ার বর্তমান অবস্থা

আল্লাহ তাআলা জামেয়াকে যেমন বাহ্যিক সৌন্দর্য ও দৃষ্টিনন্দন আধুনিক সুবিধাদিসহ ভবন দান করেছেন তেমনি অদৃশ্য গুণাবলী ও প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারাও ভূষিত করেছেন। শিক্ষা-দীক্ষার মান আলহামদুলিল্লাহ অনেক উঁচু মানের। সাধারণ শ্রেণীর (জামাআতের) সাথে সাথে তাখাচ্ছুছের (মাস্টার্স) ক্লাসও রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে বহু কিতাব সম্বলিত একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারও রয়েছে। 'প্রকাশনা' ও 'ইফতা'র মত সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চালু রয়েছে। বাইয়্যিনাত নামে মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এখান থেকে। এ পর্যন্ত জামেয়া থেকে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা সমাপন করে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে।

ছাত্র সংখ্যা

জামেয়ায় প্রায় সাত শতাধিক ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত আছেন। তন্মধ্যে প্রায় একশ বিদেশী ছাত্র।

বিদেশী ছাত্র

যেসব ছাত্ররা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং করছে এর সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। এখনো যেসব দেশের ছাত্র অধ্যয়নরত তার মধ্যে রয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য, আরব দেশসমূহ যেমন- সৌদি আরব, সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মারাকেশ, সোমালিয়া, উগান্ডা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইরান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ঘানা, বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জাম্বিয়া, ফিজি, ইরাক ইত্যাদি। বর্তমানেও এখানে ২৪টি দেশের নাগরিক শিক্ষারত আছে।

জামেয়ার শিক্ষাবিভাগসমূহ

বর্তমানে জামেয়ায় নিম্নোক্ত বিভাগগুলো রয়েছে -

ক) তাজবীদ ও কেরাত বিভাগ, খ) আরবী বিভাগ, গ) তাখাচ্ছুছ বিভাগ, ঘ) হিফজ বিভাগ, ঙ) মক্তব বিভাগ, চ) ই'দাদি জামাত (উর্দূ ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা)। আরবী শ্রেণীগুলোকে আধুনিক আরবীর নিয়মে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক) প্রাথমিক স্তর, খ) মাধ্যমিক স্তর, গ) উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ। প্রত্যেক অংশের শিক্ষাদানের মেয়াদ তিন বছর করে। সব মিলে নয় বছর। এর মধ্যে মিযানুস সরফ থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত দরসে নিজামীর সব কিতাব পড়ানো হয়। সিংহভাগ কিতাব আরবী ভাষায়। তার শিক্ষাদানের মাধ্যম উর্দূ। শুধু উর্দূ না জানা বিদেশী ছাত্রদের সম্পূর্ণ আরবীতে পড়ানো হয়।

ই'দাদি স্তর বা নার্সারী লেবেল

এই স্তরে প্রাথমিক ফার্সী ছাড়াও উর্দূ লিখন-পঠন শেখানো হয়। দীনীয়াতের বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এখানে স্বল্প উর্দূ জানা ও একেবারে না জানা ছাত্র বিশেষতঃ মোটেও উর্দূ না জানা বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষার মেয়াদ এক বছর। এক বছরের স্বল্প মেয়াদে তাদের ওপর এতটা মেহনত করা হয় যে, তারা প্রাথমিক ফার্সী ছাড়াও উর্দূ লিখন-পঠন ও কথনে যোগ্য হয়ে ওঠে এবং আরবী জামাতগুলোতে কোন অসুবিধার মুখোমুখি হয় না। ই'দাদি ও আরবী বিভাগে ২৪ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আর ছাত্র আছে ২৮০ জন।

তাজবীদ ও কিরাত বিভাগ

এ বিভাগের ছাত্রদেরকে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে তাজবীদের কায়দানুযায়ী মশক (অনুশীলন) করানো হয় এবং তাজবীদের কিতাবাদি পড়ানো হয়। এদের জন্য

অন্যান্য কিতাবের মত তাজবীদের স্বতন্ত্র ক্লাশ রয়েছে। এ বিভাগে দু'জন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কারী সাহেব আছেন, যাদের একজন মিশরীয়। হযরত মরহুম অত্যন্ত গুরুত্ব ও কড়াকড়ির সাথে বলতেন, তালেবে ইলমদের কুরআন পাঠ হতে হবে বিশুদ্ধ। মাখরাজ ও হরফ উচ্চারণে কোন ভুল থাকা চলবে না।

হিফজ বিভাগ

এ বিভাগে কুরআন হিফজ করতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। এখানে সাতজন শিক্ষক শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছেন। আর এতে ছাত্র সংখ্যা ১৬২ জন।

মক্তব বা নাজেরা বিভাগ

এ বিভাগে শিশুদের কায়দা ও কুরআন শরীফ নাজেরা শিক্ষা দেয়া হয়। তৎসঙ্গে নামায, ছয় কালেমা ও দীনের প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি মুখস্ত করানো হয়। এখানে রয়েছেন দু'জন শিক্ষক ও দেড়শ ছাত্র। স্কুলের ছুটিকালে নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে যায় তাই সাময়িকভাবে আরো একজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

হযরত মরহুমের সদা সর্বদা মুসলমানদের সন্তান ও আগামী প্রজন্মের দীন-ঈমান হেফাজতের বিশেষ ফিকির ছিল। সর্বদা তিনি বলতেন, যেসব বাচ্চা ছুটিকালীন সময়ে পড়তে আসে তারা আপনাদের আয়ত্তে এসেছে। এদের ওপর খুব মেহনত করা চাই। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একজন শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ জারী করতেন। বলতেন, এসব শিশু ও বালকদের কুরআন শরীফ পড়াতে হবে। নামায শিখাতে হবে, কালেমা মুখস্ত করাতে হবে এবং দীনের জরুরী বিষয়াদি ওদের মস্তিষ্কে প্রোথিত করে দিতে হবে।

তাখাচ্ছুছ বিভাগসমূহ

এ পর্যন্ত তিনটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। যথা– ক) উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, খ) উচ্চতর ফেকাহ ও গবেষণা বিভাগ এবং গ) দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

এ বিভাগগুলোতে কেবলমাত্র সেসব যোগ্য স্কলারদের ভর্তি করা হয় যারা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া তথা পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কিংবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাওরায়ে হাদীসের লিখিত পরীক্ষা হয় এমন প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের নেসাব এবং স্বতন্ত্র সিলেবাস রয়েছে। রয়েছে সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা। এসব বিভাগের শিক্ষাকাল দু'বছর। এ দু'বছর প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করানো হয়।

এরপর নির্ধারিত কোন বিষয়ে অভিসন্দর্ভ (থিসিস) লিখানো হয়। আল্লাহর শোকর এসব বিভাগের অভিজ্ঞতা আশাব্যঞ্জক ও ফলপ্রসূ। তাখাচ্ছুস করে শিক্ষার্থীরা এতটা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে যায় যে, তারা লেখক, মুহাদ্দিস, মুফতী এবং দায়ী ইলাল্লাহ এর মর্যাদাপূর্ণ পদ অলংকৃত করে। এসব তাখাচ্ছুছের ছাত্ররা অত্র জামেয়াতেও শিক্ষক, মুফতী ও গ্রন্থকারের মত দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া দেশ-বিদেশেও অনেকে দীনের বড় বড় প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।)

তাখাচ্ছুস ফি উলূমিল হাদীস

এই বিভাগের পরিচালক হযরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেব (মু. জি.) যিনি জামেয়ার একজন প্রবীণতম ও বিজ্ঞ শিক্ষক এবং ইমামুল আসর মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী র. এর অন্যতম শাগরেদ। তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী। বিশেষতঃ ইলমে হাদীস ও আরবী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। নুয়ে পড়া বার্ধক্য সত্ত্বেও রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম, বিরতিহীন মেহনতের ক্ষেত্রে তিনি উপমাহীন ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবিরাম শ্রম ও ত্যাগের ফলে বিভাগটি সফলতার মুখ দেখেছে। এখান থেকে এমন সব পণ্ডিত প্রবর তৈরি হয়েছে যারা ইলমে হাদীসের যথোচিৎ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। এই বিভাগের স্কলারগণ দেশে-বিদেশে দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকতা ও লেখালেখির প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। জামেয়াতেও এমন দু'জন ফাজেল আছেন যারা পাঠদানের খেদমত ছাড়াও প্রকাশনা বিভাগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনের এমন গুরুদায়িত্ব পালন করছেন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই যার মুখাপেক্ষী। এদের একজন মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন সাহেব। যিনি ত্বহাবী শরীফের জটিল ইবারত ও দুর্বোধ্য বক্তব্যের সহজিকরণে কাজ করে যাচ্ছেন। কাজটি যদি সমাপ্ত হয় (ইনশাআল্লাহ অবিলম্বে পূর্ণতায় পৌঁছে যাবে) তাহলে ইলমী জগতে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে।

অপরজন মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার সাহেব (যিনি মরহুমের সন্তান এবং মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য) জামে তিরমিযীর فى الباب এর تخريج এর কাজে নিযুক্ত আছেন। এই কাজ হযরত মরহুম فيما يقول الترمذى و فى الباب নামে শুরু করেছিলেন। তিনি বর্ণিত ভাইয়ের যোগ্যতা ও প্রাজ্ঞতা অনুভব করে এ কাজ তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। কাজটি যদি তিনি সমাপ্ত করতে পারেন তাহলে জ্ঞানের জগতে এটি একটি ঈর্ষণীয় সাফল্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃত হবে।

তাখাচ্ছুছ ফিল ফিকহিল ইসলামী

এ বিভাগের পরিচালক মাওলানা মুফতী ওলী হাসান সাহেব (মু. জি.) যিনি একজন উঁচু মাপের মুহাক্কিক আলিম এবং ইলমে ফিকাহে বিশেষ যোগ্যতা রাখেন। ফকীহসুলভ রুচিবোধের কারণে মরহুম হযরত তাঁকে ফকিহুল আসর উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের জগতে তাঁর সরব পদচারণা এ বিভাগকে অনেক উন্নতি ও সাফল্য এনে দিয়েছে। তিনি এমন সব মুফতী তৈরি করেছেন যারা খ্যাতিমান ফতওয়া লেখক ও ফিকহ শাস্ত্রের সফল শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন মাদরাসায় ইফতা ও অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। জামেয়ার দারুল ইফতার সাথেও তিনজন ফাজেল জড়িত রয়েছেন। তারা হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম, মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ, মাওলানা সাইদুর রহমান। মাওলানা সাইদুর রহমান সাহেব কিছু কিছু প্রশ্নের (ইসতিফতা) জবাব লেখার সাথে সাথে রেজিস্ট্রি খাতায় ফতওয়া উঠানোর দায়িত্বও পালন করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ একজন ভাল ফতওয়া লেখক। আর মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব তো ইতোমধ্যে এ অঙ্গনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। এ বিভাগে বর্তমানে আটজন ছাত্র গবেষণারত আছে।

তাখাচ্ছুছ ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ

এ বিভাগের পরিচালক মাওলানা ইসহাক সিদ্দীক নদভী সাহেব। যিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার অধ্যক্ষ ও শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি একজন উঁচু মাপের আলেম এবং অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থের প্রণেতা। উর্দূ, আরবী, ইংরেজী তিন ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাঁর ইলমী দক্ষতার কারণে এটি এক আদর্শ ও অনুসরণীয় বিভাগে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন ফাজেল তাঁর সান্নিধ্যের পরশে শুধু দাওয়াত ও প্রচারের অঙ্গনেই খেদমত করছেন না বরং সফল শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিভাগের ছাত্র মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেককে মরহুম হযরত ফিজির কিছু বন্ধুর অনুরোধে সেখানে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর শোকর তিনি সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাঁর মেহনতে ফিজির মুসলমানদের মধ্যে ইলম হাসিলের প্রেরণা ও পিপাসা সৃষ্টি হয় এবং প্রথমবারের মত ছয়জন তালিবে ইলম ফিজি থেকে জামেয়ায় পড়ার জন্য আসে। আরো অনেক ছাত্র ভর্তির আবেদন পত্র প্রেরণ করেছে। তার কারণে মুসলমানদের মাঝে দীনের প্রতি এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে যে, সেখানে আরো কিছু আলেম, ফাজেল এবং মুফতী প্রেরণের দাবী

ও অনুরোধ আসছে। অত্র জামেয়াতেও এ বিভাগের স্কলার মাওলানা রেজাউল হক সাহেব অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে এখানে দু'জন তালেবে ইলম অধ্যয়নরত আছে।

জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার পাঠ্যসূচী

জামেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে মূল বিষয় হলো, এর পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস। যার মাধ্যমে এর ফাযেলদের দীনী গতিপথ নির্ণীত হয়। আরবী শ্রেণীগুলোতে ২৪টি বিষয় ও শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে কিছু আছে মৌলিক বিষয় আর কিছু আছে এর সহায়ক। সেগুলো হচ্ছে কুরআনে কারীম, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, ফিকহে শাফেয়ী, ইলমে আকায়েদ ও ইলমে কালাম। ইলমে ফারায়েজ, তাজবীদ ও কিরাত, ছরফ, নাহু, মাআনি, বয়ান, আরবী সাহিত্য, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, উরুজ ও কাওয়াফি (বা ছন্দ প্রকরণ), মানতিক বা তর্ক শাস্ত্র, দর্শন, আরবী ইনশা, উর্দূ ভাষা ও ইংরেজী। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদানুযায়ী এসবের সাথে ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতকে যুক্ত করা হয়েছে। এ সকল বিষয় পড়ানোর জন্য উলূমে আরাবিয়ার দু'টি পাঠ্যক্রম রয়েছে। উলূমে আরাবিয়া প্রাথমিক শ্রেণীসহ দশ বছরের সিলেবাস আর শর্ট কোর্সের সিলেবাস পাঁচ বছরের।

ইউসুফ বিন্নুরী র. ও নতুন পাঠ্যসূচী

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মরহুম আরবী দীনী মাদরাসার নেসাব সংস্কারযোগ্য বলে মনে করতেন। প্রচলিত নেসাব সম্পর্কে তার মত ছিল, এটা সমকালীন সমস্যার সমাধানে, সমগ্র উম্মাহর কল্যাণ সাধনে এবং সময়ের চাহিদা পুরণে যথেষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও সংস্কার দ্বারা আধুনিক বিষয়াদি নেসাবভুক্ত করা এবং পাঠ্যের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে অপরাপর উলূমে দীনীয়ার মত ধারাবাহিক পাঠ দেয়া কখনো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও তিনি কামনা করতেন, মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক ও আলেম সমাজ সমকালীন শাস্ত্রসমূহ পড়ে দেখুক, এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করুক। যেমনটি তিনি নিজেই পাঠ করতেন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে আনন্দিত হতেন।

দীনী মাদরাসার প্রচলিত নেসাব গুরুত্ব ও যত্নের সাথে পাঠ করার মাধ্যমে এতটা যোগ্যতা অবশ্যই তৈরি হয় যার দ্বারা সে সমকালীন শাস্ত্রসমূহ পাঠে যথেষ্ঠ পরিমাণে উপকৃত হতে পারে।

হযরত মরহুম লিখেন, দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, প্রাচীন সিলেবাসের প্রকৃত পাঠক ও পরিশ্রমী সাধক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল থেকে জটিলতর গ্রন্থও বোঝার যোগ্যতা রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে

না যে, টলেমী ও পিথাগোরাসের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা বুঝতে সক্ষম ব্যক্তি যদি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও সায়েন্স পাঠ করে বুঝতে সক্ষম হয়, এর জটিলতা নিরসনে সমর্থ হয় তবে কি শামসে বাযেগা, সদরা, শরহে চুগবিনী ও শরহে ইশারাত বুঝতে সক্ষম ব্যক্তি নতুন প্রকৃতি বিদ্যা, গণিত শাস্ত্রে লিখিত কিতাবাদি বুঝতে সক্ষম নয়? অবশ্যই সক্ষম।

মোদ্দাকথা হলো, তিনি কখনো সমকালীন শাস্ত্রসমূহকে নেসাবভূক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। এটাকে তিনি ভুল আখ্যা দিতেন নতুবা তিনি নিজের পরিচালনাধীন মাদরাসায় অন্ততঃপক্ষে এর নিরীক্ষা চালাতেন। এখানে সিলেবাস সংশোধন করলে কে তাঁকে বাধা দিতে পারতো? কিন্তু তারপরও মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়ার নেসাবে সমকালীন বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করেননি। এর কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে তিনি উলূমে নববিয়া ও এর সহায়ক শাস্ত্রসমূহের সাথে সমকালীন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনা বারবার শোনাতেন, একবার ঢাকায় ওলামায়ে কেরামের বৈঠক হয়েছিল। যেখানে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুফতী শফী র. এর– মত ব্যক্তিত্বও এতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আলোচনা হয়েছিল প্রচলিত নেসাবের সাথে সমকালীন বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে। কেউ কেউ এর পক্ষে, কেউ কেউ এর বিপক্ষে মত দিলেন। হযরত র. বলেন, এ সময় আমার মনে হলো, সমকালীন বিদ্যাকে সিলেবাসভূক্ত করতে অসুবিধা কোথায়? যাহোক, বৈঠক সমাপ্ত হলো এবং মতবিরোধের কারণে আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না।

হযরত বলেন, আমি রাতের বেলা স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি মসজিদে দাঁড়ানো। সামনে একটি বিছানা, একটি চাটাই, সেখানে লেখা النجاه فى علوم المصطفى। মোস্তফার সা. এর– জ্ঞানেই মুক্তি ও সফলতা নিহিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নের মধ্যেই দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা আযান দিতে লাগলাম النجاه فى علوم المصطفى سيد السادات। (সকল নেতার মহান নেতা মোস্তফা সা. এর উলূমেই রয়েছে মুক্তি ও কামিয়াবী)। سيد السادات (নেতার নেতা) শব্দটি আমি নিজে বাড়িয়ে বলেছি। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে মন থেকে পূর্বের খেয়াল দূর হয়ে গেল এবং এ যুগেও উলূমে নবুওয়াতের মাধ্যমেই কামিয়াবী সম্ভব ও সমকালীন বিদ্যার সংযোজন নিরর্থক এ কথা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

মাসিক বাইয়্যিনাত জুমাদাস ছানি ১৩৮৪ হিজরী সংখ্যা থেকে গবেষণামূলক এক নিবন্ধের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, কিছু সংখ্যক নিভৃতচারী বুযুর্গের চেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের আরবী দীনী মাদরাসাসমূহের এক অভূতপূর্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেখানে ছোট বড় ১৭২টি মাদরাসা অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিশেষ পরীক্ষক দলের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে একই সাথে বিভিন্ন মাদরাসায় বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের বোর্ডের পক্ষ থেকে সনদও প্রদান করা হচ্ছে। ২৮, ২৯ ও ৩০ জমাদিউল উলা ১০৮৪ হিজরী মোতাবেক ৬,৭ ও ৮ অক্টোবর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মুলতানে বেফাকুল মাদারিসের উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জামেয়া ইসলামিয়া ভাওলপুরের পাঠ্যসূচী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং সকলের ঐক্যমত্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ শতাব্দীতে এ ধরনের যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে সবই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌ, মাদরাসাতুল বানাত কানপুর, জামেয়া উসমানিয়া হায়দারাবাদ, জামেয়া ইসলামিয়া দিল্লী, জামেয়া আব্বাসিয়া ভাওলপুর এ সকল প্রতিষ্ঠানেই এ পরীক্ষা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গবেষক প্রকৃতির কোন ফাযেল এসব সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়নি। (দুই একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন, সেটা ভিন্ন কথা)।

এখন প্রশ্ন হল, হযরত মাওলানা কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রত্যাশী ছিলেন? এর জবাব হযরত মাওলানা এবং তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিবর্তনের আলোকে দেয়া যেতে পারে। হযরত মাওলানা মাদরাসার প্রথম চার বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে তিনি মাদরাসার সিলেবাস ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর চয়নকৃত বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়ার নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরেছেন।

১. সমকালীন ধর্মীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতিতে সংযোজন, সংস্কার ও সংযোগ।
২. ইসলামী শিক্ষা বিশেষতঃ কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দান।
৩. ছাত্রদের মাঝে উচ্চ ইলমী যোগ্যতা তৈরির সাথে সাথে ইখলাস ও তাকওয়ার প্রাণ সঞ্চারের জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ।
৪. আরবী দীনী মাদরাসাসমূহের জন্য উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি।
৫. আরবী-উর্দূতে লেখালেখি ও বক্তব্য-খুতবার যোগ্যতা তৈরি করা।

৬. ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- নিশ্চয় এখন সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি পরিবর্তন ও আরবী ভাষা শিক্ষাকে মূল শিক্ষার সাথে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম স্তরে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৭. ৮ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন- দীনী মাদরাসায়ে আরাবিয়াতে প্রচলিত সিলেবাসে হাদীস ও ফিকহের কিছু কিতাবের ব্যতিক্রম ছাড়া সিংহভাগ কিতাবই সপ্তম হিজরী এবং তৎপরবর্তী শতাব্দীর স্মৃতির স্মারক মাত্র। এ যুগেই শুরু হয়েছিল ইলমী অধঃপতন। উম্মতের পূর্বসূরী যাদের রচনাবলীতে ছিল ইলমের সঞ্জীবনী প্রাণ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বক্তব্য, সুস্পষ্ট মাসায়েল, কায়দা-কানুন ও নিয়ম-নীতি। সে সবে ছিল না ভাবের অতি সংক্ষেপণ কিংবা নিষ্ফল আলাপন। প্রকৃতপক্ষে যে সব পাঠে মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। এসবের স্থলে এমন সব কিতাব রচিত হয়েছে যেখানে সংক্ষেপ লিখন এবং শব্দের বিশ্লেষণের প্রতিই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। সামনে গিয়ে তিনি পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের উসূলে ফিকহ সম্পর্কিত চমৎকার সব কিতাবের নাম লিখেছেন এবং ৯ম পৃষ্ঠায় পরবর্তীদের কিতাবাদির ত্রুটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

৮. ১০ম পৃষ্ঠায় গিয়ে লিখেছেন- আমরা এসব পুরনো বিদ্যা ও ইলমকে তাড়িয়ে দিতে চাই না, বরং ঐ ইলমগুলোতে সঠিক যোগ্যতা ও দক্ষতা তৈরির লক্ষ্যে আরো ভালো ভালো কিতাবাদি অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। এক কথায় আমরা মডার্নিজম নয়, ক্লাসিকালিজম চাই।

তিনি বলেন, আমার ধারণামতে আধুনিক সিলেবাসে মূল লক্ষ্যণীয় বিষয় তিনটি। যথা –

ক) সংক্ষেপকরণ। অর্থাৎ সিলেবাস হবে সংক্ষিপ্ত যা শেষ করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে না।

খ) সহজিকরণ। অর্থাৎ সিলেবাসভূক্ত কিতাবগুলোর ভাষা হবে সহজ ও প্রাঞ্জল। এতে কোন জটিলতা বা দুর্বোধ্য বিষয় থাকবে না।

গ) সংস্কার ও সংযোজন। অর্থাৎ কম গুরুত্বের বিষয় বাদ দেয়া ও আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সংযোজন করা হবে।

হযরত র. প্রত্যেকটি পয়েন্টের ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় পয়েন্টের অধীনে ১২ নং পৃষ্ঠায় নাহু ও ফিকহের কিছু কিতাবের সমালোচনা করেছেন এবং এর বিপরীতে অগ্রবর্তী ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহকে চিহ্নিত করেছেন। ৩য় পয়েন্টের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

প্রাচীন সিলেবাসে কুরআন মাজিদ, উলূমে হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, সিরাতে নববী, আদব ও ইলমে বালাগাতকে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি যতটা পেয়েছে অন্য সব বিদ্যা ও শাস্ত্র। অথচ সিলেবাসে ঐসব শাস্ত্রের গুরুত্ব হওয়া চাই সর্বাধিক। বাকী সব শাস্ত্রকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা উচিত। আরবী সাহিত্যের ভাষায় কথোপকথন, বক্তব্য প্রদান ও রচনাকে সেখানে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ সময়ের প্রয়োজন হলো ঐসব বিষয় সিলেবাসের প্রথম স্তরে থাকুক।

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা হযরতের নেসাব সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গিও সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা বুঝে আসে।

হযরতের উদ্ধৃতি থেকে পূর্ববর্তীদের স্থানে পূর্ববর্তীদের কিতাব অন্তর্ভুক্তকরণের দুটি উপকারিতা বুঝে আসে।

ক) পূর্ববর্তীদের রচনা ও বর্ণনাভঙ্গি প্রাঞ্জল, ভাবের ব্যঞ্জনা চমৎকার, বাক্যগঠনশৈলী খুব সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের রচনা জটিল ও দুর্বোধ্য।

খ) পূর্ববর্তীরা তাকওয়া ও ইখলাসের যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন পরবর্তীরা সে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম নন। অতএব পুর্ববর্তীদের কিতাব অধ্যয়নে অন্তরে উঁচু স্তরের তাকওয়া-ইখলাসের প্রাণ সঞ্চার হয়।

গ) ভাষা হিসেবেও আরবী সাহিত্যের পাঠ দেয়া হবে, যা প্রাচীন পদ্ধতির সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ আবার আধুনিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা রাখবে।

ঘ) ইলমে কুরআন, উলূমে হাদীস, সিরাতে রাসূল ও ইসলামের ইতিহাসও সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হবে।

ঙ) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পৃথক সিলেবাস থাকবে।

চ) এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করা হবে যাতে ছাত্ররা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক হবার উপযুক্ত হয়।

হযরত র. যেমন চাইতেন, তাঁর মনে যে ধরনের ইচ্ছার স্ফুরণ ঘটতো সে মোতাবেকই মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়ার কারিকুলামে সংস্কার-সংশোধন করতেন। একে ভিত্তি করেই তিনি সিলেবাস প্রণয়ন করতেন এবং অপ্রয়োজনয়ীয় বিষয়াবলী বাদ দিয়ে ধাপে ধাপে ঐসব সাবজেক্ট সংযোজন করতেন, সমকালে যার চাহিদা সমধিক ও যার গুরুত্ব ততোধিক।

এ সিলেবাসে কুরআন শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতে রাসূলের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাদিও ৫-৬ বছর পূর্বে অন্তর্ভূক্ত করা

হয়েছে। যেহেতু সিলেবাসের পূর্ণ মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে ৮ বছরের স্থানে ৯ বছর করা হয়েছে, আরবী কথোপকথন শেখানোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে মিসরী শিক্ষকদের সেবাও নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে কর্মজীবী ও ব্যস্ত লোকদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণার্থে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি সংক্ষিপ্ত নেসাব বিন্যাস করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ৪র্থ বুনিয়াদী লক্ষ্য তথা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উসূলে হাদীস ও উলূমে কুরআনের তাখাস্সুস এর সুব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহর শোকর দক্ষ ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি হচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা

ভর্তির ব্যাপারে একটি অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি হলো এখানে কেবল এমন সব ছাত্র ভর্তি করা হয় যাদের মাঝে দীনী ও ইলমী যোগ্যতা সুপ্ত থাকে। এ মর্মে বাধ্যতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয় যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ যাঁচাই-বাছাই করা হয়। কোন ধরনের ছাড় দেয়া হয় না ও সুপারিশ কবুল করা হয় না। যে কোন শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রকে আগের শ্রেণীর কিতাবাদি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ হলেই চলে না, তার ইলমী যোগ্যতা পরখ করার সাথে সাথে মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনারও খোঁজ খবর নেয়া হয়, যাতে করে শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়ের সাথে তার সংশ্লিষ্টতার তথ্যও লাভ করা যায়। আর দাওরা হাদীসে ভর্তিচ্ছুদের অতিরিক্ত লিখিত পরীক্ষাতেও অংশ গ্রহণ করতে হয়। যেসব ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারে না তাদের ভর্তি করা হয় না।

জামেয়ার গ্রন্থাগার

জামেয়ায় রয়েছে একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার। যেখানে সিলেবাস ও সিলেবাস বহির্ভূত অনেক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। পঠন ও অধ্যয়নের জন্য ছাত্র-শিক্ষকগণ এখান থেকে পছন্দমত কিতাব ধার নিতে পারেন। বাহির থেকে যারা রির্সাচ ও গবেষণার জন্য আসেন তাদেরকেও অধ্যয়নের যাবতীয় সুবিধা প্রদান করা হয়। এতে রয়েছে প্রায় ১৬ হাজার কিতাব, যার অনেকগুলো ২০/২৫ খণ্ড বিশিষ্ট।

হযরত মরহুমের গ্রন্থপ্রেমের কথা কে না জানে? অতিকষ্টে বিবিধ শাস্ত্র ও বিদ্যা সংশ্লিষ্ট দুর্লভ ও অমূল্য কিতাবাদি সংগ্রহ করেছেন। সৌদি আরব, মিশর ও ভারত থেকে কিতাব খুঁজে করাচী পর্যন্ত পৌঁছানোর তদবির করেছেন। এ নিয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ উপাখ্যান। যেখানেই কোন দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান পেতেন তা হস্তগত না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি ছিল না।

প্রকাশনা বিভাগ

এটি জামেয়ার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এক আলীশান কামরা। সরবরাহ করা হয়েছে রচনা ও সংকলনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ও রেফারেন্স গ্রন্থ। এখানে বিদ্যানুরাগী মহল ও মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিতাব রচনা করা হয়। পাক ভারতের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক রচিত বিভিন্ন পুস্তকের অনুবাদ করা হয়। উর্দূ থেকে আরবীতে, আরবী থেকে উর্দূতে। এখানে একঝাঁক দক্ষ ও সুবিজ্ঞ আলেম, কর্মরত আছেন।

ফতোয়া বিভাগ

এ বিভাগে দেশ -বিদেশ থেকে ডাক মারফত ও হাতে আসা প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়া হয়। মৌখিক প্রশ্নকারীদের উত্তরও দেয়া হয়। এছাড়া মুসলিম ভাইয়েরা ফোনে ফোনে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক লেনদেন সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। দেশ বিদেশের মুসলিমগণ এ বিভাগের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এ বিভাগের মাধ্যমে মুসলমান জনসাধারণ ঘরে বসে দীনী শিক্ষা লাভ করে থাকেন। উপরন্তু এ বিভাগ থেকে মুফতী ওলী হাসান সাহেব উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝে শরয়ী ফায়সালাও প্রদান করে থাকেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণেচ্ছুদের ইসলামে দীক্ষিত করে ফতোয়া বিভাগ থেকে ইসলামের সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

মাসিক বাইয়্যিনাত

জামেয়ার মাসিক মুখপত্র। এর ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক রচনাবলী বেশ জনপ্রিয়। এটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এতে মৌলিক ও অমৌলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়। বাতিল নির্মূলে ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে এ ম্যাগাজিন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। চাই সেটা পারভেজের হাদীস অস্বীকার, ড. ফজলুর রহমানের ধর্মহীন চিন্তা আর অভিশপ্ত গোলাম আহমদের মনগড়া মিথ্যা নবুওতের ফিতনা যাই হোক না কেন? এ ম্যাগাজিন সবারই গোমর ফাঁক করেছে। উপরন্তু সর্বযুগে সত্যের ঝাণ্ডা উচ্চে তুলে ধরার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের সুমহান কর্তব্য পালন করছে।

ছাত্রদের জন্য পালনীয় বিধি-বিধানসমূহ

ভর্তিচ্ছু প্রত্যেক ছাত্রের ভর্তি ফরমের সাথে এসব বিধি-বিধান লিখা থাকে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করার ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। বিধি-বিধানসমূহ নিম্নরূপ-

১. পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলী প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষা-দীক্ষার তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা অমান্য করার ওপর খবরদারীর পূর্ণ অধিকার রাখবেন। তাঁদের যে কোন নির্দেশনা মেনে চলা প্রত্যেক ছাত্রের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

২. যে সব কম বয়সী ছাত্র অনাবাসিক, ভর্তির সময় তাদের অভিভাবকের উপস্থিতি জরুরী। মাদরাসার নিয়মকানুন ও শিক্ষকমণ্ডলীর নির্দেশনা শ্রবণ করতঃ তারা আপন সন্তানের ব্যাপারে যত্নবান হবেন।, এর অন্যথা করলে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সময় সুযোগে মাদরাসায় এসে শিক্ষকদের কাছ থেকে আপন সন্তানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে থাকবেন।

৩. ছুটির দিনগুলোতে বিশেষভাবে সন্তানের আমল-আখলাকের তত্ত্বাবধান-করতঃ অসৎ সংশ্রব থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখবে।

৪. প্রত্যেক ছাত্রের নামাযের জামাতে উপস্থিতি অবশ্যই জরুরী। শরয়ী ওজর ব্যতীত এ ব্যাপারে অন্য কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. প্রত্যেক ছাত্রকে আমল-আখলাক, নীতি-নৈতিকতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় সলফের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। ধুমপান, পশ্চিমা স্টাইলের চুল রাখা, দাড়ি মুন্ডানো বা শরীয়ত অসমর্থিত পন্থায় ছাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাথী-বন্ধু বা মাদরাসার কর্মচারীদের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, অসংলগ্ন কথাবার্তা, অসৌজন্যমূলক আচরণ, চোগলখুরী, ছিদ্রান্বেষন, গীবত, ঠাট্টা, তামাশা ও অশালীন মস্করা করা অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ। প্রত্যেক ছাত্রের এসব বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

৬. শিক্ষকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা আন্তরিক সম্মান জ্ঞানার্জনের প্রধান শর্ত। অতএব প্রত্যেক ছাত্রের উচিত, শিক্ষকদের পরম শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। চাই তারা সরাসরি তার শিক্ষক হোক বা না হোক।

৭. ছাত্ররা আপন অভিযোগ, অনুযোগ, সমস্যা ও প্রয়োজনের ব্যাপারে শিক্ষকদের অবহিত করবে। কোন ছাত্রের অন্যায় আচরণে নিজেই এর প্রতিউত্তর ও প্রতিশোধের পন্থা পরিত্যাগ করে শিক্ষকদের শরণাপন্ন হবে।

৮. ক্লাসে অনুপস্থিতি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। অনিবার্য কোন প্রয়োজন দেখা দিলে স্বহস্তে মাদরাসায় ছুটির আবেদন করবে। অন্যের হাতে ছুটির আবেদন পত্র পাঠানো কখনো যথেষ্ট হবে না। অসুস্থতার আবেদন তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন ক্লাসে উপস্থিতি অসম্ভব হবে বা এতে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

৯. ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রদের জন্য আসর হতে মাগরিবের সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময় ছাত্রাবাসের বাইরে বের হতে ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি গ্রহণ জরুরী।

১০. যে ছাত্ররা ঘোরাফেরা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা এবং অপ্রয়োজনীয় আতিথেয়তায় মূল্যবান সময় নষ্ট করবে, সতর্কীকরণের পরও সাবধান না হলে তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে। ছাত্রাবাসে অতিথি অবস্থানের কোন সুযোগ নেই।

১১. সাক্ষাৎপ্রার্থী বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের এ কথা জানিয়ে দিবে, যাতে তাঁরা আসর হতে মাগরিবের সময় অথবা জুমার দিন সাক্ষাতে মিলিত হন।

১২. যে সমস্ত ছাত্র পড়াশোনায় অবহেলা করে, সাবধান করার পরও ফিরে না এলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

১৩. যে সকল ছাত্র লেখাপড়ার পাশাপাশি ইমামতি বা মুয়াজ্জিনের মত অন্য কোন ব্যস্ততায় মশগুল হবে, তারা মাদরাসার ছাত্রাবাসে অবস্থান ও অন্য সব সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। হ্যাঁ, তারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত না থাকলে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে তারা মাদরাসার ছাত্র বলে গণ্য হবে না।

১৪. জুমাবার গোসল আর কাপড়-চোপড় পাল্টানোর পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রের উচিত নিজের রুম, আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। ময়লা শুধু নির্দিষ্ট ডাস্টবিনেই ফেলবে। রুম, ক্লাসরুম ও আঙ্গিনা অপরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না। দেয়াল লিখনও নিষেধ। ঢিলা আর কুলুখ ছাড়া টয়লেটে যাবে না। পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করবে। প্লেট ও কাপড় ধোয়ার পর ঐ স্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে নিবে। নিজ নিজ রুমে সমস্ত আসবাবপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। মোটকথা পরিচ্ছন্নতা, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, শিষ্টতা ও ভদ্রতার আদর্শ উপমা গড়ে তুলবে।

১৫. যেহেতু মাদরাসা ছাত্রদের সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিয়েছে অতএব প্রত্যেক ছাত্রের উচিত পূর্ণ সময় একাগ্রতার সাথে জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন হওয়া। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পুরণে অন্য কোন ধান্ধায় লিপ্ত না হওয়া। মাদরাসার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন দাওয়াতে না যাওয়া।

১৬. আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময় ছাড়া সার্বক্ষণিক বিশেষতঃ রাতে ছাত্রাবাস অথবা ক্লাসরুমে অবস্থান করা জরুরী। যদি কোন সময় ছাত্রাবাসে হাজিরা নিয়ে কাউকে উপস্থিত পাওয়া না যায় তাহলে সে কঠোর শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

> আল্লাহ তায়ালার কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন হযরত র. এর- হাতে গ্রোথিত এই বাগিচার সংরক্ষণ করেন এবং তার খেদমতের জন্য আমাদের কবুল করে নেন।

এই সময় পুরো নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে যাওয়াই ওলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তাঁদের মনে রাখা উচিত, যে সম্মান তারা পাচ্ছেন তার সবই একমাত্র রাসূলে কারীম সা. এর- আনীত ধর্মের বদৌলতেই তারা পাচ্ছেন। একমাত্র আল্লাহর নির্বাচিত দীনের সাথে সংশ্লিষ্টতার বদৌলতেই মুসলমানদের হৃদয়ে এখনো আমাদের প্রতি এ শ্রদ্ধা, এ ভালবাসা। আজ ইসলামের ওপর যে কঠিন সময় এগিয়ে আসছে এহেন নাজুক মুহূর্তে ওলামায়ে কেরামের গুরু দায়িত্ব কি হওয়া উচিত? পুরো পৃথিবীর চোখ এখন তাদের ওপর নিবদ্ধ। ওলামায়ে কেরামের যে কোন ভূমিকা ইতিহাসের পাতায়, মানুষের হৃদয় মনে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

জামেয়ায় ফারুকিয়া

পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম এবং সেখানকার বেফাকুল মাদারেসের প্রধান হযরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত করাচীর বিখ্যাত মাদরাসা জামেয়ায়ে ফারুকিয়া দেখতে যাই। জামেয়া ফারুকিয়া বর্তমানে বহু খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। মাওলানা সলিমুল্লাহ খান ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার থানাভবন থেকে কিছু দূরে হযরত থানভীর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা মাছীহুল্লাহ খান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জালালাবাদের মেছবাহুল উলূম মাদরাসায় অধ্যাপনা করা কালে পাকিস্তানে হিযরত করেন এবং দারুল উলূম করাচীতে বহু বছর সুনামের সাথে অধ্যাপনায় লিপ্ত থাকেন। তিনি জামেয়া ফারুকিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে পাকিস্তানের প্রবীণ ওলামাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি মাদরাসার শায়খুল হাদীস। তাঁর দরসে বুখারীর ভাষ্য ছেপে বের হয়েছে। বেফাকুল মাদারেসের প্রধান হিসেবে বেফাককে ১টি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। আর্থিক দিক দিয়েও বেফাক নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বেফাকের নেসাবে তালীম এবং বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি দিয়েছেন। তার দুই সুযোগ্য পুত্র এ সকল কাজে তাঁকে সহায়তা করে থাকেন।

মাদরাসা থেকে আল ফারুক নামে উর্দু আরবী/ত্রৈমাসিক ইংরেজী এবং হিন্দি ভাষায় মাসিক পত্রিকা বের করা হয়। উর্দু আল ফারুক শুধু পাকিস্তানেই নয় সারা বিশ্বে নাম করেছে। ১০/১৫ টি কম্পিউটার রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসসহ বিভিন্নমুখী খেদমত জামিয়ায়ে ফারুকিয়ার মাধ্যমে আঞ্জাম নেয়া হচ্ছে। কাসেম মঞ্জিল, তৈয়ব মঞ্জিল, মাদানী মঞ্জিল নামে চারদিকে সুরম্য বিল্ডিং মাঝখানে সুন্দর সবুজ গালিচা এবং যুগের বাগান যে কোন মানুষের মন কেড়ে নেয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে হযরত মাওলানার সাথে দেখা না করে শুধু আল ফারুকের বিগত ১ বছরের কপি সংগ্রহ করে জামেয়া ফারুকিয়া হতে বিদায় হই।

জামিয়া ফারুকিয়া করাচী–এর প্রতিষ্ঠাতা
শায়খুল হাদীস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান

নাম : সলিমুল্লাহ খান।

জন্ম : ১৯২৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলার জালালাবাদ।

শিক্ষা লাভ : হযরত মাওলানা দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করেন এবং সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন।

শিক্ষকতা : ফারেগ হওয়ার পর হযরত মাওলানা মাসিহ উল্লাহ খান সাহেব প্রতিষ্ঠিত জালালাবাদের মেফতাহুল উলূম মাদরাসায় দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত দীনী খেদমত আঞ্জাম দেন।

দেশত্যাগ : ১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং এখানে এসে দারুল উলূম টেন্ডুলাইয়ার, জামেয়া দারুল উলূম করাচী ও জামেয়া দারুল উলূম ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন– এ হাদীসের দরস দান শুরু করেন।

জামিয়া ফারুকিয়া প্রতিষ্ঠা

তিনি ১৯৩৭ সালে শাহ ফয়সাল কলোনীতে জামেয়া ফারুকিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানের একটি সুপরিচিত দীনী মাদরাসা। হযরত মাওলানা এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস। জামেয়া ফারুকিয়া থেকে প্রতি বছর শত শত ছাত্র দাওরায়ে হাদীস পড়ে ফারেগ হচ্ছে। পাকিস্তানের মধ্যে এটিই একক একটি প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে একই সাথে প্রতি মাসে উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী ও আরবী মাসিক পত্রিকা নিয়মিত বের হচ্ছে। তিনি পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রবৃন্দ

হযরতের নিজ হাতে গড়া দেশ-বিদেশে অনেক ছাত্র ও যোগ্য আলেম রয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী রফী উসমানী, জাস্টিস মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী, মাওলানা মুফতী আহমাদুর রহমান র., মাওলানা ডা. হাবিবুল্লাহ মুখতার শহীদ র., মাওলানা মুফতী নেজামুদ্দীন শামজায়ী, মাওলানা মুহাম্মাদ জামশিদ, মাওলানা রাবে হাসানী নদভী (মুহতামিম দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা লাখনৌ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাক-হিন্দ ছাড়াও নরওয়ে, জার্মানী, সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, কেনিয়া, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান ও ইরানে তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছে।

রচনাবলী

১. বুখারীর উর্দু শরাহ–কাশফুল বারী আম্মা ফি সাহীহিল বুখারী।

২. মাজালিসে ইলম ও জিকর। ৩. ছদায়ে বেফাক ইত্যাদি।

মাওলানা সলিমুল্লাহ্ খান এর– একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার

এ মূল্যবান সুচিন্তিত সাক্ষাৎকারটি ১৪০৮ হিজরীতে মাসিক আল ফারুকের ইংরেজী সংস্করণের প্রথম সংখ্যার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০টি প্রশ্ন ও তার উত্তর সম্বলিত এ সাক্ষাৎকারটিতে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা সলিমুল্লাহ খান সাহেবের জীবনের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী ও অবদান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দীনী মাদরাসাসমূহের নেসাব ও ব্যবস্থাপনা এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম, নেসাব, অভিজ্ঞতার ওপর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। দীনী মাদরাসাসমূহের বর্তমান নেসাব ও ব্যবস্থাপনা এবং এর ওপর আরোপিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সুচিন্তিত জবাবও তিনি প্রদান করেছেন।

সর্বশেষে পাকিস্তানের দীনী মাদরাসাসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার পরিচিতি ও অবদান সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ সাক্ষাৎকারটি এখানে পত্রস্থ করা হল।

প্রশ্ন-১ : ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনের পর আপনি ভারতের মুজাফফরনগর জেলার জালালাবাদ মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ আট বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে আসার কারণ কি?

উত্তর : মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় আমার প্রাথমিক আরবী শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এ কারণে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনের পর শিক্ষকতার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করি। মাদরাসার মুহতামিম সাহেব আমার উস্তাদ ছিলেন। তাঁর আবদার ছিল আমি যেন সে মাদরাসায় যোগদান করি। মাদরাসাটি আমার বাড়ির কাছেই ছিল। তাই সেখানে শিক্ষকতা করা আমার জন্য সহজও ছিল। ধারণা ছিল সেখানে সহজভাবে কাজ করতে পারব। কাজ শুরু করি। মাদরাসাটি পুরাতন হলেও শিক্ষার উপায় উপকরণের দিক দিয়ে এটি প্রাথমিক অবস্থাতেই ছিল। মাদরাসায় কোন কুতুবখানা ছিল না। বোর্ডিংও ছিল না। নিয়মিত হোস্টেলও ছিল না। আট দশজন ছাত্র মাদরাসায় থাকত। তারা বাসা থেকে খাবার এনে খেত। কেউ কেউ আশেপাশের মসজিদে ইমাম, মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজ করত। মাদরাসায় কিছু কিতাব ছিল যা একটি আলমারীর দু'তাকে থাকত। সেখানেও কিছু জায়গা খালি থাকত। এ কারণে আমরা যখন সে মাদরাসায় পড়তাম, নিজেদের কিতাব নিজেরা ক্রয় করে নিতাম। বাবুর্চি রেখে খানা পাকানোর ব্যবস্থা করতাম।

আমি যখন সেখানে শিক্ষকতা শুরু করি তখন আমি যুবক। কাজের খুব আগ্রহ ছিল। রাত দিন পরিশ্রম করি। এর ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকে। মুহতামিম সাহেব মাদরাসার উন্নতির দিকে খুব একটা খেয়াল করতেন না। মাদরাসার ছাত্ররা যখন ভালভাবে পড়তে লাগল তখন কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করা হল। বোর্ডিংয়ে এর ব্যবস্থা করা হলো। লোকদের বাসা থেকে ছাত্রদের জন্য খাবার আনার ব্যবস্থা রহিত করা হলো। মাদরাসার প্রশস্ত বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলো। হোস্টেলের বারটি কামরা, একটি হলরুম এবং ক্লাসরুম নির্মাণ করা হলো। এতগুলো কাজ করার পরও মুহতামিম সাহেবের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন উৎসাহ দেয়া হলো না। তিনি মনে করতেন মাদরাসা খুব বড় করার দরকার নেই। প্রশস্ত বিল্ডিং এর– কোন প্রয়োজন নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু লেখাপড়াই যথেষ্ট। তবুও কাজকর্ম ঠিকভাবেই চলছিল। মাদরাসার অর্থনৈতিক বোঝা মুহতামিম সাহেবের কাঁধের ওপরই ছিল। এ সময় ছাত্রসংখ্যাও খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ২৫০ জন ছাত্র ছাত্রাবাস ও ক্লাসরুমসমূহে অবস্থান করছিল। শিক্ষার মান উন্নত হয়েছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর এর– শিক্ষকগণ পর্যন্ত নিজেদের ছেলেদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এ মাদরাসায় পাঠাতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষার স্তর দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কাজ খুব ভালভাবেই চলছিল। মাদরাসার প্রসিদ্ধিও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মাদরাসার পরিবেশ ছিল কোলাহলমুক্ত ও নিরিবিলি। মিফতাহুল উলূম মাদরাসাকে তখন একটি আদর্শ মাদরাসা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল। আল্লাহ পাক মাদরাসার আয়ের উপায়-উপকরণেও যথেষ্ট বরকত দিয়েছিলেন।

এ সময়ে মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের পক্ষ থেকে একজন নতুন শিক্ষক রাখা হলো। তাঁর নিয়োগের পর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়লো। নতুন শিক্ষকের সাথে পুরাতন শিক্ষকদের হৃদ্যতার অভাব দেখা দিল। এর মন্দ প্রভাব পড়ল মাদরাসার পরিবেশের ওপর। এ ব্যাপারে আমি মুহতামিম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি কার্যকর কোন ব্যবস্থা করলেন না। এ ব্যবস্থায় আমি দু'বছর কাজ করি। তারপরও অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় আমি নীরবে মাদরাসা থেকে চলে আসি। আমি খুব সতর্কতার সাথে চলে আসি। এ কারণে কোন তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি। কোন সমস্যাও সৃষ্টি হয়নি। মাদরাসার মুহতামিম ও কয়েকজন শিক্ষক যে কোন অবস্থায়ই আমার আলাদা হওয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

প্রশ্ন-২ : ভারত থেকে এসে আপনি হযরত মাওলান শাব্বীর আহমদ উসমানী র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিন্ধের দারুল উলূম টেন্ডুল্লা ইয়ারের মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তিন বছর শিক্ষকতা করার পর আপনি সে মাদরাসাও ছেড়ে দিলেন। এর কারণ কি?

উত্তর : এর কারণ এটাও ছিল যে, মুহতামিম সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে না থাকার মত ছিল। মাদরাসার অবস্থান ছিল টেন্ডুল্লা ইয়ারে। মুহতামিম সাহেব থাকতেন করাচীতে। বছরে ২/১ বার মাদরাসায় আসতেন তিনি। মুহতামিম সাহেব যাদেরকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা সে কাজের উপযুক্ত যেমন ছিলেন না, তেমনি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, অগ্রগতির ব্যাপারে তারা খুব একটা আগ্রহীও ছিলেন না। তিন বছরের অভিজ্ঞতার পর আমি সে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করি।

প্রশ্ন-৩ : এরপর আপনি দারুল উলূম কৌরঙ্গী করাচীতে শিক্ষকতা শুরু করেন। সাথে সাথে জামেয়া উলূমে ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনে শিক্ষাদান করতে থাকেন। এই দু'প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার কারণ কী ছিল?

উত্তর : জামেয়া উলূমে ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনে তো আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী র. এর বিশেষ আগ্রহে এবং হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবের অনুমতিক্রমে অস্থায়ীভাবে শুধু যোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক বছর শিক্ষকতার খেদমত আঞ্জাম দেই। অতঃপর মাওলানা বিন্নুরী সাহেবের আগ্রহ সত্ত্বেও পরবর্তী বছর মুফতী শফী সাহেবের অনুমতি না থাকায় বিন্নুরী টাউনে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা বহাল রাখা সম্ভব হয়নি।

আমি দারুল উলূম কৌরঙ্গী করাচীতে দশ বছর শিক্ষকতা করি। এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়ার কারণ ছিল এই যে, পাকিস্তানে হিজরত করার সময় আমার নিয়ত ছিল একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। এজন্য আমি সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রতিষ্ঠান কায়েমের সময় হয়েছে কি না তা আমি যাঁচাই বাছাই করতে থাকি। যখন দেখলাম যে, আল্লাহর অনুগ্রহে সে সময় উপস্থিত হচ্ছে তখন আমি জামেয়া ফারুকিয়া করাচী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবের সাথে এক সময় এমন কথা হয়েছিল যে, আল্লাহর অনুগ্রহ হলে আজীবন দারুল উলূম করাচীর সাথে থাকব। সেখানে থাকতে আমার কোন সমস্যাও ছিল না। তাই সেখান থেকে আলাদা হতে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে মুফতী সাহেবের অনুমতির দরকার ছিল।

আমি মুফতী সাহেবের কাছে আমার পরিকল্পনার কথা বলি এবং তার অনুমতি প্রার্থনা করি। প্রথম দিকে তো হযরত মুফতী সাহেব অনুমতি দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পরে সপ্তাহব্যাপী আলাপ আলোচনার পর আমার বিশেষ আগ্রহে তিনি অনুমতি প্রদান করেন। ইস্তেফার পরিবর্তে তিনি এক বছরের ছুটি নেয়ার পরামর্শ দেন। এভাবে দারুল উলূম করাচী থেকে বিদায় নেই এবং জামেয়া ফারুকিয়া প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করি।

প্রশ্ন-৪ : আপনি মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব ও অন্যান্য বুযুর্গগণের পরামর্শে দারুল উলূম করাচীর ভিত্তি রাখেন। আপনার এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : আমি জামেয়া ফারুকিয়া করাচী হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী র., হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী র. অন্যান্য মুখলিস বন্ধু-বান্ধব এবং সকল বুযুর্গানে দীনের সাথে পরামর্শ করেই কায়েম করেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে বেশি বেশি দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সরকারী স্কুলের নামে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলমান বাচ্চাদের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এটা লর্ড মেকেল প্রবর্তিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যই করা হচ্ছে। এর দ্বারা আমাদের ছেলেমেয়েরা বংশ ও রঙের দিক দিয়ে স্বদেশী হলেও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে ইংরেজ হয়ে যাবে। আমার দৃষ্টিতে দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিষতুল্য এ শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প দাঁড় করানো যাবে।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বিগত শতাধিক বছরে এই দীনী মাদরাসাগুলোই মুসলমানদের দীনী জ্ঞান, ঈমানী চেতনা, শরীয়তের আমলসমূহের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন এবং দীনী ঐতিহ্য রক্ষার জিম্মাদারী এ স্বাধীন দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোই আদায় করেছে।

বাস্তবতা হচ্ছে পাকিস্তান একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। মানব জাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা, সুবিচার ও সভ্যতার শিক্ষা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে এ রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছে। এ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার জন্য ওলামায়ে কেরামের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। এ আলেম সমাজ যোগ্যতা, মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নিজেদের দুনিয়াবী উন্নতি, অগ্রগতির পরিবর্তে তারা ইসলাম, ঈমানের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের আদর্শ প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করেছেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সকল ষড়যন্ত্রের তারা স্বার্থক মোকাবেলা করেছেন। এ চেষ্টা সাধনারই ফসল হলো বৃটিশের লোভ-লালসা, জুলুম অত্যাচার, যা ইসলাম ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য করা হয়েছিল; সফলতা লাভ করতে পারেনি, অকৃতকার্য হয়। মুসলমানদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামের শিয়ার বা নিদর্শন ও চিহ্নসমূহের ভালবাসা ও মহব্বত এবং মুসলিম জাতির চেতনা ধ্বংস তো হয়ইনি বরং তা আরো শক্ত হয়। এক সময় এটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয় এবং তা মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে পরিণত হয়। বৃটিশ যুগের প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা দুনিয়াবী কিছু উন্নতি ছাড়া অন্য কোন উপকার সাধিত হয়নি। বরং এর দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। ইংরেজী তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা কৃষ্টি কালচার, নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনা অতীতের সোনালী অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত সম্পর্ক ছিন্ন করে ইহুদী, নাসারা ও বেদীনদের পথে চলা এং জাতিকে পরিচালনার পথে উৎসাহিত করে। ইসলাম বিরোধী ও ধর্মদ্রোহীদের কাছে প্রভাবিত হবার ঘটনা বিজাতীয় সভ্যতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল বিশেষ। বৃটিশ শাসন ও তাদের ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষা ও সভ্যতার বিষফল মুসলমানরা এখন ভোগ করছে। তবুও মুসলিম বিশ্বের হাজারো কোটি টাকা যে শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য খরচ হচ্ছে, তা থেকে দুঃখ ও বেদনার বস্তু আর কি থাকতে পারে?

প্রশ্ন-৫ : জামেয়া ফারুকিয়া করাচী, দারুল উলূম কৌরঙ্গী করাচী, জামেয়া উলূমে ইসলামিয়া করাচী এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অথবা আপনি স্বাধীনভাবে জামেয়া পরিচালনা করতে চাচ্ছেন কি?

উত্তর : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অধিক পরিমাণ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা জরুরী বলে আমি মনে করি। এজন্যই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, কিছু জরুরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং কিছু পরিবর্তন সাধন করে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা জামিয়া ফারুকিয়ার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে কাজ চলছে। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে এ উদ্দেশ্যের সফলতা দেখা যাবে।

প্রশ্ন-৬ : প্রথম দিকে আপনাকে কোন কোন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আপনি সময়ের দিক দিয়ে দূরে অবস্থিত এলাকা ডরগকলোনী (শাহ ফয়সাল কলোনী) কে কেন নির্বাচন করলেন?

উত্তর : প্রথম দিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে যেমন বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটাবস্থা অতিক্রম করতে হয়, আমাদেরও সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এখানে বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ নেই। এতটুকুই বলা যথেষ্ট বলে মনে করি যে, প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জনবল, উল্লেখযোগ্য সহায়তাকারী, নির্বাচিত জায়গার যোগাযোগ কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা হিম্মত প্রদান করেছেন। জামেয়ার সাথে সংশ্লিষ্টদের অব্যাহত মেহনত ও চেষ্টা সাধনার দ্বারা এ নতুন প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ তাআলা তারাক্কী ও উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। খুব কম সময়ের মধ্যে জামেয়া ফারুকিয়া শুধু করাচী নয় বরং গোটা পাকিস্তানের দীনী জামেয়াসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যার বড় প্রমাণ এই যে, আজ থেকে আট বছর আগে (যখন এ জামেয়ার বয়স ২১ বছর) মুফতী মাহমুদ সাহেবের র. ইন্তেকালের পর বেফাকুল মাদারিসিল আরাাবিয়া পাকিস্তান এর– মহাসচিব এবং জিম্মাদারীর জন্য বেফাকের মজলিশে শূরা বেফাকের মজলিসে আমেলা কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন জনের নাম পরিবর্তন করে জামেয়া ফারুকিয়ার কর্মধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ জামেয়ার মুহতামিমকে এ গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী গ্রহণে বাধ্য করে। বর্তমান সময় পর্যন্ত বেফাকের দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন জামেয়ার মুহতামিম।

স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে বলা যায় যে, জামেয়ার প্রয়োজন হিসেবে এবং পরিবেশের দিক দিয়ে এ জায়গাটি যথোপযুক্ত নয়। জায়গাটি সংকীর্ণ ও অপর্যাপ্ত। করাচীর বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে এটা আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু তখনকার সময় হিসেবে উপায় উপকরণের অপ্রতুলতার সে সময়ে এ জায়গাটি আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হই। এখন চেষ্টা চলছে জামেয়ার জন্য প্রশস্ত ও যথোপযুক্ত একটি জায়গা সংগ্রহের। (আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জামেয়ার জন্য একটি প্রশস্ত ও বিস্তৃত জমি সম্প্রতি ক্রয় করা হয়েছে।)

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের মাদরাসার নেসাবে পবিত্র কুরআন মজীদ, হাদীস এবং ফেকাহ রয়েছে। আপনারা ইসলামের ইতিহাসের দিকে কেন দৃষ্টি দিলেন না? অথচ বর্তমান যামানাকে বুঝার জন্য ইসলামের ইতিহাস এবং তুলনামূলক ইতিহাসের অধ্যয়ন জরুরী।

উত্তর : আমাদের নেসাবে পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে। এগুলো এখানে শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলামের ইতিহাসও আমাদের নেসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু তুলনামূলক ইতিহাস অধ্যয়নের ভালো ব্যবস্থা নেই। নেসাবের ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাপার চিন্তা করার রয়েছে। কিন্তু এ

ব্যাপারে সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সময়ের প্রয়োজন। কিছু কাজ হয়েছে। আরো অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে। আশা করি এ প্রয়োজনগুলোও ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৮ : আপনারা দারুল উলূমকেই নমুনা বলে মনে করেন। দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, জামেয়া মিল্লিয়া নয়াদিল্লী এবং আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন না, এর কারণ কী?

উত্তর : আসলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর প্রতিষ্ঠাতার একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি থাকে। মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় মূলতঃ দুনিয়াবী বা বৈষয়িক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেখান থেকে শিক্ষা লাভকারী অধিকাংশই দুনিয়াবী উপকার লাভের পাশাপাশি ইংরেজী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। ধর্মহীনতার নিকটবর্তী হয়ে তারা ইসলাম, ঈমান এবং কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ থেকে দূরত্বে অবস্থান করতে শুরু করে। তারা চিন্তার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। রূহানী শক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। ইংরেজী তাহযীব-তামাদ্দুন দ্বারা তারা এতটুকু প্রভাবিত হয়ে যান যে, ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে যাবার পরও তারা ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করে চলছেন। এ কাজ করতে তারা গৌরববোধ করে। তাদের কেউ কেউ এ কথা বলতে শুরু করেছে যে, উন্নত আধুনিক বিশ্বে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইসলামী রীতিনীতি গ্রহণযোগ্য হয় কীভাবে? তাদের দৃষ্টিতে যেন ইসলামের বিকল্প ব্যবস্থা ধর্মহীন মতবাদ। যা ইংরেজরা রেখে গিয়েছিল। তাই সে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জন্য কীভাবে নমুনা ও আদর্শ হবে?

জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লীর প্রতিষ্ঠা এ উদ্দেশ্যে হয়েছিল যে, দীন ও দুনিয়াকে একত্রিত করা হবে। যাতে করে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় দুনিয়ার পেছনে পড়ে দীনের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য কামিয়াব হয়নি। আজকের জামেয়া মিল্লিয়া দেখে এটা বুঝা যায় না যে, জামেয়া মিল্লিয়া প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্যই ছিল দীনের হেফাজত। এ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। এজন্য জামেয়া মিল্লিয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নেই। বাকি রইল দারুল উলূম নদওয়াতুল উলূমের কথা।

নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিকল্পনাকারীদের সামনে এ চিন্তা ছিল যে, দারুল উলূম দেওবন্দ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এমন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী

তৈরি হবে যারা একদিকে দীনের বাহক হবে, ইসলামের হেফাজতকারী হবে অন্যদিকে তারা প্রয়োজনীয় দুনিয়া অর্জনের জন্য সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের দ্বারস্থও তারা হবে না। তারা পূর্ণাঙ্গ মৌলভী ও পূর্ণাঙ্গ মিস্টারের পরিবর্তে তৃতীয় ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন কিছু কিছু লোক তৈরি করবে। এ ধরনের কিছু লোক তৈরির জন্য নদওয়ার উদ্যোক্তারা কাজ করছেন। আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।

এ তিন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয় ও নদওয়াতুল ওলামার বয়স শত বছরের বেশি। জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়সও পৌনে এক শতাব্দীর বেশি। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, এ উপমহাদেশে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেদমত তা পবিত্র কুরআনের হেফাজত, তালিম দেয়া-নেয়া, তাফসীরের দিক দিয়েই হোক অথবা রাসূলের হাদীসের প্রচার-প্রসার, শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ, ফতোয়া প্রদান, ফেকাহ এর চর্চা, ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের কোন বিকল্প দেখা যায়নি। আদর্শ দীনী ব্যক্তিত্ব তৈরি, সূরত ও সীরাত, আমল ও আখলাক, শরীয়তের দাওয়াত ও দীনের ধারক বাহক হিসেবে যদি আদর্শবান ও দীনদার ব্যক্তি দেখতে চান তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দ এর– চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষায় শিক্ষিত ওলামাদেরকেই দেখা যাবে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লী থেকে এমন আদর্শবান মানুষের চিন্তাও করা যায় না।

নদওয়াতুল ওলামা এ গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও মানসম্পন্ন মোতাবেক নয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নদওয়াতুল ওলামা থেকে উর্ত্তীণ ও পরিচয়ধারী লোকেরা পরিচিতির দিকে দিয়ে আজ অনেক উপরের স্তরে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে যারা বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত তারা দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরদের ফয়েজপ্রাপ্ত। আকাবিরের দিকে রুজু হবার পরই তারা এ মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী র., মাওলানা আব্দুল বারী নদভী র., মাওলানা মঈনুদ্দীন নদভী র. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. এর ভক্ত মুরিদ ও খলীফার অন্তর্ভুক্ত। আর মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র., হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র. এর– মুরীদ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজই আজ নদভী পরিবারের কাছে পৌঁছেছে।

আমার উদ্দেশ্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ছোট করে দেখা নয়। বরং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি থাকে। পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য হিসেবেই তারা ফল পেয়ে যাবেন। আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির সাথে একাত্মতা পোষণ করে থাকি। সে অতীতে যে ফলাফল দিয়েছে তাই এখন আমরা কামনা করি। দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্য আদর্শের সাথে সকলে একমত হবে এটা জরুরী নয়। আবার আমরা যারা দেওবন্দের আদর্শ উদ্দেশ্যের সাথে একমত তারাও অন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের সাথে একমত হবে এবং তার অনুসরণ করব তাও জরুরী নয়। রুজী তথা টাকা-পয়সা অর্জনের অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, কৃষি ইত্যাদি। আমাদের ছাত্ররা দীনী, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরী করে থাকেন। বর্তমানে সরকারী স্কুল, কলেজেও তাদের জন্য চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে পথ এক সময় ইংরেজের পোষ্যপুত্ররা বন্ধ করে রেখেছিল। এটা ছিল এক আশ্চর্যজনক প্রহসন। এর প্রভাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। দীনীয়াত, ইসলামিয়াত, আরবী ও ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষকতার জন্য মাদরাসা শিক্ষিত আলেমদের সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছে। ইসলামিয়াত ও আরবী বিষয়ে এম.এ পাশ লোকেরা মুসলমান না হলেও, কুরআনুল কারীমের নাজেরা পড়তে অক্ষম হলেও আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হলেও তারা চাকুরীর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হত। ইংরেজের অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনা ও তাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে এখনো মুক্ত হওয়া যায়নি। তারা সত্যিকারের ইসলামী আদর্শ ও আমল থেকে কত বেখবর!

প্রশ্ন-৯ : এক সময় ছিল যখন শিক্ষা শুধু আমীর লোকেরাই অর্জন করত। শিক্ষার উদ্দেশ্য তখন অর্থ উপার্জন ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থ উপার্জন।

আপনি কি মনে করেন যে, জামেয়া ফারুকিয়ার শিক্ষা লাভকারীরা শুধু মাদরাসা, মসজিদে শিক্ষকতা, ইমামতির দায়িত্বই লাভ করবে? নাকি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারী পদ এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কাজেও তারা নিয়োজিত থাকবে?

উত্তর : আমাদের পরিকল্পনা হলো দীনী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা। যারা কুরআন ও সুন্নাতের প্রচার প্রসার করবে। ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখবে। শুধু দুনিয়া অর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য এটা

নয় যে, রুজী কামানো জায়েয নয়। এটাও একটা জরুরী বিষয়। কিন্তু এটা এ দীনী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন-১০ : ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। বিজ্ঞান চর্চা ইংরেজী ভাষা জানা ছাড়া সম্ভব নয়। জামেয়া ফারুকিয়ার মধ্যে আপনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য রাখেননি। ইংরেজীর গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনি জামেয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক আল-ফারুক এর ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করছেন। আপনি কি জামেয়া ফারুকিয়ার ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে ছাত্ররা ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে অবগত হতে পারে? কমপক্ষে কাজ চলার মত ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন কি?

উত্তর : ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। ইসলাম প্রচারের জন্য এ ভাষার প্রয়োজন সর্বস্বীকৃত। এজন্য আল ফারুকের ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। ছাত্রদেরকে আগামীতে ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবে। এখনও আমরা সে বিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছি।

প্রশ্ন-১১ : জামেয়া ফারুকিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কী?

উত্তর : আমরা সব সময় জামেয়া ফারুকিয়াকে বেশি থেকে বেশি উপকারী ও কার্যকর বানানোর চেষ্টা করে থাকি। আমরা মনে করি আধুনিক এ যুগ চাহিদাকে সামনে রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য জামেয়া কাজ করে যাবে। আপনারাও দুআা করবেন, যাতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও একে বাস্তবায়নের তাওফীক যেন দান করেন।

প্রশ্ন-১২ : আল ফারুকের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : সংক্ষিপ্তভাবে বলছি যে, আল ফারুকের উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামের বিজয়। তার পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য সাংবাদিকতার ময়দানে কার্যকর গঠনমূলক প্রভাব বিস্তারকারী আকর্ষণীয় অবদান রাখা।

প্রশ্ন-১৩ : মাসিক আল ফারুক আরবী জানা লোকদের জন্য, আল ফারুক উর্দূ-উর্দূ ভাষাভাষীদের জন্য প্রকাশ করেছেন। আল ফারুক ইংরেজী সংস্করণ এখন বের করছেন। আপনি কি এ পত্রিকাগুলোকে টাইম ও নিউজ উইক এর ন্যায় প্রকাশ করবেন?

উত্তর : সময় ও অবস্থা অনুযায়ী নতুন নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সময়ই তা বলে দেয়। টাইম ও নিউজ উইক ভিন্ন ধরনের পত্রিকা এ ধরনের কাজের অনুকরণের আগ্রহ আমাদের নেই।

প্রশ্ন-১৪ : আপনি বেকাফুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের জেনারেল সেক্রেটারী। এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে বলবেন কি?

উত্তর : ২০ শাবান ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ২২ মার্চ ১৯৫৭ ইং খায়রুল মাদারেস মুলতান এর মজলিসে শূরার এক সভায় এ আরবী মাদরাসাগুলোর জন্য একটি সংস্কার চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করা হয়। মাওলানা শামসুল হক আফগানীর প্রস্তাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর আহবায়ক মনোনীত করা হয় মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী র. কে। মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জান্দলী র., মাওলানা শামসুল হক আফগানী র., মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী র. ও মুফতী আবদুল্লাহ মুলতানী র. কে এ কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল আরবী মাদরাসাসমূহের হেফাজত, 'তানযীম ও উন্নতি, শিক্ষা নেসাবের উন্নয়ন, উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা, মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য এবং দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতাকে প্রভাব সম্পন্ন করা এবং কার্যকর ও উন্নয়ন করা। এ কমিটি ২২, ২৩, ২৪ শাওয়াল ১৩৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ সালে সম্ভবত দু'বছর পর দারুল উলূম টেন্ডুল্লা ইয়ার সিন্ধে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষ্যে বেকাফের সম্মেলন আহবান করে। এতে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। মাদরাসা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এ সম্মেলনে গভীরভাবে চিন্তা করা হয়। মাদরাসাসমূহকে সুসংগঠিত করা, পরিচালনার নিয়ম পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা, নেসাবের উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন এবং এ সকল স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের হেফাজত ও উন্নয়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

এ কমিটির সভাপতি করা হয় মাওলানা খায়ের জলন্দরী র. কে। অন্যান্য সদস্যগণ হলেন, মাওলানা শামসুল হক আফগানী র., মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র., মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস কান্দলভী র., মাওলানা মুহাম্মাদ ছাদেক বাহাওয়ালভীপুরী র.। পরবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত আলেমগণকে সে কমিটির সদস্য করা হয়। মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী করাচী, মাওলানা ফজল আহমদ সাহেব করাচী প্রমুখ।

অতঃপর ১৬ জিলহজ্জ ১৩৭৮ হিজরী মোতাবেক জুন ১৯৫৯ ইং মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী র. এর সভাপতিত্বে এ কমিটির এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে মাওলানা আবদুল খালেক মুলতানী র. মাওলানা মুফতী মাহমুদ র., মাওলানা আবদুল হক আখুড়াখটক এবং আল্লামা খালেদ মাহমুদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এ জলসায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য রূপরেখা তৈরি করা হয়। আর রবিউস সানী ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৮, ১৯ অক্টোবর ১৯৫৯ ইং বেফাকের প্রথম সম্মেলন আহবান করা হয়। এর সভাপতিত্ব

করেন মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী র.। সাংগঠনিক কমিটির তৈরি করা গঠনতন্ত্র পরিবর্ধন, সম্পাদনা করে মঞ্জুর করা হয়। আগামী তিন বছরের জন্য সভাপতি হিসেবে মাওলানা শামসুল হক আফগানী প্রথম সহ-সভাপতি হিসেবে মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি হিসেবে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী র. নাজেমে আলা বা মহাসচিব হিসেবে মুফতী মাহমুদ ও অর্থসচিব হিসেবে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ নির্বাচিত হন।

১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে আমেলা বানানো হয়। এর সদস্য করা হয় মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী র., মাওলানা মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী র., মাওলানা গোলাম গাউছ হাজারভী র., মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জলন্দরী র., মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র., মাওলানা আরজ মুহাম্মাদ কুয়িটবী প্রমুখকে।

অতঃপর ১৩৮২ হিজরী ১৯৬২ ইং সালে নতুন কমিটির সভাপতি হন মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী, প্রথম সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী, দ্বিতীয় সহ সভাপতি মুফতী মুহাম্মাদ শফী (সরগুদা), মহাসচিব হিসেবে মুফতী মাহমুদ নির্বাচিত হন।

এরপর ২৭ রবিউস সানী ১৩৯৩ মোতাবেক ৩০ মে ১৯৭৩ ইং অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী সভাপতি, মাওলানা আব্দুল হক আখুড়াখটক প্রথম সহ-সভাপতি, মাওলানা আবদুল্লাহ সাহিওয়াল দ্বিতীয় সহ-সভাপতি, মাওলানা মুফতী মাহমুদ মহাসচিব, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস মিরাঠী প্রথম নায়েবে নাযেম, মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় নায়েবে নাযেম নির্বাচিত হন।

অতঃপর ১৩৯৮ হি/১৯৭৮ ইং মুফতী মাহমুদ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মিরাঠী মহাসচিব হন।

এরপর ২১ মহররম ১৪০১ হি মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৯৮০ ইং এর বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা আবদুল হক আখুড়াখটক পৃষ্ঠপোষক, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস মিরাঠী সভাপতি, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর সহ-সভাপতি আর আমি (মাওলানা সলিমুল্লাহ খান) মহাসচিব এবং মুফতী মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ সচিব নির্বাচিত হন। আর ১৬ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠন করা হয়।

অতঃপর ৮ জমাদিউল উখরা ১৪০৪ হি মোতাবেক ১২ মার্চ ১৯৮৪ ইং অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে বর্তমান কমিটির প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা পোষণ

করে এ কমিটি পুর্নবহাল করা হয়। এ কমিটির পদসংখ্যা আরো বাড়ানো হয়। কমিটির মেয়াদ ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করা হয়।

যখন বেফাকুল মাদারিসের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল তখন জেনারেল মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের শাসনামল ছিল। এ সময়ের ব্যুরোক্রেসিরা আইয়ুব খানকে এ কথা বলে উত্তেজিত করেছিল যে, এ মৌলভী সাহেবরা সব সময় সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক মডার্ন ইসলাম কায়েমে এরাই বাঁধার সৃষ্টি করে। এরা চৌদ্দশত বছরের পুরাতন ইসলাম চায়, যা এ যুগের চাহিদা পূরণে অক্ষম। তাই তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত। তাই জেনারেল আইয়ুব এ ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল মিশরে প্রেরণ করে। কীভাবে মৌলভী সাহেবদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এটা জানার জন্য এ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে এ তদবীর দেয়া হয় যে, মৌলভী সাহেবদের আযাদ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসতে হবে। তখন সব আলেম সরকারী কর্মচারী হয়ে যাবে। চাকুরির ভয়ে তখন তারা কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে না, আন্দোলন পরিচালনা করবে না। এভাবে ইসলামের নামে অর্জিত দেশ পাকিস্তানকে আপনাদের মর্জিমাফিক চালাতে পারবেন। এভাবে খুব সহজে পাকিস্তানে আধুনিক ইসলাম প্রবর্তন করতে পারবেন। এ সময় মাদরাসাগুলোকে সংগঠন ও উন্নতির চেষ্টা ছাড়াও তথাকথিত আধুনিকতার মোকাবেলা করার জন্য ওলামায়ে কেরাম বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া কায়েম করেছিলেন। এ সংগঠন সরকারকে সর্তক করে যে, সরকার যেন স্বাধীন দীনী মাদরাসাগুলোকে দখল করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে। তা না হলে সকল আলেম ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবেন। সরকারের এ পরিকল্পনাটি যেহেতু খারাপ উদ্দেশ্যে ছিল, এজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে এবং দীনী মাদরাসাগুলো দখল করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামল আসল তখন তিনিও পূর্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেন।

অন্যান্যরা আমাদের দেখাদেখি বেরেলভী চিন্তাধারার বেফাক এবং আহলে হাদীসের বেফাকও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এটা মুফতী মাহমুদ সাহেবের যুগে ছিল। তিনি তখন বেফাকের সভাপতি ছিলেন। তিনি বেফাকের সকল

প্রতিনিধির একটি সম্মেলন মুলতানে আহবান করলেন। এতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবাবলী ও সিদ্ধান্ত পাশ করেন। সরকারকে সতর্ক করে দেন যাতে তারা তাদের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকেন। ওলামায়ে কেরাম যে কোন মূল্যে সরকারকে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেবে না। মাদরাসা বিল্ডিং ও লাইব্রেরীর নাম নয়। তোমরা যদি আমাদের বিল্ডিংসমূহ দখল করে নাও এবং আমাদের লাইব্রেরীসমূহ ছিনিয়ে নাও তবে আমরা মাঠে ময়দানে এবং বৃক্ষের ছায়ায় ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষাদানের জন্য বসে পড়ব এবং আপন মিশন জারী রাখব।

এ ঘোষণা ও প্রস্তাবাবলী দ্বারাও বিরাট কাজ হয় এবং সরকার ব্যর্থ হয় মাদরাসাসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে। এভাবে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া দীনী মাদরাসাসমূহের হেফাজতে বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যা এ সংস্থা কায়েমের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এ তানযীম দ্বারা লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অন্য কোন বড় ধরনের কাজ হয়নি। এজন্য মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী র. যখন সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি বেফাকের বার্ষিক সম্মেলনে বলেছিলেন, বেফাকের জানাযা তৈরি আছে। আপনারা এগিয়ে আসুন এবং জানাযা নামায পড়ে এগিয়ে দাফন করে দিন। এটি বেফাকের সামষ্টিক কর্মতৎপরতায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলেছিলেন। লোকেরা বলত, হযরত এটা ঠিক কাজ হচ্ছে না। কিন্তু সরকারকে মাদরাসাগুলোর দখল থেকে রক্ষা করার জন্য বেফাকের প্রয়োজনীতা রয়েছে। আর কিছু না হোক বেফাকের সামষ্টিক প্রচেষ্টা দ্বারা মাদরাসাগুলোকে সরকারের কব্জায় নেয়া থেকে তো রক্ষা করা যাচ্ছে। এ লাশের উপকার অনেক বড় উপকার। এজন্য একে দাফন করা ঠিক হবে না। এটা সে সময়ের কথা, যখন হযরত বিন্নুরী র. সভাপতি এবং মুফতী মাহমুদ মহাসচিব ছিলেন।

মাওলানা বিন্নুরী সাহেবের মৃত্যুর পর মুফতী মাহমুদ সাহেব সভাপতি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস মিরাঠী র. মহাসচিব নিযুক্ত হলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস মিরাঠী সাহেব মূলতঃ বেফাকের পুঁজি ছিলেন। তিনি বেফাক সংক্রান্ত সকল বিষয় আঞ্জাম দিতেন। মুফতী মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ সাহেব তার সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। কার্যকরী কমিটি সবসময় স্বনামধন্য ওলামাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। অধিকন্তু বিভিন্ন পদেও বড় বড় আলেম অধিষ্ঠিত থাকতেন। কিন্তু বেফাকের প্রতি কারও আন্তরিকতা ছিল না। বেফাকের কার্যক্রম অনেকটা অবহেলিত ও উদ্যমহীন ছিল। মাদরাসাসমূহের সংশোধন, প্রতিষ্ঠা, সিলেবাস ও শিক্ষা

কার্যক্রমের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হচ্ছিল না। শুধুমাত্র দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষাটাই বেফাকের অধীনে অনুষ্ঠিত হত। এ পরীক্ষার সাথেও নামেমাত্র স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল। এ জন্য মুফতী মাহমুদ সাহেবও নিজে সভাপতি থাকাকালীন সময়ে বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে মাওলানা বিন্নুরীর ভাষণের ভাষার পুনরাবৃত্তি করে বলতেন, বেফাকের লাশ প্রস্তুত। আপনারা আসুন তার জানাযার নামায আদায় করে দাফনের কাজটুকু সেরে নেই।

উপস্থিত আলেমগণ বলতেন, হযরত! বেফাকের বিদ্যমান ফায়েদা অনেক বড়। তা দ্বারা অন্ততঃ আমরা আমাদের মাদরাসাসমূহ সরকারের অশুভ হাত থেকে রক্ষা করতে পারছি। অতএব বর্তমানে যতটুকু আছে তা নিঃশেষ করে দিবেন না। কেউ ঠিকমত বেফাকের বার্ষিক চাঁদা আদায় করতেন না। বেফাকের সভাপতি মুফতী মাহমুদ সাহেব মাদরাসার প্রতিনিধিদের সামনে চাঁদা আদায় না করার ব্যাপারে অভিযোগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলতেন যে, সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল এই যে, মাদরাসা কাসেমুল উলূম মুলতান; আমি নিজেই যেখানকার মুহতামিম এবং যেখানে বেফাকের কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত, তাও বার্ষিক চাঁদা আদায় করে না। সকলেই মনে করতেন, যখন কোন কাজ হয় না তাতে শুধু শুধু চাঁদা দিয়ে কী লাভ? প্রায় ২৫০টি মাদরাসা বেফাকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সাথে সে সকল মাদরাসার কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। মাদরাসাসমূহে কোন ধরনের স্তর বিন্যাসের পদ্ধতি ছিল না। কোন শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াই পাঠদান চলত। সিলেবাস এবং অন্যান্য শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বেফাকের পক্ষ থেকে যে সকল সংশোধনী ও বিধি-বিধান আরোপ করা হতো, তা সাধারণত প্রভাবহীন ছিল। মাদরাসা কর্তৃপক্ষও সেদিকে দৃষ্টি দিতেন না, বেফাকও তা বাস্তবায়নের মত অবস্থানে ছিল না। মুফতী মুহাম্মাদ আনওয়ার সাহেবের বর্ণনা মতে বেফাকের বার্ষিক খরচ তখনকার ১২০০ রূপী, যা তিনি ১৪০৯ হিজরী জমাদিউস সানিতে মুলতানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে বলেছিলেন।

এরপর জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের শাসনামল আসল। ১৯৮০ সালে মুফতী মাহমুদ সাহেব ইহজীবন ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। ২১ মুহাররম, ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৯৮০ সালে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস মিরাঠী সভাপতি এবং আমাকে মহাসচিব নিযুক্ত করা হলো। তখন অবস্থা এমনই বিরাজ করছিল যে, জেনারেল জিয়াউল হক বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে দীনী

প্রতিষ্ঠানাদি দখল করার পরিকল্পনা হাতে নিল। জেনারেল জিয়া ওলামা এবং অন্যান্য দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যেখানে বেফাকের একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। এই কমিটি দীর্ঘ দু'বছরেরও অধিক সময় পর্যন্ত কাজ করতে লাগল। তাদের নিরলস চেষ্টায় দীনী মাদরাসাসমূহে একটি জরিপ চালায়। সকল তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করে তা দ্বারা একটি রিপোর্ট তৈরি করল। তা একটি পুস্তকা-কারে প্রকাশ করল এবং এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে মাদরাসার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করলেন। এই পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপে ধর্ম বিষয়ক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছয় বছরের মধ্যে প্রায় দু'শ মাদরাসা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবর্তন করার বিশেষ কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করে। যাতে বেফাকের প্রতিনিধি দল ভিন্নমত পোষণ করে এবং নিয়মিত তার নোট লিখে প্রচার করে। সকল প্রদেশে সে কমিটির বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে লাগল, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই সুসংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। যখনই স্বাধীন দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়, মাদরাসায় যাকাত ইত্যাদি বণ্টনের মাধ্যমে সাহায্যের লোভ-লালসা দেখানো হয়েছে। সরকারী সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দ্বারা মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় সকল সরকারের উদ্দেশ্য এই যে, আলেমদের কিনে নিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধি আরোপ করা এবং নানামুখী চাহিদা পূরণ করা।

১৯৮১ সন মোতাবেক ১৪১০ হিজরী সনে বেফাকের ব্যবস্থাপনা কমিটি করাচীতে জামেয়া উলূমে ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরী টাউনে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। বেফাকের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল, যেখানে দেওবন্দী চিন্তাধারার মাদরাসাসমূহের পক্ষ হতে প্রায় এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলন চারদিনব্যাপী চলতে থাকে। উক্ত সম্মেলনের সুদৃঢ় কর্মসূচী ও কঠিন প্রস্তাব সরকারকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল আর নিজেদের পরিকল্পনা হতে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। যে কমিটি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছিল, তা ভেঙ্গে দেয়া হল। জেনারেল জিয়া তাদের তৈরিকৃত রিপোর্ট ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা প্রদান করেন। এরপর আর মাদরাসাসমূহকে তেমন বিরক্ত করা হয়নি। কিন্তু এরই ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মাদ আফজাল সাহেব; যিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও হুশিয়ার ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও এই উদ্দেশ্যে লাগাতার প্রচেষ্টা

চালাতে থাকেন (যার বিস্তারিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ)। আর যথারীতি তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। তবে তিনিও সফল হলেন না। তারপর ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের অন্য হযরত নিযুক্ত হন, তারাও তাদের নিয়মিত চেষ্টার ক্রটি রাখেনি। তাদের সাথে আমার সভা, মিটিংও চলতে থাকে। তবে মূলতঃ সরকারী আন্দোলন প্রকাশ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ঐ দীনী মাদরাসাসমূহের মূল্য উদ্দেশ্য, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রচার এবং খোদাভীরু, সমাজ সংস্কারক ও দীনী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা। নিঃসন্দেহে এ মহৎ কাজ মাদরাসার বিল্ডিং ও মহলের ওপর নির্ভরশীল নয়। যতদিন আল্লাহ মর্জি বিদ্যমান থাকবে, এ খেদমতও অবিরাম চলতে থাকবে। যদি আমাদের কাছে কোন বিল্ডিংও না থাকে তবে অন্য পন্থায় এ কাজ বহাল থাকবে। দূরবস্থাতেও আল্লাহ পাক অনেক শক্তিশালী কর্মীর ব্যবস্থা করে দেন।

প্রশ্ন-১৫ : যখন আপনি সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বেফাকের কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমান অবস্থা কি?

উত্তর : একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করছি। তা থেকে অনুমান করা যাবে-

১৩৮০ হিজরী থেকে ১৪০০ হিজরী পর্যন্ত সময়ের অবস্থা -

১. ২১ বছরে ৫৫৭৯ জন দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র বেফাকের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নিচের শ্রেণীসমূহের কোন পরীক্ষা বেফাকের অধীনে আসতে পারেনি।
২. সে সময় মাদরাসার সংখ্যা ছিল ২৫০টি।
৩. বেফাকুল মাদারিসের সিলেবাসে কোন নিয়মানুবর্তিতা ছিল না।
৪. মাদরাসাসমূহে বিভাগ ও স্তর বিন্যাসের কল্পনাশুদ্ধ অসম্ভব মনে করা হতো।
৫. প্রথম পর্যায়ে বেফাকের বার্ষিক চাঁদা আদায় করা হত না। (কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ।)
৬. আগে বেফাকের খরচাদি না হওয়ার শর্তই ছিল।
৭. আগে শুধু দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। যা দীর্ঘ ২১ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে ।
৮. পূর্বে অনেক বড় ও কেন্দ্রীয় মাদরাসা অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
৯. পূর্বে বেফাকুল মাদারিসের সনদপত্র মূল্যহীন বলে ভাবা হতো।
১০. আগে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত আর তিন চার মাস পর ফলাফল প্রকাশ করা হত।

১৪০১ হিজরী থেকে ১৪০৮ হিজরী পর্যন্ত সময়ের অবস্থা

১. দীর্ঘ এই আট বছরে ৯৫১০ জন দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নিচের শ্রেণীসমূহে মাধ্যমিক শ্রেণীর ১৩৩৩ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ১ (বিশেষ) এর ৩৭৭৫ জন, উচ্চ মাধ্যমিক -২ (সাধারণ) শ্রেণীর ৬২৯৫ জন এবং পূর্ব হাফেজ ১৯৪৪৫ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। যার সংখ্যা ৪০৩৫৮ -এ দাঁড়ায়।

২. ১৪০১ হিজরীর পরপর বর্তমানে বেফাকে অন্তর্ভুক্ত মাদরাসার সংখ্যা ১৪৭ -এ এসে দাঁড়ায়।

৩. বর্তমানে কোন মাদরাসা বেফাকের সিলেবাসের নিয়মানুবর্তিতার বাইরে নয়।

৪. বর্তমানে সকল মাদরাসায় শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা চালু হয়ে গেছে।

৫. বর্তমানে যথারীতি নিয়মানুবর্তিতার সাথে সকল মাদরাসা নির্ধারিত চাঁদা আদায় করছে।

৬. বর্তমানে বেফাকের শুধু মাসিক ব্যয় পঞ্চাশ হাজার রুপীরও অধিক।

৭. বর্তমানে আট বছরে নিচের পাঁচ স্তরের জন্য পাঁচটি পরীক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সিলেবাস পরীক্ষা অনুযায়ী বিন্যাসিত হয়েছে। হেফজের পরীক্ষার পর প্রথম পরীক্ষা তিন বছর পর, আবার প্রত্যেক দু'বছর পর দ্বিতীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৮. এই দীর্ঘ আট বছরে কোন উল্লেখযোগ্য নামী-দামী মাদরাসা বেফাকুল মাদারিস হতে পৃথক হয়নি।

৯. বর্তমানে বেফাকের সনদপত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তার গুরুত্বও অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. বর্তমানে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা অনেক প্রশস্ততা লাভ করেছে। ৩৫-৩৬টির মত পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে। সে সাথে পনের দিন পরেই ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে হয়তো আপনার অনুমান হয়ে গেছে যে, বেফাকুল মাদারিস প্রতিষ্ঠায় সিলেবাস ও শিক্ষা কার্যক্রমের যে উদ্দেশ্য সামনে রাখা হয়েছিল, শিক্ষা কাঠামোর উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল অথবা সকল মাদরাসায় একমুখী শিক্ষা ও ঐক্যের আশা করা হয়েছিল এবং তা রক্ষা ও হেফাযতের জন্য যে চিন্তা-ভাবনা চলছিল, সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আমাকে কতখানি সফলতা দানে কৃতজ্ঞ করেছেন। নিশ্চয় এ সবকিছু আল্লাহর রহমত ও করুণা ছাড়া কিছুই নয়।

(পরিসংখ্যান বেফাকের কেন্দ্রীয় অফিস মুলতান থেকে প্রকাশিত লিফলেট থেকে সংকলিত হয়েছে)।

প্রশ্ন-১৬ : আপনার দৃষ্টিতে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোন প্রোগ্রাম আছে কি এবং এর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি?

উত্তর : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মাদরাসাসমূহকে সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা, এর অভ্যন্তরীন সংগঠনকে শক্তিশালী করা, মাদরাসাসমূহের সংশোধন, শিক্ষা-কাঠামোর উন্নয়ন করা, সিলেবাস সংক্রান্ত কার্যক্রমকে পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, পারস্পরিক পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে সমকালীন দীনী চাহিদা অনুযায়ী সিলেবাসে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা।

এ সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে আলহামদুলিল্লাহ কাজ চলছে। আশা করি ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে।

প্রশ্ন-১৭ : প্রস্তাবিত ফারুকিয়া ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? আপনি কি দারুল উলূম দেওবন্দ ও আলীগড় উভয়ের সিলেবাসের সমন্বয়ে নতুন কোন সিলেবাস আবিষ্কারের ইচ্ছা পোষণ করেন?

উত্তর : মাদরাসা ও বেফাকুল মাদারিস প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এই ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আর দেওবন্দ ও আলীগড়ের সমন্বয় করার ব্যাপারে আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। অধিকন্তু আমরা সেটাকে তেমন উপকারী বলে মনে করি না।

প্রশ্ন-১৮ : ফারুকিয়া ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম কতখানি সম্পন্ন হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি?

উত্তর : আমাদের প্রথম সমস্যা জমিকে কেন্দ্র করে। তাতে নানামুখী সমস্যা আছে। উপযুক্ত স্থানে সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত জমি পাওয়া খুবই কঠিন বিষয়। বর্তমানে অন্য কোন উপযুক্ত জায়গার অনুসন্ধান চলছে। যথোপযুক্ত জমি হাতে আসলে সামনে অগ্রসর হবো। (আল্লাহ পাক এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ হযরতের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ পাক হাবব চৌকির নিকট সাকেরানে একটি প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।)

প্রশ্ন-১৯ : সে সিলেবাসের বিন্যাস কি বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী হবে?

উত্তর : হ্যাঁ। বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনাদিকে সামনে রেখে। ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে। যেখান থেকে দীক্ষা লাভের পর ছাত্ররা ইনশাআল্লাহ যে কোন স্তরে যে কোন জায়গায়

দীনী চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে। তারা আধা-পণ্ডিত আধা-মাস্টার, আধা মোল্লা-আধা মুফতী হবে না। বরং সঠিক দীন ইসলামের জ্ঞানের অধিকারী হবে এবং পবিত্র দীনের দায়ী ও প্রতিনিধি হবে।

প্রশ্ন-২০ : এর জন্য তো বড় অংকের অর্থের প্রয়োজন। আপনি তা কিভাবে যোগাড় করবেন? আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি মিসরের শাসক রাজারাই স্থাপন করেছিলেন এবং অর্থের যোগানও তারা দিয়েছেন। আপনি চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে তা কীভাবে সমাধান করবেন এবং বিশেষ খরচাদির ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে? এর জন্য কি ছাত্রদের নিকট থেকে ফি আদায় করবেন, না সরকারী অনুদান গ্রহণ করবেন?

উত্তর : ছাত্রদের কাছ থেকে ফী আদায় করা বা সরকারী অনুদান গ্রহণ করার আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। আমরা সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। এটাই আমাদের আকীদার বৈশিষ্ট্য। এভাবে দীর্ঘ সোয়াশ বছর থেকে আমাদের কাজ চলে আসছে। বর্তমানে কিছু কিছু মাদরাসা সরকারের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করছে, যা কোন প্রকারেই উপকারী নয়, অধিকন্তু তা আমাদের বিশ্বাসের বিপরীত। বেফাকুল মাদারিস তা কোনভাবেই পছন্দ করে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গুলশান ইকবালের খানকাহে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ায়

✍ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব বর্তমান বিশ্বের একজন খ্যাতনামা পীর ও মুর্শিদ এবং আলেমে দীন। ১৯৮৪ সালের পর তিনি বাংলাদেশে আসা-যাওয়া শুরু করলে আমরা গেণ্ডারিয়ার ঢালকানগরে গিয়ে আলহাজ্ব কামাল সাহেবের বাসায় দেখা করতাম। ঢাকাতে হযরতের প্রোগ্রামে শরীক হতাম। ১৯৮৫ সালে মাদরাসা দারুর রাশাদ কায়েম হলে প্রথমবার হযরত শায়খ দারুর রাশাদ দেখতে আসেন। সাথে আলহাজ্ব কামাল সাহেব, হাজী কোব্বাদ সাহেব, মাওলানা হেমায়েত সাহেব আসেন। মাদরাসা তখন খোলা জায়গায় চাটাইয়ের ছাউনীতে চলছিল। খুবই অভাব অনটন এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে দারুর রাশাদের শুরু হয়েছিল মাত্র। হযরত প্রতি বছর ঢাকায় এলে একবার দারুর রাশাদে আমরা নিয়ে আসতাম। এভাবে আমি হযরত আলী মিয়া র. এর সাথে বায়াতের সম্পর্ক রাখার পরও সবাই মনে করত আমি হযরতওয়ালার মুরীদ।

১৯৮৭ সালে আমি করাচী যাই। প্রথমে বিন্নুরী টাউনের মাদরাসায় এবং পরে হযরতের গুলশানে ইকবালের খানকায় সময় কাটাই। সম্পর্ক আরো গভীর হয়। প্রতি বছর এ সম্পর্ক আরো গভীর হয়। প্রতি বছর এ সম্পর্ক আরো গভীরতর হয়ে উঠতে থাকে। হযরতের নেক নজর এ অধমের উপর পড়তে থাকে।

যাহোক সফরের সময় শেষ হয়ে আসছিল। ২৯.১১.০৬ তারিখ বুধবার সকালে হযরতের গুলশানে ইকবাল খানকাতে হাজির হয়ে দেখা করি। হযরত আমাকে দেখেই বুকে টেনে নেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। সবাইকে বলতে থাকেন, দেখ দেখ! বাংলাদেশ থেকে মাওলানা সালমান এসেছে। বলতে থাকেন, তোমার স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়েছে কেন ইত্যাদি। ঐ সময় তার সাহেবজাদা মাওলানা মাযহার সাহেবও উপস্থিত হন। যাহোক কিছু সময় হযরতের সোহবতে কাটিয়ে দোয়া নিয়ে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেয়ার জন্য পুলিশ হেড অফিসে চলে যাই। নীচে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তার খিদমতের কার্যক্রম তুলে ধরা গেল-

প্রথমেই আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের গুলশান ইকবালস্থ খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ায় হাজির হই। তাঁর সাথে সালাম, মুসাফা ও মোয়ানাকা করি। বর্তমানে তিনি কিছুটা সুস্থ। বেশ কিছু দিন হতে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সারা পৃথিবীর আল্লাহ প্রেমিকরা বর্তমানে হযরতের খানকায় ভিড় জমাচ্ছেন। বর্তমানে শুধু এশার নামাযের পর হযরত মাওলানা সকলের সামনে কিছু নসিহত রাখেন। ইতোপূর্বে তিনি ইলমে মারফতের সওদা নিয়ে সারা দুনিয়া সফর করে বেড়িয়েছেন। বাংলাদেশেও বহুবার সফরে এসেছেন এবং আলেম ওলামাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাগরণের সূচনা করেছেন। তাঁর আগমনে বহু আলেম এবং তোলাবা আল্লাহ প্রেমিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয় তার যোগ্য খোলাফারা ঢাকার গেন্ডারিয়ার ঢালকানগরের তারই প্রতিষ্ঠিত খানকা হতে ইলমে মারেফাতের ভাণ্ডার বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে দিচ্ছে। এই রণক্লান্ত মনীষীর দিকে এক নজর চেয়ে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। কিছু সময় তাঁর সোহবতে থেকে এশার নামায পড়ে আব্দুল গফুর ভাই-এর মাদরাসায় এসে রাতে অবস্থান করি।

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম

হযরতওয়ালা দা. বা. ১৯২৮ সালে হিন্দুস্তানের পাশে ইউপি জেলার একটি আভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মুহাম্মাদ হুসাইন। যিনি একজন সরকারী চাকরীজীবী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার একমাত্র (পুত্র) সন্তান ছিলেন। হযরতওয়ালা দা. বা. যখন তাঁর পিতা মহোদয়ের স্নেহ, মায়া-মমতার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতেন তখন তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন।

শৈশবেই তাঁর মাঝে আল্লাহর মহব্বতের প্রভাব

ছোটকাল থেকেই হযরতওয়ালার মাঝে আল্লাহর প্রেম ও মহব্বত প্রকাশ পেতে থাকে। হযরতের সম্মানিত পিতা সরকারী চাকরী করতেন সুলতানপুরে। তাঁর বড় বোন হযরতকে কোলে করে মহল্লার মসজিদের ইমাম হযরত হাফেজ আবুল বারাকাত সাহেবের নিকট বরকতের ফুঁক দেয়ার জন্য

নিয়ে যেতেন। আবুল বারাকাত র., হযরত হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী র. –এর একজন সম্মানিত খলিফা ছিলেন। হযরতওয়ালা বলেন, তখনই আল্লাহর মহব্বতে মসজিদের দেয়াল আশপাশ ও এর মাটি আমার নিকট অতিপ্রিয় মনে হতো। আর হযরত হাফেজ র. –এর থেকে আমার মাঝে আল্লাহর মহব্বতের সুঘ্রাণ অনুভূত হতো এবং অন্তরে আমার এই কথার খুশবু লাগতো যে, আল্লাহ হলেন অতিপ্রিয়। এমন ছোট বাচ্চার মাঝে অনুভূতির কোন কিছু পাওয়ার কথা না। তখন তাঁর মাঝে আল্লাহর মহব্বতের অনুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মৌলভী ও দাঁড়িওয়ালাদেরকে খুব মহব্বত ও পছন্দ করতেন।

চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উর্দূতে শিক্ষাগ্রহণের পর হযরতওয়ালা দা. বা. তাঁর পিতার নিকট আবদার করলেন, তাকে যেন দীনী শিক্ষার জন্য দেওবন্দ সাহ্‌রানপুর মাদরাসায় পাঠায়। কিন্তু পিতা মহোদয় তাঁকে মডেল স্কুলে ভর্তি করে দেন। দুনিয়ার আধুনিক শিক্ষার প্রতি হযরতের মন একেবারেই উদাসীন ছিল। মানসিকভাবে তিনি এই শিক্ষাগ্রহণকে মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে আবারও পিতার নিকট দীনী ইলম শিক্ষার আবদার করলেন। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় বারবার আবদার করতে থাকেন আর কঠিন মুজাহাদার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

তখনও হযরতওয়ালা দা. বা. বালেগ হননি। ঘর থেকে বের হয়ে জঙ্গলের ভেতর এক মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতে থাকেন আর একাকীত্বে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন। মসজিদ থেকে অল্প কিছু দূরে মুসলমানদের কয়েকটি আবাসভূমি ছিল। হযরতওয়ালা তাদেরকে নামাযের দাওয়াত দেন এবং তাদের ওপর এমনই মেহনত করেন যে, আল্লাহর দয়া ও করুণায় তারা নামাযী হয়ে গেল এবং মসজিদে আযান ও জামাত হতে লাগলো। লোকেরা উপহাস করে এই মসজিদকে মুসল্লীদের ঘাঁটি বলতে লাগলো।

শৈশবেই হযরতওয়ালা দা. বা. গভীর রাতের শেষ প্রহরে কাউকে না বলে একাকী মসজিদে চলে যেতেন এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যান ও মুরাকাবা আর জিকিরে মশগুল হয়ে থাকতেন।

একদিন হযরতওয়ালার পিতার বন্ধুদের একজন তাঁকে দেখে ফেলে এবং পিতার নিকট এই ঘটনা বলে দেয়। পরের দিন যখন হযরতওয়ালা ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে আসেন তখন তাঁর পিতা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলেকে দেখে বললেন, তুমি হলে আমার একমাত্র ছেলে। আর এই জঙ্গলে চোর-ডাকাত, দুশমন অনেক লোকই থাকে। তাই এত গভীর রাতে তুমি

একাকী আসবে না। ঘরেই তাহাজ্জুদ নামায পড়ে নেবে। পিতার আদেশ মেনে নিয়ে হযরতওয়ালা ঘরের ভেতরই তাহাজ্জুদের নামায পড়তে থাকেন। এই সকল অবস্থা দেখে তাঁর পিতাই তাঁকে মৌলভী বলে ডাকতে থাকেন। আর তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দরবেশ ও ফকীর বলতে লাগলো।

মাওলানা রুমী র. –এর মছনবী থেকে ফায়দা লাভ

হযরতওয়ালা দা.বা. মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী র. –এর মাছনাবী শরীফ থেকে সুকণ্ঠে পঠিত কিছু বায়াত শুনে আল্লাহর প্রেম ও মহব্বতে পড়ে যান। তাঁর কুরআনের উস্তাদ বড়ই সুমধুর কণ্ঠে মাছনাবী শরীফ পড়তেন। কুরআন শরীফ পড়ার পর হযরত তাঁর উস্তাদের নিকট আবেদন করতেন যে, তাঁকে যেন মাছনাবী শরীফ পড়ে শুনান। সুললিত কণ্ঠে মাছনাবী শরীফ হযরত-ওয়ালাকে শুনিয়ে তাঁর অন্তরকে আল্লাহর প্রেমে উম্মাদ করেছেন। এরপর থেকে হযরত মাওলানা রুমী র. কে হযরতওয়ালা খুব মহব্বত করতে লাগলেন এবং মাছনাবী শরীফ বুঝার জন্য ফারসী ভাষা শিখতে লাগলেন। হযরতওয়ালা প্রায়ই বলতেন, আমার প্রথম শায়খ হলেন, মাওলানা রুমী র. যার দ্বারা আমার তপ্ত হৃদয়ে প্রশান্তি এসেছে এবং আল্লাহর মহব্বতের অনুভূতি এসেছে। আল্লাহর মহব্বতের অনুভূতি সর্বপ্রথম মাওলানা রুমী র. থেকেই আমি পেয়েছি। তখন তিনি মাওলানা রুমী র. –এর বিভিন্ন কবিতা পড়ে কাঁদতে থাকতেন।

ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন

৭ম শ্রেণীতে পড়া শেষ হওয়ার পর হযরতের সম্মানিত পিতা গ্রামে ফিরে ইউনানী মেডিকেল কলেজ ইলাহাবাদে তাঁকে ভর্তি করে দেন। দীনী ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বলেন, ডাক্তারী পড়ার পর আরবী (দীনী) শিক্ষা গ্রহণ করবে। হযরত পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে ইলাহাবাদে ডাক্তারী শেখার জন্য চলে আসেন এবং সেখানে নিজের ফুফুর বাড়ীতে রইলেন। ওখান থেকে এক মাইল দূরে খালি ময়দানে একটি মসজিদ ছিল যেটাকে জিনদের মসজিদ বলা হত, সেই মসজিদে তিনি প্রায় সময় যেতেন এবং আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমার পিতা মহোদয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি যে আমাকে ডাক্তারী শিখাচ্ছেন যার কারণে আমি আমার অনেক বন্ধুদেরকে অসংযত হওয়া থেকে সাহায্য করতে পারবো এবং তাদেরকে সংযত রাখাতে আমার ডাক্তারী কর্মসমূহ দ্বারা তাদের প্রতি খেয়াল দিতে পারবো।

হযরত আশরাফ আলী থানভী র. –এর নিকট চিঠিপত্র আদান প্রদান

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. –এর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রাহাতুল কুলুব মুতালাআ করার পর এই সিলসিলার সাথে সম্পর্ক ও মহব্বত গড়ে ওঠে এবং হযরতের নিকট বায়াত হওয়ার জন্য চিঠি লিখেন। সেখান থেকে জবাব আসলো যে, হযরত খুবই অসুস্থ। হযরতের খলিফাদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচন করে নাও। তার কয়েকদিন পর খবর আসলো হযরত থানভী র. ইন্তেকাল করেছেন। এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি মনে খুব কষ্ট পেলেন। তখন কিছু শের পড়ার পর মনোকষ্ট কিছুটা দূর হয়ে যায়।

যেদিন মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করে ফুফুদের বাড়ীতে আসেন তখন তাঁকে জানানো হলো যে, সম্মানিত পিতার ছায়া তাঁর মাথার উপর থেকে চলে গেছে। তখন চিন্তা ও পেরেশানীর এক পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো এবং মনের মধ্যে কঠিন চিন্তায় ভরপুর হয়ে গেল। পরে নিজেকে কিছুটা সামলিয়ে পিতার কবরের পাশে গিয়ে হাজির হন। কবরের অবস্থার কথা চিন্তা করে মনকে বুঝান যে, এটাতো সবারই ঠিকানা হবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট রাখাই হবে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

নতুন পীর বা মুর্শেদের সন্ধানে

হযরত মাওলানা দা. বা. আল্লাহর প্রেমের পাগল ছিলেন। হযরত থানভী র. –এর ইন্তেকালের পর তাঁর সিলসিলার এমন কোন শায়খ ও মুর্শেদের সন্ধানে ছিলেন, যার অন্তর আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসায় ভরপুর ছিল। এ সময় ইলাহবাদের হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী র. এর সিলসিলার এক বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব দা. বা. ছিলেন। তাঁর দরবারে গিয়ে তিনি হাজির হন। প্রতিদিন আসর থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত হযরতের খেদমতে তিনি থাকতেন।

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব র. অনেক বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ লোক ছিলেন। হযরতের প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালবাসা রাখতেন। হযরতওয়ালা কখনও যদি রাতে কিয়ামুল লাইল করতেন তখন মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব র. ঘর থেকে নিজের বিছানা নিয়ে বের হয়ে খানকায় চলে আসতেন এবং বলতেন এখানে অনেক বড় বড় আলেম-ওলামা আসেন কিন্তু আমি কারো জন্যই ঘর থেকে বের হয়ে আসি না। শুধু আপনার জন্যই ঘর থেকে বের হয়ে খানকায় শোয়ার জন্য আসলাম। এক চিঠিতে লিখেন, আপনি আমাকে যেরূপ মহব্বত করেন এরূপ মহব্বতকারী আর দ্বিতীয় কেউ

দুনিয়াতে নেই। হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী র. বলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেবের সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনেক উঁচু পর্যায়ের একটি সিলসিলা।

পরে হযরতের শায়খ তাঁকে শাহ আশরাফ আলী র. এর– বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরীকে তাঁর মুর্শিদ বানানোর জন্য সিদ্ধান্ত দেন।

শায়খের খেদমতে উপস্থিতি

হযরতওয়ালা দা. বা. তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ এর সাথে বেশি বেশি দেখা করতেন এবং তাঁর খেদমতের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। যখন যেতে পারতেন না, তখন মসজিদে গিয়ে তাঁর মালফুজাত পড়তে থাকতেন এবং সময় সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন।

শায়খের মহব্বত এবং খেদমত ও মুজাহাদা

তিনি শায়খের সাথে তাহাজ্জুদের সময় উঠতেন। তাঁকে ওজু করাতেন। আর যখন শায়খ ইবাদাতে মশগুল থাকতেন তখন তিনি শায়খের পিছনে থাকতেন যাতে শায়খের ইবাদাতে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না হয়। তাহাজ্জুদ থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় সাত ঘণ্টা ইবাদাত করতেন। দুপুরে শায়খ ও মুরীদ উভয়ে মিলে এক সাথে খাবার খেতেন। এভাবে দশ বছর পর্যন্ত কোন নাস্তা খাননি। তিনি বলতেন, আমার সকালের নাস্তা হলো শায়খের দিদার, জিকির, তেলাওয়াত ও ইশরাকের নামায। তিনি শায়খের সোহবতে মোট সতের বছর ছিলেন।

দীনী ইলম শিক্ষা

তিনি শায়খের মাদরাসা বায়তুল উলূমে দীনী ইলম শিক্ষা করেন। কিছু সাথী পরামর্শ দিল দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু হযরত তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সেখানে আমার শায়খের সোহবত পাওয়া যাবে না, যা হলো ইলমের রূহ। এখানে আমার দীন শিক্ষার সাথে সাথে শায়খের সোহবতও মিলবে যার বরকতে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। হযরত খুব মেহনত করে আট বছরের দরসে নেজামীকে চার বছরে পূর্ণ করেন এবং বুখারী শরীফ তাঁর শায়খ আব্দুল গণী র. থেকে পড়েন। আব্দুল গণী র. এক মাধ্যমে গাঙ্গুহীর ছাত্র। এই দিক দিয়ে তাঁর সনদ অনেক উন্নত।

হযরতওয়ালার সাধারণ জীবনযাপন

হযরতওয়ালার জীবন যাপন ছিল সহজ-সরল, সাদা-সিধে, আল্লাহর প্রতি গভীর মহব্বত আর সঠিক রাস্তায় থেকে ইবাদাতে মুজাহাদা করতে থাকেন। তিনি তাঁর প্রতিবেশী এক মহিলাকে বিবাহ করেন যার বয়স তাঁর চেয়ে দশ বছরের বেশি। কিন্তু পুরো গ্রামে তাঁর দীনদারী ও বুযুর্গী প্রসিদ্ধ ছিল।

পাকিস্তান হিজরত

১৯৬০ সালে শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী র. এর সাথে তিনিও পাকিস্তানে হিজরত করে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর বিবি ও ছোট বাচ্চা মুহাম্মাদ মাজহার মিয়াকে হিন্দুস্তানে রেখে আসেন। এক বছর পর্যন্ত তিনি সম্পদ কম থাকার কারণে তাদের দেখাশুনা করতে পারেননি। হযরতওয়ালা তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, সে আমার নিকট রাবেয়া বসরীর মত ছিল।

খিলাফত ও বায়াতের ইজাজত

হযরত মাওলানা আব্দুল গণী র. এই অছিয়ত করেন যে, তাঁর সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাঁরা তাঁর ওফাতের পর থানভী র. এর শেষ খলিফা শাহ আবরারুল হক দা. বা. এর দিকে যেন ফিরে যায় এবং তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে। তাই শায়খের অছিয়ত মোতাবেক তিনি আবরারুল হক সাহেবের সাথে সম্পর্ক কায়েম করেন এবং দু'বছর পর খেলাফত লাভ করেন। তিনি একবার একটি স্বপ্নে দেখেন যে, শাহ আব্দুল গণী র. হযরত শাহ আবরারুল হক সাহেবকে বলেন যে, আপনি আখতারকে ইজাজত দিন। এর কিছুদিন পর তা বাস্তবে প্রকাশ পায়।

শাহ আবরারুল হক সাহেবের নিয়মানুযায়ী হযরতওয়ালাকে বললেন, আপনাকে কারী সাহেবের নিকট নূরানী কায়দা পড়তে হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে কারী সাহেব আপনার নিকট এসে আপনাকে পড়াবে। তখন তিনি বললেন, না, হযরত! আমি মক্তবে গিয়ে পড়বো। তখন তিনি বাচ্চাদের সাথে গিয়ে বসে নূরানী কায়দা পড়লেন। শাহ আবরারুল হক র. কয়েক জায়গায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠা

হযরতওয়ালা দা.বা. প্রথমে করাচীর নাজেমাবাদ থাকতেন। পরে শাহ আবরারুল হক র. এর নির্দেশে করাচীর গুলশানে ইকবালে খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠা করেন ও নাজেমাবাদ থেকে গুলশানে ইকবালে চলে আসেন। বর্তমানে এই খানকাহ সারা বিশ্বের জন্য মারকাজ এবং হযরতের সাথে সম্পর্ককারী ও ছাত্র আফ্রিকা, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, ইরান, কানাডা, সৌদী আরব, আরব আমিরাত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইসলাহ ও তাযকিয়ার জন্য হাজির হন এবং হযরতের সোহবত ও মূল্যবান নছিহতের দ্বারা নিজেরা ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেন। বিশেষ করে বড় বড় আলেমে দীন, সারা বিশ্ব থেকে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইলমের হাকীকত কায়ফিয়াতে এহসানিয়ার দ্বারা নিজেদের অন্তরসমূহকে আলোকজ্জ্বল করেন।

আল-আখতার ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট

আল্লাহওয়ালাদের কাজই হলো স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক জুঁড়ে দেয়ার পাশাপাশি সৃষ্টির খেদমতের আঞ্জাম দেয়া। হযরত মাওলানা মুজাহির মিয়া সাহেব হযরতের মাখলুকের খেদমতের জন্য এ জনসেবার কার্যাবলী শৃংখলাবদ্ধ করে এর নাম দেন আল-আখতার ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট। যেখান থেকে অনেক বড় খেদমতের আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। যার বিস্তারিত লিখতে হলে অনেক বড় কিতাব হয়ে যাবে।

রচনাবলী

১. মারেফাতে এলাহী (১-২), ২. সিরাতে মুসতাকিম, ৩. শরাব কা হারাম হোনেকা সুবুত, ৪. মালফুজাতে মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী, ৫. মারেফাতে মাসনাবী, ৬. রূহ কা বিমারী আওর উনকা এলাজ, ৭. মাজালিসে আবরার, ৮. এক মিনিটের মাদরাসা, ৯. পিয়ারে নবী কি পিয়ারে সুন্নাতী, ১০. সুহবতে আহলুল্লাহ আওর উসকা কাওয়ায়েদ।

হযরতের কয়েকটি মালফুজাত

১. ফুয়ুজে রব্বানী ২. আলতাফে রব্বানী ৩. আফজালে রব্বানী ৪. এনআসাতে রব্বানী ৫. ইনায়াতে রব্বানী ৬. তবায়াতে রব্বানী ৭. রেঙ্গুন থেকে ঢাকা সফর।

হযরত মাওলানা শায়খ মহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক সাহেব র. হায়দারাবাদে এক বড় মজলিসে তাঁকে আরেফ বিল্লাহ উপাধী দিয়েছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সিদ্দীকী ট্রাস্টের অফিসে

✍ ১৯৮৭ সালে করাচী যাওয়ার পর সিদ্দীকী ট্রাস্টের কথা শুনতে পাই। এক দিন নিউটাউনের কাছে লাশবেলা চকের নিকট সিদ্দীকী ট্রাস্টের অফিসে পৌঁছে যাই। অফিসে ঢুকে দেখতে পাই একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ শুভ্রদাঁড়ি মণ্ডিত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এক বুযুর্গ বসে আসেন। সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে কথাবার্তা শুরু করি। জিজ্ঞাসা করি সিদ্দীকী ট্রাস্ট কায়েম করার ইতিহাস এবং কার্যক্রম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তিনি একের পর এক ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে চলেন।
অল্প সময়ের মধ্যে আমি তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে অনেক বিষয় জেনে নেই। আলোচনা বুঝতে পারি। তিনি এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ ট্রাস্ট কায়েম করেছেন। তিনি আমার দ্বারা বাংলাদেশে এ ট্রাস্টের মাধ্যমে বইপত্র প্রকাশ এবং প্রচারের উৎসাহ ব্যক্ত করেন। আমি ট্রাস্টের সদস্য হয়ে যাই। তিনি মাঝে মাঝে আমার নামে ট্রাস্টের প্রকাশিত বইপত্র পাঠাতে থাকেন। আমি করাচী গেলেই তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাত করতাম। বুঝতে পারতাম ট্রাস্টের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। সমগ্র পাকিস্তানের গন্ডি ছাড়িয়ে এ ট্রাস্টের কার্যক্রম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সফরে যেয়ে এক দিন হাজির হয় সিদ্দীকী ট্রাস্টের অফিসে। জানতে চেষ্টা করি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মনসুরুজ্জামান খান সিদ্দীকী সাহেব আছেন কি না? ট্রাস্টের এক ভাই বললেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে অফিস করেন না। তাঁর ছেলে বর্তমানে দায়িত্বশীল। অনেক আফসোস নিয়ে ফিরে আসি। হাতের সময় না থাকার কারণে জনাব খানের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়নি। সে সময়েই দিল খুলে দুআ করেছিলাম তাঁর সুস্থতার জন্য।

সিদ্দীকী ট্রাস্ট করাচীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সিদ্দীকী স্ট্রাস্ট করাচীর বিশ্বখ্যাত একটি সেবা সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটির সেবা ও কল্যাণের ধারা অব্যাহত রয়েছে বিভিন্ন দেশে। বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নৈতিক অধঃপতনের মধ্যেও

এই প্রতিষ্ঠানটি জাতির জন্য বাতিঘর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে দিন দিন এর প্রসার ঘটছে।

প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু রয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. বিশেষ মূল্যছাড় ব্যবস্থা

দীনের খাদেমদের জন্য বিশেষ কমিশনে নামমাত্র মূল্যে দরসী এবং ফিকহি কিতাবাদি দেয়া হয়। প্রতি বছর রমযান ও মহররম মাস উপলক্ষে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ভবিষ্যতেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা থাকলে এটি চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

২. কুরআন-হাদীসের ব্যাপকায়ন

এ বিভাগের কার্যক্রম হচ্ছে দেশ-বিদেশের মাদরাসা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে কুরআন শরীফ, কায়েদা, আমপারা এবং হাদীসের বিভিন্ন সংকলন ফি সাবিলিল্লাহ বিতরণ করা। বিশেষ ছাড় বিভাগের পক্ষ থেকে নামমাত্র মূল্যে বহু আরবী ও উর্দূ কিতাব মাদরাসার ছাত্র এবং আলেমদেরকে দেয়া হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনী শিক্ষার ব্যাপকায়ন ও কিতাব অর্জনের পথ সহজ করা। বিদেশের যে রাষ্ট্রগুলোতে পাঠানো হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– নেপাল, বার্মা, বাংলাদেশ ও পুরো আফ্রিকা মহাদেশ। এদেশগুলোতে আবেদনের প্রেক্ষিতে কিতাবপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী ও দূরবর্তী এলাকাগুলোতে যেমন চিতরাল, উত্তরাঞ্চলের কলকাত, দিয়াশর, গোদাস, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, সিন্ধু, মাকরান, খারান অঞ্চলের মাদরাসাগুলোতে এই অনুদান চালু রয়েছে। তাছাড়া চিনা, বসনিয়া, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করে সে ভাষাভাষিদের নিকট পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এমনি ইউরোপ-আমেরিকার কারাগারগুলোতেও তাদের এই অনুবাদ কপি পৌঁছানো হচ্ছে।

৩. ধর্মীয় বই-পুস্তকের প্রচার-প্রসার

ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ছাপা এবং বিতরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। যে বইগুলো এখন এক টাকার বিনিময়ে বিতরণ করা হচ্ছে তাতে খরচ হয়েছে কমপক্ষে দেড় টাকা। যা ভবিষ্যতে আরো বেড়ে যেতে পারে। তবে সংস্থার ইচ্ছা হচ্ছে হাদিয়া বর্তমান মূল্য থেকে বৃদ্ধি করা হবে না এবং অতিরিক্ত খরচ দানশীলদের অনুদান দ্বারা পূরণ করা হবে। পূর্বে কমিশন থেকে ষোল বছর পর সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামীতে সকল বই হোয়াইট প্রিন্ট কাগজে প্রকাশ করা হবে। বাঁধাই থাকবে আর্ট পেপার দ্বারা। তবে হাদিয়া পূর্বেরটাই

বাকি থাকবে। ট্রাস্ট্রের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ২৫০০ কিতাব ও বই প্রকাশ করা হয়েছে। যার বৃহদাংশ তথা ২১৫০ খানি উর্দূ ভাষায়। আর বাকীগুলো আরবী, ইংরেজি, ফারসী, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী বসনিয়া, আলমানিয়া, রুশ, উজবেক, ফার্সি, বাংলা, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্যের বই বের করা হয়েছে। বিদেশী আহলে খায়েরদের সহযোগিতায় এই খেদমত পূর্ণ আস্থা এবং গুরুত্বের সাথে চালু রয়েছে।

৪. মসজিদ-মাদরাসা ও নলকূপ স্থাপন

ট্রাস্টের অধীনে এ খেদমত কালকাত, চাতরাল, দিয়ামোর, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, মাকরান প্রভৃতি অঞ্চলে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গুদাজ জেলায় যা কালকাত শহরের নিকটে অবস্থিত। সেখানে এক প্রকল্পে এগারটি মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন ও মেরামত করা হয়েছে। এবং দুটি মেডিকেলও স্থাপন করা হয়েছে। কালকাত, ইস্কারদো এবং বেলুচিস্তানের মুশতুঙ্গ শহরেও ফ্রি মেডিকেল টিম সেবা করে যাচ্ছে। মাকরানের পার্শ্ববর্তী শহর খারানেও মসজিদ মাদরাসা এবং নলকূপ স্থাপন করা হচ্ছে।

চাতরালে সত্তরটি এবং সিন্ধুতে উনচল্লিশটি, মাকরানে বারটি, বেলুচিস্তানে দুটি, গোদারে এগারটি, কাশ্মীরে একশটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এমনিভাবে দেশব্যাপী প্রায় ২২৫ টি মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে। ভেরা জেলার সেরগোদাহ এলাকার ঐতিহ্যবাহী শেরশাহী জামে মসজিদের সংস্কারও এ সংস্থা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এটি সংস্থার একটি বৃহৎ প্রকল্প। যার অধীনে তিন বছর যাবত কাজ চলে আসছে। এ মসজিদটি বাবরী মসজিদের মতো অনেক প্রাচীন ও বৃহৎ মসজিদগুলোর একটি। মসজিদটির সংস্কারের দায়িত্ব সরকারের ওপর থাকলেও তারা সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। তাই আল্লাহর ঘর তার বান্দাদেরকেই দেখতে হবে সে জন্য ট্রাস্ট প্রতি বছর এর সংস্কারের জন্য লক্ষ লক্ষ রূপী অনুদান দিয়ে আসছে।

মাকরান অঞ্চলে মসজিদের পাশে নলকূপও স্থাপন করা হচ্ছে। যে সকল স্থানে পানির ঘাটতি রয়েছে সেখানে মাদরাসাগুলোর সাথে কূপ স্থাপন করা হচ্ছে। যাতে এলাকাবাসীও এর দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। এ পর্যন্ত পঁচিশটি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

মসজিদ নির্মাণ ও মেরামত, কূয়া স্থাপন, ওজুখানা ও পবিত্রাগার ইত্যাদি চাতরাল, সিন্ধু, মাকরান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি শহরের যেখানেই প্রয়োজন হচ্ছে এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন এবং খোঁজ-খবর নিয়ে সত্যতা যাচাইয়ের পর

প্রয়োজনমাফিক স্থাপন করে দেয়া হচ্ছে। তবে সত্যতা যাচাই এবং তদন্ত ব্যতীত কোন কার্যক্রম চালানো হয় না। আগামীতে কাশ্মীর, চাতরাল, মাকরান, সিন্ধুর প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলেও মসজিদ মাদরাসা সংস্কারের ধারা চালু থাকবে।
প্রকল্পের এলাকায় ট্রাস্টের দায়িত্বশীলগণ গিয়ে সেখানকার প্রয়োজনীয়তা এবং কাজের যথার্থতা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। নির্মাণ ও সংস্কার শেষে ট্রাস্টের প্রতিনিধিগণ তা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

৫. বিদেশে সেবার কার্যক্রম

আলবানিয়া, বসনিয়া, রাশিয়া মহাদেশের মুসলিম দেশগুলো যেমন– উজবেকিস্ত ান, তাজেকিস্তান, কার্গেজিস্তান, কাজিকিস্তানে বিদেশী বন্ধুদের সহায়তায় সেবার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে (১) মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা (২) কুরআন শরীফ ছাপা ও প্রকাশের ব্যবস্থা (৩) স্থানীয় মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ এবং এগুলো বন্টনের জন্য স্থানীয় আয়োজন।
তাছাড়া বাংলাদেশ, নেপাল, কেনিয়া, বসনিয়া এবং রুশ প্রভৃতি মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে কার্যক্রম চালু আছে। বাংলাদেশ ও নেপালে ৭৫খানি কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
আলবেনিয়া, বসনিয়া, আফগানিস্তান এবং কার্গেজিস্তানের জন্য কম্বল ও গরম কাপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। বিদেশে সাহায্যের অনুদান বিদেশী আহলে খায়ের বন্ধুদের থেকেই আনা হয়ে থাকে।

৬. যাকাত ও সদকা ফান্ড সংগ্রহ

যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসাগুলোর গোরাবা ফান্ডে সহযোগিতা, গরীবদের মাঝে রেশন ও ঔষধ বিতরণ, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ছাড়াও এ অর্থ কাশ্মীরের শহীদদের পরিবার এবং যুদ্ধাহত পরিবারের সেবা যত্নে খরচ হয়ে থাকে।
শহীদান ও জিহাদে আহতদের পরিবারের সেবা-শশ্রুষা একটি মৌলিক ফরজ। তাই যারা সরাসরি তাদের সাহায্য পৌছাতে চান তারা আমাদের থেকে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারবেন। অথবা ট্রাস্টের মাধ্যমেও পৌছাতে পারবেন। কাশ্মীর থেকে হিযরতকারীদের জন্য গরম কাপড়, রেশন, ঔষধ, তাঁবু স্থাপন, কুরআন শরীফ, ধর্মীয় সাহিত্য বই ইত্যাদির খুবই প্রয়োজন। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। তবুও এ খাতে আরও ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন।

গত কয়েক বছর ধরে হামদর্দ দাওয়াখানা (ওয়াক্‌ফ) করাচীর পক্ষ থেকে চাতরাল, কালকাত, বেলুচিস্তানের বিভিন্ন পল্লীতে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। সেখানে এর খুবই উপকার ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। তাছাড়া ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের এক ধরনের কার্টুন বানানো হয়ে থাকে। যাতে পনের থেকে বিশ রকম ঔষধ ভরা হয়। সাথে সাথে রাখা থাকে ঔষধ ব্যবহারের দিকনির্দেশনা সম্বলিত কাগজ যাতে ছবিসহ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এই কার্টুনগুলো পাঠানো হয় আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে। তারপর তা জমা হয় স্থানীয় মসজিদসমূহের ইমাম সাহেবগণের নিকট। প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ তাদের থেকে এলাকাবাসী নিয়ে থাকেন।

এ কার্যক্রম প্রথমত পঞ্চাশ কার্টুন দ্বারা শুরু করা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন প্রতি বছর কমপক্ষে পাঁচশত কার্টুন পাঠানো হয়ে থাকে। এভাবেই ইউনানী ও এ্যালোপ্যাথিক উভয় ধরনের ঔষধ আক্রান্ত এলাকায় পৌঁছে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা এর মাধ্যমে উপকৃত করুন।

ট্রাস্টের মৌলিক কর্মপন্থা

ট্রাস্ট সকল প্রকার রাজনীতি, বাণিজ্য, মতানৈক্য থেকে দূরে থেকে শুধুমাত্র দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর আহবান জাতির দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে থাকে। এটি কোন মতবাদের মুখপাত্র নয় বা কোন দলের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। কিংবা কোন বিশেষ দলের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসাকেই বেশি সাহায্য দেয় এমনও নয়।

মুসলমান এক জাতিতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমেই শুধু সব কিছুর শীর্ষে পৌঁছতে পারে। কুরআনের মূল বিধান আঁকড়ে ধরে যে কোন মাযহাব গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি যার যার ঐচ্ছিক বিষয়। যার যেভাবে সহজ হয় সেভাবে আমলের পথ গ্রহণ করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায়ই মূল থাকতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ। আমল এ দুটি অনুযায়ী হওয়া জরুরী। মৌলিক বিষয়ের জ্ঞানার্জন ও তার ওপর আমল করার পরই প্রশ্ন হয় দল মত গ্রহণ করার। ট্রাস্ট সেদিকে গুরুত্ব দেয় না। বরং উদারতার স্বার্থে মৌলিকতার ওপরই অবিচল থাকে।

ট্রাস্টের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে এখানে সাধারণ চাঁদা কালেকশন হয় না। কোন দূত বা উসূলকারী নেই। কোন ধরনের প্রসিদ্ধকরণ, পাবলিসিটি, হ্যান্ডবিল ও পোস্টারের কার্যক্রম এখানে নেই। যে কেউ চায় অংশ নিতে

পারে। সদস্য ফরমও যে কেউ আবেদন করতে পারে। ট্রাস্টের কোন জায়গা জমি ব্যবসা বা আমদানির কোন নির্ধারিত খাত নেই। সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও কোন সাহায্য নেয় না। বরং এ বিশাল ব্যবস্থাপনা শুধু আল্লাহর সাহায্যের ওপরই নির্ভরশীল।

আয়ের উৎসসমূহ

১. যাকাত ও সদকা

এ ফান্ডের অনুদান দিয়ে দীনী মাদরাসাগুলোকে সাহায্য, ছাত্রদের জন্য কাপড়-চোপড়, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাগ্রহণ এবং আক্রান্তদের ঔষধ ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে এবং কাশ্মীরের উদ্বাস্তুদের সেবা করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া জরুরী ও তৎক্ষণাত প্রয়োজনগুলোতে এ খাত থেকে খরচ করা হয়।

২. দান

এ খাতের টাকা দ্বারা কুরআন হাদীসের প্রচার-প্রসার, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, কিতাব ও বইয়ের প্রসার ঘটানো হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি বিষয়ের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয় এবং যে দান যে উদ্দেশ্যে দেয়া হয় ইনশাআল্লাহ তাতেই খরচ করা হয়। যে সকল কাজে যাকাত ফান্ড থেকে খরচ করা না জায়েয তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য দান ফান্ডের টাকা খরচ করা হয়। আর অফিসের ব্যয়ভার ট্রাস্টের সদস্যগণ বহন করে থাকেন।

৩. ট্রাস্ট সদস্যদের দান

ট্রাস্ট সদস্য যারা স্থানীয় পাকিস্তানী তাদের বার্ষিক ফি পাঁচশত রূপী। আর যারা বিদেশী তাদের বার্ষিক ফি পনের শত রূপী। এ অনুদান মূলত দান খয়রাত হিসেবেই গণ্য। এ দানের মাধ্যমে যে কার্যক্রম চালানো হয় তার একটি হল সাময়িক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্বলিত পত্র ও বই ডাকযোগে সাধারণ পাঠকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। যাতে করে তারা ঘরে বসেই সঠিক মাসআলা সর্ম্পকে অবগত হতে পারে। সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্য কারো যেন এমন না হয় যে, মূল্য ছাড় ব্যবস্থা থেকে শুধু বই গ্রহণ করা হবে এবং সুবিধা ভোগ করা হবে। তাছাড়া ট্রাস্ট সদস্যদের পেছনে যত রূপী খরচ হয় এর মাত্র দুই তৃতীয়াংশ তাদের থেকে উসূল হয়। তা সত্ত্বেও সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে হলে চাঁদা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হয়। এ বার্ষিক দানের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। যা ট্রাস্টের নিশ্চিত ভিত্তি বললেই চলে।

লাইব্রেরী, মাদরাসা এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কোন সুবিধা পেতে হলে সদস্য পদ গ্রহণ করা জরুরী।

শেষ কথা

সিদ্দিকী ট্রাস্ট মুসলিম বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় একটি আদর্শ সেবা সংস্থা। মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে এ ধরনের সংস্থার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। অধঃপতিত মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মালদার সুহৃদ দীনী ভাইদের এ পথে এগিয়ে আসা সময়ের অনিবার্য দাবী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

করাচীর বিশিষ্ট উলামায়ে দীন

আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী র.

'আরাম-আয়েশ মানব জীবনের সবয়ে বড় শত্রু। সাপ মানুষের বড় দুশমন হওয়া সত্ত্বেও কোন সময় কোন মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে বসে এবং তাকে দংশন করা থেকে বিরত থাকে বা এমন হতে পারে যে, বিষ তার উপর কোন প্রতিক্রিয়া করেনি এবং মানুষ বিষ পান করার পরও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু কোন কওম বা জনগোষ্ঠী আরাম-আয়েশ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তার মধ্যে ডুবে গেলে, কঠোর পরিশ্রম এবং সাধারণ জীবন-যাপন থেকে দূরে সরে গেলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কোন রূপ সম্মানের জীবন দান করেন না। আরাম প্রিয়তা এবং মানব জীবনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। জীবনের জন্য আরাম-আয়েশ তালাশ করা, মানুষের জন্য এক দুরারোগ্য রোগ এবং আরাম-আয়েশের উপস্থিতি মানুষের ইজ্জত এবং সম্মানের জন্য মউতের পয়গামস্বরূপ।" স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত উপরের বাক্যগুলো বলেছিলেন খ্যাতনামা দার্শনিক, আলেম ও চিন্তাবিদ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র.।

জন্ম

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ১৩০৫ হিজরীর ১০ই মহররম মোতাবেক ঈসায়ী ১৮৮৭ সালে বিজনৌরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান। হযরত উসমান রা. পর্যন্ত তাঁর বংশ পরস্পরা মিলিত হবার কারণে তিনি তাঁর নামের শেষে উসমানী শব্দ ব্যবহার করেন। মাওলানা ফযলুর রহমান সে সময় বিজনৌর শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনসপেক্টর ছিলেন। তিনি সে যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান এই কলেজের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছিলেন। ফারসী ভাষায় তার প্রচুর দখল ছিল এবং এ ভাষায় তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বৃটিশ গভর্মেন্টের অধীনে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন। জীবনের শেষদিকেও দীনী এবং ইলমী কাজে নিজেকে জড়িত রাখেন এবং বিশেষ করে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী র. এর

সাথে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১২৮৩-১৩২৫ পর্যন্ত দারুল উলূমের উন্নতিকল্পে জীবনকে ওয়াকফ করে দেন। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী এবং মুফতী আযীযুর রহমান তাঁরই দুই সুযোগ্য পুত্র।

শিক্ষা

দেওবন্দে জনাব হাফেয মুহম্মদ আযম সাহেবের নিকট ছয় বছর বয়সে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানীর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এরপর ১৩১৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে উর্দূ-ফার্সী পড়া শুরু করেন। ১৩১৮ হিজরীতে তাঁর আরবী পড়া শুরু হয় এবং দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন খ্যাতনামা উস্তাদগণের নিকট পড়াশোনা করেন। হযরত উসমানী ছিলেন খুবই ধীশক্তি-সম্পন্ন। প্রতি ক্লাসেই তিনি প্রথম হতেন এবং শতকরা নিরানব্বই নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন। ১৩২৫ হিজরীতে কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান নিয়ে তিনি দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পাশ করেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব, হযরত মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব, মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব প্রমুখ বিখ্যাত আলেম তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

বিবাহ

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ১৯০৫ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চিরজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য নিজের আত্মীয় স্বজনদের আওলাদকে বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন এবং তাদের খুবই মহব্বত করতেন।

অধ্যাপনা

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে কুরআন-হাদীসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর আল্লামা উসমানী তাঁর অর্জিত জ্ঞান-গবেষণাকে আদর্শ আলেম তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য অধ্যাপনার মহান দায়িত্বকে বেছে নেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই খুব ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং তখন থেকেই অন্যান্য ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে কিতাব বুঝার জন্য ভিড় জমাতো। একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে দারুল উলূমে লেখাপড়া শেষ করার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের যোগ্য সাগরেদকে তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়ে তাঁকে ১৩২৬ হিজরীতে দারুল উলূমে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি সিনিয়র অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা শুরু করেন।

মাদরাসা ফতেহপুরীতে

হযরত মাওলানা উসমানী দারুল উলূমে অধ্যাপনা শুরু করার পর দিল্লীর বিখ্যাত মাদ্রাসার জন্য একজন যোগ্য প্রধান মুহাদ্দিসের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে মৌলভী আবদুল আহাদ সাহেব দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম জনাব হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব উসমানীর নিকট আবেদন জানান। মুহতামিম সাহেব (যিনি হযরত উসমানীর বড় ভাই ছিলেন) তাকে এ পদের জন্য যোগ্য মনে করে ফতেহপুরী মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। ১৩২৮ হিজরী পর্যন্ত তিনি সেখানে হাদীস এবং তাফসীরের দরস দেন এবং এ সময় আল্লামা ইব্রাহীম বিলয়াভীও ঐ মাদরাসার অধ্যাপক হয়ে আসেন। মাওলানা উসমানী বক্তৃতা ও কলমের মাধ্যমে এবং অধ্যাবসায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পুনরায় দেওবন্দে

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর মত সুদক্ষ গবেষক আলেমের প্রয়োজন ছিল এশিয়ার আল আজহার-দারুল উলূম দেওবন্দের। এ বিষয়টি উপলব্ধি করেই মজলিসে শূরায় মাওলানাকে দারুল উলূম ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে তিনি ১৩২৮ হিজরীর প্রথম দিকে পুনরায় দারুল উলূমে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উপরের জামাতের কিতাব পড়াতে শুরু করেন। ১৩৩৮ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ র. হজ্জে যাওয়ার পর, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হযরত শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রধান অধ্যাপক মনোনীত হন। তিনি বুখারী ও তিরমিযী পড়ানো শুরু করেন। তখন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ সাহেব মুসলিম শরীফ পড়াতেন।

এভাবে হযরত শায়খুল হিন্দের উপস্থিতিতেই উসমানী সাহেব সাত-আট বছর হাদীসের অধ্যাপনা করে আসছিলেন। তিনি সাধারণতঃ মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফের দরস দিতেন। সে সময় হযরত শায়খুল হিন্দের পরে এ দু'ব্যক্তিই হাদীস শাস্ত্রের এসব বিখ্যাত কিতাবের দরস দানের সবচে' বেশি যোগ্য ছিলেন বলে মনে করা হয়। আল্লামা উসমানী প্রথম জীবনে দর্শন এবং ইলমে কালাম মোতাবেক ফালসাফা প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন পরে আস্তে আস্তে কুরআন এবং হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেন এবং শেষ জীবনে কুরআন এবং হাদীসের দরস-তাদরীস এবং গবেষণায় কাটিয়ে দেন।

ডাভেলের জামেয়া ইসলামিয়া

আল্লামা উসমানী দারুল উলূম দেওবন্দে খুবই সুনামের সাথে অধ্যাপনায় রত ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় দুর্ভাগ্যক্রমে মাদরাসার কয়েকজন খ্যাতনামা উস্তাদের

সাথে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ দেখা দেয়। যার ফলে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, মাওলানা হিফযুর রহমান, মুফতী আতীকুর রহমান এবং আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম গুজরাটের ডাভেল জামেয়া ইসলামিয়ায় গমন করেন। মাদরাসার পূর্ব নাম ছিল তালীমুদ্দীন্। অল্প সময়ে ডাভেলের ক্ষুদ্র মাদ্রাসাটি একটি উন্নত মানের মাদরাসায় পরিণত হয় এবং ঐ এলাকায় শিরক, বেদআত এবং বদদীনি রুসুম-রেওয়াজ দূরীভূত হয়। (১৩৪৬ হিজরী) এ মাদ্রাসায়ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বুখারী এবং তিরমিযী পড়াতেন।

১৩৫২ হিজরীতে হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীর ইন্তেকাল করলে মাওলানা উসমানী শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন এবং বুখারী এবং তিরমিযী দরস দেয়া শুরু করেন। ডাভেলে অবস্থানকালে তিনি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তাবলীগী দায়িত্ব পালন করতেন।

আবারও দেওবন্দে

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী এবং মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীসহ কতিপয় খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ডাভেল মাদ্রাসায় চলে যাবার পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে র. শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত করা হয়। আর এটা বাস্তব যে, শাহ সাহেব এবং উসমানী সাহেবের চলে যাওয়ার পর শায়খুল হাদীস পদের জন্য হযরত মাদানীর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যক্তিত্বের আশা করা মুশকিল ছিল। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের মত প্রতিষ্ঠানের জন্য আল্লামা উসমানীর মত খ্যাতনামা, সকল বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য আলেমের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এবং এ ব্যাপারটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে অনুভবও করছিলেন। অবশেষে মাদরাসার তৎকালীন পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. এবং মজলিসে শূরার আরো কয়েকজন সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টায় হযরত মাওলানা উসমানীকে দারুল উলূমের সদর মুহতামিম পদ গ্রহণ করতে রাজী করান। ঐ সময় তিনি ডাভেল মাদরাসার দায়িত্বেও ছিলেন এবং দারুল উলূমেরও দেখা শোনা করতেন। তিনি উক্ত পদে ১৩৬২ (১৯৪৪ ঈসায়ী) হিজরী পর্যন্ত সমাসীন ছিলেন। দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব সাহেবের যুগ দারুল উলূমের সোনালী যুগ। তা সত্ত্বেও আল্লামা উসমানীর মত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁকে দারুল উলূমের সদর মুহতামিম নিয়োগ করা হয়। হযরত উসমানীর আমলে দারুল উলূমের অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

দেওবন্দে স্থায়ীভাবে অবস্থান

দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুহতামিম পদ গ্রহণ করার পর মসলিসে শূরার সদস্যগণের ইচ্ছা ছিল, হযরত উসমানী স্থায়ীভাবে দারুল উলূমে অবস্থান করুন। কিন্তু যেহেতু তিনি ডাভেল মাদ্রাসারও দায়িত্বে ছিলেন এজন্য বেশির ভাগ সময় তাঁকে ডাভেলে থাকতে হত। দারুল উলূমের দায়িত্ব গ্রহণ করার ছয় বছর পর তিনি ডাভেল থেকে বিদায় নিয়ে স্থায়ীভাবে দারুল উলূমে চলে আসেন।

পুনরায় ডাভেল

দারুল উলূমের সদরে মুহতামিম হবার পর বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ১৩৬২ হিজরী শাবান মাসে তিনি এ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৩৬২ হিজরীর ২৪শে রবিউল আউয়াল থেকে ডাভেলের মাদ্রাসায় পুনরায় হযরত উসমানীর দরস শুরু হয়। ১৩৬৩ হিজরীর শাবান মাসে ডাভেল থেকে কোন কাজে দেওবন্দ আসলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক বছর অসুস্থ অবস্থায় দেওবন্দে কাটান। আল্লামা উসমানী র. ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাথে জড়িত ছিলেন এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি জমিয়তের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। জমিয়তের কোন কোন কাজের ব্যাপারে নীতিগতভাবে তাঁর বিরোধও ছিলো। বিশেষ করে হিন্দুদের স্বার্থে ইসলামের সবকিছুকে বিলিয়ে দিতে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। মোটকথা, এ দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতা এবং লেখনীর মাধ্যমে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সদস্য হিসেবে খুব বড় ধরনের খেদমত আঞ্জাম দেন।

১৯৪৫ সাল থেকে আল্লামা উসমানীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এ সময় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। কংগ্রেস ছিল বহুজাতি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দল। অপরদিকে মুসলিম লীগ ছিল শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক প্লাটফরম। যার লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পাকিস্তান অর্জন। গোটা উপমহাদেশে তখন এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। হযরত উসমানী এ সময় অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হবার পর আল্লামা উসমানী পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নামে পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্যে একটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকার স্বার্থে সকল মুসলমানকে মুসলিম লীগে যোগদানের আহবান জানান। আল্লামা উসমানী পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী হযরত উসমানীকে মোবারকবাদ জানান।

পাকিস্তান আন্দোলনে আল্লামা উসমানী

পাকিস্তান আন্দোলনকে কামিয়াব করার জন্য মাওলানা উসমানীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর মত খ্যাতনামা আলেমের মুসলিম লীগের প্রতি ঝুঁকে

যাওয়ার ফলে। মুসলমানদের চিন্তাধারাকে অতি সহজে পাকিস্তানের দিকে ফেরানো সহজ হয়। সারা ভারতে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ঝটিকা সফর করেন। কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান মাওলানা উসমানীকে তাদের পথপ্রদর্শক মনে করতেন। দেশ বিভাগের পূর্বে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মাওলানা উসমানীর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। নির্বাচনের সময় নবাবজাদা লিয়াকত আলী ছিলেন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের খ্যাতনামা নেতা। নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ রাজনীতিবিদদের সাথেও ছিল তাঁর ভাল সম্পর্ক। নির্বাচনের প্রচারণা তখন তুঙ্গে। আল্লামা উসমানী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন। মাঠে ময়দানে, গ্রামে গঞ্জে মানুষকে মুসলিম লীগের বাক্সে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

সারা ভারতে মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য তিনি প্রজ্জ্বলিত করেন ত্যাগের মশাল। ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার জন্য মুসলিম যুবকেরা বলতো, "সীনে মে গুলী খায়েংগে আওর পাকিস্তান বানায়েংগে।" যা হোক, সবাই অবাক হয়ে গেল যখন দেখা গেল কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগ ২১২ ভোট বেশি পেয়ে সাহেবজাদা লিয়াকত আলী খান নির্বাচিত হয়েছেন। চারদিকে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। এসব সফলতার মূলে ছিল আল্লামা উসমানীর ঐকান্তিক সাধনা ও মেহনত।

পাকিস্তানের পথে

আল্লামা উসমানী ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বেই পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি পাকিস্তানে বহু দীনী, সামাজিক এবং রাজনৈতিক খেদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট করাচীতে তিনিই প্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁকে একজন ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে সাথে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবেও গণ্য করা হতো।

ইন্তেকাল

পাকিস্তানের জামেয়া আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুর একটি প্রাচীন দীনী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। ভাওয়ালপুর উসমানীকে দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং ভাওয়ালপুর উপস্থিত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে মাত্র। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার অসুস্থতার পর ১৯৪৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ভাওয়ালপুর থেকে জানাযার পর তাঁর লাশ করাচীতে আনা হয় এবং মুহাম্মাদ আলী রোডের নিকটে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী র.

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ছিলেন একজন অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন আলেম, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, সুবক্তা, কবি এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ আরবী-ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যিক।

নওয়াব মুহসিনুল মুলক যেমন স্যার সাইয়েদ আহমদের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তেমনি সুলায়মান নদভী ছিলেন শিবলী নোমানীর প্রিয়তম ও সুযোগ্য শিষ্য এবং তাঁর সত্যিকার প্রতিনিধি। তিনি শিবলীর আরব্ধ কাজ পরিসমাপ্ত করেন এবং তাঁর ভাবধারাকে সঞ্জীবিত এবং সম্প্রসারিত করেন। ইসলামের হারানো শান-শওকত, বিশ্ব সভ্যতায় আরবদের অবদান, প্রাচীন আরব-ভারত সম্পর্ক, ইসলামী তহযীব-তমুদ্দুন ইত্যাদি ছিল তাঁর রচনার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং তাঁর ভাবধারার প্রাণকেন্দ্র। তিনি তাঁর লেখনীধারার মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিবৃত্তের নিঁখুত চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরেন। আযাদী আন্দোলন, বিশেষ করে খেলাফত আন্দোলনে তাঁর অবদান বিশাল। দারুল-মুসান্নিফীন আযমগড় তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। উর্দু সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর রচনার বিচরণক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। তবে ইতিহাস এবং জীবনচরিত্র ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও খ্যাতি সবচাইতে বেশি। তিনি প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কখনো উপেক্ষা করেননি।

মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ১৮৮৪ সালের ২২ শে নভেম্বর পাটনা জেলার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী দসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তা সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। তাঁর পিতা হাকীম আবু ইসহাক একজন মহৎ ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। জনসাধারণের ওপর তাঁর বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

শিক্ষা

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী নিজ গ্রামে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। অতঃপর কয়েক মাস ফুলওয়ারী খানকায় এবং কয়েক মাস দারভাঙ্গার ইমদাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি লাখনৌতে অবস্থিত নদওয়াতুল-ওলামা (আলেম-পরিষদ) পরিচালিত দারুল উলূম মাদরাসায় প্রবেশ করেন।

কচি বয়সেই তিনি মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ র. রচিত 'তাকবিয়াতুল ঈমান' (ঈমানের দৃঢ়তা) পাঠ করেন এবং ইসলামী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি যখিন ফুলওয়ারী খানকা শরীফে অধ্যয়নরত ছিলেন, তখনই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তিনি সে সময় থেকেই সাহিত্যচর্চা আরম্ভ

করেন। খানকা শরীফে প্রত্যেক সপ্তাহে 'কাও-ওয়ালীর' আসর বসতো। ফলে সে এলাকাটি ছিল কাব্য চর্চায় মুখর। এ সৃষ্টিধর্মী পরিবেশে সাইয়েদ সাহেবের সাহিত্যিক মানস গড়ে ওঠে। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম মাওলানা আব্দুল হালীম শরর রচিত উপন্যাস-মনসুর-মোনেহা' পাঠ করেন। এ উপন্যাসটি মুসলিম জাতির হৃতগৌরব এবং তাদের হারানো শৌর্যবীর্যের পরিচয় বহন করে। এ উপন্যাস পাঠে তাঁর মনে দাগ কাটে। তখন থেকেই জাতির অধঃপতন তাঁর মনে পীড়া দিতে থাকে। 'মনসুর-মোনেহা' পাঠে তাঁর অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কিতাবটি শেষ করে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের প্রথম ভাগেই তাঁর অন্তরের বিজন কোণে ইসলামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশা বাসা বেঁধেছিল।

নদওয়াতুল-ওলামার বিজ্ঞ আলেমদের সাহচর্যে সাইয়েদ সাহেবের জ্ঞান-পিপাসা ও সাহিত্য-প্রেরণা ক্রমাগত শাণিত হয়ে ওঠে। এখানে তিনি মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয-রচিত হাদীস শাস্ত্রীয় কিতাব 'উজালা-এ-নাফেয়া,' ইবনুল হাজার আসকালানী প্রণীত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ওফাইয়াত, এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত হাদীস বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রখ্যাত মাওলানা ফারুক চিড়িয়াকোটি ছিলেন নদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক। সাইয়েদ সাহেব তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে দর্শন ও আরবী সাহিত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। তদুপরি মাওলানা শিবলী নোমানীর শিষ্যত্ব হলো সোনায় সোহাগা। ১৯০০ সালে শিবলী নোমানী নদওয়ায় যোগ দেন। সাইয়েদ সাহেব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এদুটি বিষয়ে আরো বুৎপত্তি অর্জন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি আরবী ভাষা অনর্গল লিখতে ও বলতে পারতেন। আরবী কাব্য রচনায়ও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

উর্দু কাব্য রচনায় সাইয়েদ সাহেব ছিলেন কবি আমীর মীনারই (১৮৯২-১৯০০) মানস সন্তান। ছাত্র জীবনেই তিনি দারুল উলূম মাদরাসায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কবি সম্মিলনে অংশগ্রহণ করেন এবং কবি আমীর মীনাইর সুরে ও স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু তিনি পরে কাব্য চর্চা ছেড়ে দেন।

১৯০৫ সালে মাওলানা শিবলী নোমানী যখন নদওয়াতুল-ওলামা প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম মাদরাসায় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন, তখন সাইয়েদ সুলায়মান নদভী একটি ফার্সী কসীদা লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। শিবলী নোমানী ছিলেন গুণগ্রাহী উস্তাদ। তাই সাইয়েদ সাহেবের উপর তাঁর সুনজর না পড়ে

পারেনি। শিবলী নোমানীর কাছে মিসর ও সিরিয়া থেকে ভাল ভাল পত্রপত্রিকা এবং বই পুস্তকের সৌজন্যমূলক কপি আসতো। সাইয়েদ সাহেব এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সেগুলো রীতিমত পাঠ করতেন। এ অধ্যয়নই তাঁকে কালে একজন বিশিষ্ট আধুনিক আরবী সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। নদওয়াতুল-ওলামার অধীনে মাওলানা শিবলী এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান শিরওয়ানীর সম্পাদনায় 'আন-নাদওয়া' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো (১৯৫০)। সাইয়েদ সুলায়মান নদভী এর কোন এক সংখ্যায় হাদীস বিষয়ক একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাওলানা হালী প্রবন্ধটি দেখে স্তম্ভিত হন। তিনি বুঝতে পারলেন, যেমন উস্তাদ (মাওলানা শিবলী), তেমনি শাগরিদ। তাই মাওলানা হালী সাইয়েদ সাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে মাওলানা শিবলীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাওলানা শিবলী সাইয়েদ সাহেবের যোগ্যতা দেখে ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর উপর 'আন-নাদওয়া' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন।

নদওয়াতুল ওলামায় রেওয়াজ ছিল শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের শিরে পাগড়ী পরিয়ে দেয়া। ১৯০৭ সালে রিফাকে আম (লাখনৌ) নামক স্থানে দারুল উলূম মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পাগড়ী পরানোর প্রথম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে খাজা গোলামুস-সাকালাইন সাইয়েদ সাহেবকে ভারতে ইসলাম প্রচারের উপায় উদ্ভাবন—এ বিষয়ের ওপর আরবী ভাষায় বক্তৃতা করতে অনুরোধ করেন। সাইয়েদ সাহেব ইতস্তত না করে পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। আরবী ভাষার ওপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এবং তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনা শক্তি দেখে পুরো মাহফিল হতবাক! চারদিকে থেকে প্রশংসার ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে লাগলো। মাওলানা শিবলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজ পাগড়ী খুলে স্বনামধন্য শাগরিদের মাথায় পরিয়ে দিলেন।

কর্মজীবন

১৯০৭ সালে নদওয়ায় সাইয়েদ সাহেবের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে মাওলানা শিবলী তাঁকে আন-নাদওয়া পত্রিকার সহসম্পাদক নিযুক্ত করেন। এ সময়ে তিনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় দেন। ১৯০৮ সালে তিনি দারুল উলূম মাদরাসায় ইসলামী আদর্শ ও আধুনিক আরবীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ছিলেন একাধারে সম্পাদক ও শিক্ষক। তিনি দরসুল আদব' (সাহিত্য পাঠ) নামক দুটি আরবী রিডার রচনা করেন। পুস্তক দুটি এখনো সমাদৃত। ১৯১০ সালে নদওয়া কর্তৃক একটি আধুনিক আরবী অভিধান রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মিসরের আল-মানার পত্রিকার

সম্পাদক আল্লামা রশীদ রেজা অভিধানটি দেখে মুগ্ধ হন। লুগাতে জাদীদা' নামক এ অভিধানটি আরবী শিক্ষার্থীদের বহু চাহিদা পূরণ করে।

১৯১২ সালের জুলাই মাসে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ কলকাতায় তাঁর বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা–'আল-হিলাল' প্রকাশ করেন। এ সময় ইটালী তুর্কীদের অধীন ত্রিপলী রাজ্য জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন তুরস্কের খেলাফত ভক্ত এবং একজন আযাদী প্রিয় লোক। তিনি তুরস্কের বুকে আঘাত হানতে দেখে মুসলিম জাতির স্বার্থে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১৩ সালের মে মাসে তিনি আল-হেলালের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে বৃটিশ সরকারের আদেশে কানপুরের সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে তথাকার একটি মসজিদের কিয়দংশ ভেঙ্গে দেয়া হয়। মুসলিম জনসাধারণ মসজিদ ভঙ্গের কারণে বিক্ষুব্ধ হয়। তারা মসজিদটি পুনঃ নির্মাণ করতে গেলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশে তাদের ওপর নির্মমভাবে গুলী চালানো হয়। এই রক্তরাঙা ঘটনাটি সারা মুসলিম ভারতকে উত্তেজিত করে তোলে। এ সময় সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, আল-হেলাল পত্রিকায় মাশহাদে আকবর শীর্ষক একটি বিষাদময় প্রবন্ধ লিখে তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করেন। এর ছত্রে ছত্রে তাঁর ধর্মীয় প্রেরণা এবং জাতীয় চেতনা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। যে সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়, বৃটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯১৩ সালের শেষের দিকে মাওলানা শিবলীর ইঙ্গিতে সাইয়েদ সাহেব বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দাক্ষিণত্য কলেজে ফার্সীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু দেড় বছর যেতে না যেতেই ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে মাওলানা শিবলী নোমানী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁর প্রিয়তম ও যোগ্যতম শাগরিদ সাইয়েদ সাহেবকে ডেকে আনেন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ বিশেষ করে 'সীরাতুন্নবী' রচনার কাজ সমাপ্ত করার জন্য অসিয়ত করেন। তিনি উস্তাদের আদেশকে শিরোধার্য করে অধ্যাপনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আযমগড়ের শিবলী মনজিলে এসে উপস্থিত হন।

দারুল মুসাননিফীন আযমগড় প্রতিষ্ঠা

পুনা থেকে আযমগড় এসে সাইয়েদ সাহেব ১৯১৫ সালে দারুল মুসাননিফীন, (গ্রন্থকার ভবন) স্থাপন করেন। এ প্রকল্পটি মাওলানা শিবলীর হাতেই রচিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। সাইয়েদ সাহেব এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করে ভারতের বুকে বাগদাদের 'দারুল হিকমত' (বিজ্ঞানাগার)–এর নজীর স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ত্রিশ-বত্রিশ বছর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। তিনিই ছিলেন এ

প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। এ দীর্ঘ সময় তাঁর নাম বাদ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও করা যেতো না। এ প্রতিষ্ঠানের সেবায় তিনি সর্বস্বার্থ বিসর্জন দেন। শেষ পর্যন্তও তিনি এ প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক দুশ পঞ্চাশ টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করেননি। প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী ঐতিহ্য ও ইসলামী সাহিত্যের থাকবে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে দীনিয়াত, মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামের ইতিহাস এবং উর্দু সাহিত্যের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনেক দুষ্প্রাপ্য আরবী ও ফার্সী কিতাব উর্দুতে অনূদিত হয়। মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম কৃষ্টি প্রচারে এ প্রতিষ্ঠানের মূল্য অপরিসীম।

পাকিস্তানে হিজরত

ভূপাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জাকির হোসাইন সাইয়েদ সাহেবকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ ভারতে ফেলে পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং ১৯৫০ সালের জুন মাস থেকে করাচীতে বসবাস আরম্ভ করেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নবজাত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে খেদমত করা, সরকার এবং সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা, জাতিকে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং অতীতের জাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য দারুল মুসাননিফীন, আযমগড়ের অনুরূপ পাকিস্তানেও একটি দারুল মুসাননিফীন প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর এ স্বপ্ন সাধ মিটেনি।

পাকিস্তানে তিন বছরের কর্মজীবনে সাইয়েদ সাহেব জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সাব-কমিটির সদস্যরূপে কাজ করেন। পাঞ্জাব আরবী মাদরাসা সমিতির এক বার্ষিক সভায়ও তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি করাচী ইউনিভার্সিটি স্টেটেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ইতিহাস সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ইন্তেকাল

১৯৫৩ সালের ২২ ই নভেম্বর এই মহাজ্ঞানী ও মহাআলেম করাচীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহ.........)।

হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী র.

জন্ম

হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.-এর আপন ভাগিনা। মাওলানা উসমানী ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে ১৩১০ হিজরীর ১৩ রবিউল আওয়াল জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

হযরত থানভী র. ১২ বছর বয়সে ভাগিনাকে থানাভবনে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তালীম দিতে থাকেন। ১৩২৩ হিজরীতে কানপুরের জামেউল উলূম মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। এখানেই তিনি দরসে নেযামী সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মানতিক ফালসাফার কিতাবপত্র ও পাশাপাশি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর দরসে বুখারীতেও অংশগ্রহণ করেন। এ ছিল ১৩২৮ হিজরীর কথা। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। এ বয়সেই তিনি হযরত সাহারানপুরীর হাতে বায়াত হন।

কর্মজীবন

ফারেগ হওয়ার পর হযরত উসমানী ৭ বছর সাহরানপুর মাদরাসায়, ২ বছর থানা ভবনের নিকট ইরশাদুল উলূম মাদরাসায় বুখারী ও মুসলিম শরীফের দরস দেন। এরপর থানা ভবনের ইমদাদুল উলূম মাদরাসায় দরস দেন। এরপর তিনি প্রায় আড়াই বছর বার্মার রেঙ্গুনে দরস দেন। ১৩৫৮ সালে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির দীনীয়াতের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি ঢাকার বিখ্যাত মাদরাসা আশরাফুল উলূমে বুখারী শরীফের দরস দেন। লালবাগ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর এ মাদরাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন এবং মসনবী শরীফের দরস দেন।

১৯৪৮ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নিয়ে ঢাকা আলীয়া মাদরাসার সদর মুদাররিস নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করাচীর অদূরে আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী প্রতিষ্ঠিত টেন্ডুলাইয়ার মাদরাসায় দরসে হাদীসে লিপ্ত থাকেন। তিনি যে বছর মাজাহেরুল উলূমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সে বছরেই দারুল উলূম দেওবন্দে দস্তারবন্দী জলসা হয়। সে জলসায় হযরত কাসেম

নানুতবী র. এবং হযরত মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব আমরোহী র. সহ আকাবিরে দেওবন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মাওলানা যাফর আহমদ র. তাদের সবার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। আর ছাত্র যমানাতেই তিনি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী বুযুর্গদ্বয়ের দর্শন, সান্নিধ্য ও দোয়া লাভে ধন্য হয়েছিলেন। বিশেষ করে হযরত গাঙ্গুহীর জীবনের শেষ বছর হযরত যাফর আহমদ উসমানী এবং তার বড় ভাই মাওলানা সাঈদ আহমদ র. উভয়ে হযরত থানভী র. এর নির্দেশে তার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তারা উপস্থিত হয়েছিলেনও।

হজ্জ

আল্লাহ তায়ালা হযরত যাফর আহমদ উসমানীকে জীবনে পাঁচবার হজ্ব করার তৌফিক দিয়েছেন। প্রথমবার হজ্ব করেন হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী, মাজাহেরুল উলূমের মুদাররিস মাওলানা আব্দুল লতিফ এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ গাঙ্গুহী প্রমুখের সাথে। এই সফরে তিনি হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরীর কাছ থেকে হাদীসে মুসালসলাতের সনদও হাসেল করেন। এ বছরই হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীও হজ্বে যান। মক্কা মুকাররমায় হযরত রায়পুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মক্কাতে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর এক বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন সাহেব অবস্থান করতেন। তার সাথেও তাদের সাক্ষাৎ হয়।

রচনাবলী

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, হযরত উসমানীর কলমী খেদমত এত বিশাল ছিল যে, বর্তমান যামানায় বড় বড় একাডেমী বহু বছর ধরে কাজ করেও এত বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারে না, যা হযরত উসমানী দিয়েছেন। তাঁর লিখিত কিতাবপত্রের মধ্যে এলাউস সুনান সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৮ জিলদের এ কিতাবখানি বিশ্বের ওলামা এবং সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

রাজনৈতিক অবদান

হযরত উসমানী পাকিস্তান আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তিনিই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে তিনিসহ কয়েক জন বিখ্যাত আলেমেদীন ইসলামী সংবিধান রচনা করেছিলেন।

ইন্তেকাল

অবশেষে এ মহান আলেমেদীন ১৯৭৪ সালের ৮ ডিসেম্বর করাচীতে ইন্তেকাল করেন এবং পাপোশনগরের কবরস্থানে হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী র.–এর পাশে সমাহিত হন।

আরেফ বিল্লাহ ডা. আব্দুল হাই আরেফী র.

ইসলামের জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যে সুশোভিত এ যুগের উল্লেখযোগ্য বুজুর্গদের মধ্যে আরেফ বিল্লাহ হযরত ডা. আব্দুল হাই র. ছিলেন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী র.এর বিশেষ খলিফা এবং স্বীয় শায়খের শিক্ষা-দীক্ষা ও তালীম-তারবিয়াতের অদ্বিতীয় দর্পণ ছিলেন। নিচে তাঁর জীবনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হল-

জন্ম

হযরত আরেফী র. ৮ মহররম ১৩১৬ হিজরী মোতাবেক জুন ১৮৯৮ ঈসায়ী মঙ্গলবার সুবহে সাদেকের সময় জাহানসী সংলগ্ন ইউ পির (ভারত) বুন্দেলখণ্ড শুবার বাওয়ানী অঙ্গরাজ্যের কাদুরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি ১৯০৫ ঈ. সালে কুরআন মজীদ শেষ করেন। প্রথম থেকেই পিতামহ মওলভী কাজেম হুসাইন সাহেব র. তাঁকে কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি আরবী ব্যাকরণ ও ফারসী ভাষার প্রাথমিক কিতাবাদি পড়ানো শুরু করেন। ১৯০৫ সালে নয়াগাঁও এলাকার বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে তার নাম লেখানো হয় এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৯ সালে তাঁর দাদা তাঁকে ইলাহাবাদে স্বীয় দোস্ত হাইকোর্টের জজ সাইয়েদ কেরামত হুসাইন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। তথায় ১৯১০ সালের মার্চে চক ইলাহাবাদের সিয়ুরাখিন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে বছর প্লেগ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে তিনি এবং তাঁর চাচা মুহাম্মদ হাদী সাহেব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই ফিরে আসেন। ১৯১১ সালে কাদুরা থেকে উরয়ী পড়ার জন্যে গমন করেন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১২ সালে উরয়ী থেকে পরীক্ষায় পাশ করে লক্ষ্ণৌ গিয়ে জুবলী হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে ১৯১৪ সালে কানপুর খৃস্ট চার্চ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উর্দুতে ডিস্টিংকশনসহ সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেন। অতঃপর ১৯১৮ সালেই আলীগড় এম. এ. ও. কলেজে চলে যান এবং সেখান থেকে ১৯২০ সালে এফ. এ এবং ১৯২৪ ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এ পাশ করেন। অতঃপর সে বছরই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এল এল বিতে ভর্তি হন এবং

সেখান থেকে ১৯২৬ সালে এল এল বি পাশ করেন। এভাবে হযরত আরেফী র. প্রথম জীবনের ১৮ বছর (১৯০৮-১৯০২৬) পড়াশুনায় ব্যয় করেন।

কর্মজীবন

হযরত আরেফী র. পড়াশোনা শেষ করে ওকালতি পেশা গ্রহণ করেন। যেহেতু ওকালতি পেশা তাঁর স্বভাবের অনুকুলে ছিল না তাই তাতে তিনি আশানুরূপ সফল হতে পারেননি। তাঁর সততার কারণে সাব জজের আদালতের পক্ষ থেকে তাঁকে খেজুয়ারা অঙ্গরাজ্যের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। ব্যবস্থাপনার জটিলতা ও আদালতের কুটিলতার কারণে তিনি ওকালতি পেশাকে চিরতরে ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মনস্থ করেন। ওকালতি পেশা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তিনি লেখেন, '১৯৩৫ সালের শেষ দিকে এমন কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে করে ওকালতি পেশা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনে কঠিন সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে হযরত ওয়ালা (আশরাফ আলী থানভী র.) এর কিছু সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত পেয়ে এবং স্বীয় আযীয হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহায়তা পেয়ে ১৯৩৫ সালে তা (ওকালতি) চিরতরে ত্যাগ করি এবং ওকালতির সার্টিফিকেট ইলাহাবাদের হাইকোর্টে জমা দিয়ে দিই। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং আমি জৌনপুরে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী থেকে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস শুরু করি।'
ওকালতি পেশা ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী শুরু করার পর হাকীমুল উম্মত র. আরেফী র. কে খেলাফত দান করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী র. এর সাথে সম্পর্ক

হযরত আরেফী র. এর পরিবার পূর্ব থেকেই থানভী র. এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বিশেষ করে তাঁর ফুফা আলী সাজ্জাদ কানপুরী র. যখন মসলি শহরের তহসিলদার ছিলেন তখন হযরতের খান্দান কালপী বসবাস করতেন। ১৯১৭ সালে হযরত থানভী র. মসলি শহরে তাশরীফ নেন। ফেরার পথে হযরতের ফুফা থানভী রহ কে কালপী নিয়ে আসেন। সেখানে হযরতের দাদা কাজেম হুসাইনসহ পরিবারের অনেকে হযরতের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এখানেই আরেফী র. থানভী র.এর পেছনে সর্বপ্রথম মাগরিবের নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে আরেফী র. ছাত্রাবস্থাতেই, বিশেষতঃ তিনি যখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন তখন থানভী র.-এর সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন এবং পরীক্ষার কামিয়াবীর জন্যে দুআ ও বিভিন্ন পরামর্শ চাইতেন। পাশাপাশি তিনি থানভী র. এর রচনাবলী অধ্যয়ন করতে থাকেন। কানপুরে

হযরতের বিভিন্ন ওয়াজেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে আরেফী র. বিএ পরীক্ষায় ফেল করেন। অতঃপর তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে চলে যান। ঘটনাক্রমে সে বছরই থানভী র. তাঁর বিশেষ মুরীদ কেফায়েতুল্লাহ পেশকারের নিকট তাশরীফ নিয়ে যান এবং তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত আরেফী র. খবর পেয়ে তিনিও থানভী র. এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে সেখানে হাজির হন। প্রথমে থানভী র. তাঁকে চিনতে পারেননি। পরে যখন তাঁর ফুফা ও কালপীর কথা উল্লেখ করেন তখন ঠিকই চিনতে পারলেন। এটি ছিল থানভী র. এর সাথে আরেফী র. এর প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। পরবর্তীতে আরেফী র. মাঝে-মধ্যে থানভী র. এর পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। ইতোমধ্যে আরও কয়েক বার সাক্ষাতেরও সুযোগ ঘটে। প্রতিবার সাক্ষাতে তিনি অন্তরে এক ধরনের মহব্বত ও অনুভূতি অনুভব করতেন, যার প্রভাব সর্বদা বিদ্যমান থাকত। অবশেষে হযরতের হাতে বায়আত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে ১৯২৭ সালের ২০ আগস্ট মাগরিবের নামাযের পর থানাভবনে।

মাতৃভূমি ত্যাগ

হযরত আরেফী র. স্বীয় জীবনের ৫২ বছর (১৮৯৮ঈ-১৯৫০ঈ.) ভারতে অতিবাহিত করার পর প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল তাঁর মাধ্যমে পাকিস্তানে তাবলীগে দীনের কাজ নেওয়া। এজন্যে তিনি অদৃশ্যের ইঙ্গিতে ১৯৫০ ঈ. সালে মাতৃভূমি জৌনপুর থেকে হিজরত করেন এবং চিরদিনের জন্যে ভারত থেকে পাকিস্তান তাশরীফ নিয়ে যান। অথচ হযরতের কখনো ধারণাও হয়নি যে, তাঁকে মাতৃভূমি জৌনপুর ছেড়ে কখনো কোথাও যেতে হবে। হযরত র. করাচী তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর পীর ইলাহি বখশ কলোনীতে স্বীয় সম্বন্ধী যাফর আহমদ সাহেব থানভী র. এর বাড়িতে কিছুদিন সপরিবারে অবস্থান করেন। পাশাপাশি বসবাসের জন্যে একটি আলাদা বাড়ির ব্যবস্থার জন্যে চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়ির ব্যবস্থা করতে সমর্থ হননি।

দীনের তাবলীগ

ইসলামী শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা ও ইসলামী বিধি বিধানের উপর আমলবিমুখতার কারণে হযরত র. খুব বেশি চিন্তিত থাকতেন এবং তাঁর ভক্ত অনুরক্তদেরকে ক্লিনিকে এবং সাক্ষাতের সময় ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর ক্লিনিকে শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের রোগীরা আসত এবং আরোগ্য লাভ করত। ১৯৫৮ সালে যখন তিনি পাপোশনগর স্থানান্তরিত হন তখন নিজের বাসস্থানের পাশে খালি জায়গায়

আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মজলিসের ব্যবস্থা করা শুরু করে দেন। তাতে তিনি সমাজে বিস্তৃত ও প্রচলিত অশ্লীলতা ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরতেন এবং তা সংশোধনের পথ নির্দেশ করতেন। তাঁর বাচনভঙ্গি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, শ্রোতাদেরকে আশেক বানিয়ে ফেলতেন। তাঁর এই মজলিসে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা জলসার রূপ ধারণ করে। অনেক দূর থেকে এমনকি অন্যান্য শহর থেকেও এতে শরীক হওয়ার জন্যে মানুষ আসতে শুরু করে। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেছে তার জীবনে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার জীবনের রূপ পাল্টে গেছে। এই মজলিস ছিল তার দরসগাহ বা দীনের শিক্ষাকেন্দ্র।

জীবন যাপন পদ্ধতি

হযরত আরেফী র. এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল মুজাদ্দেদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী র. এর জীবনের এক অভাবনীয় ছাপ। তাঁর পুরো জীবন ছিল শায়খের রঙে রঞ্জিত। আর আল্লাহ তাআলা থানভী র. এর স্বভাবের মধ্যেই সুন্নাতের অনুসরণের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছিলেন। হযরতের পুরো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সুন্নাতের অভূতপূর্ব অনুসরণ দৃষ্টিগোচর হত। তাঁর সকল কর্মকাণ্ড, দীনের প্রচার-প্রসার, তালীম-তারবিয়াত, আত্মশুদ্ধি সবকিছুই সম্পাদিত হত রাসূল সা.এর সুন্নাত অনুসারে। আর তা হবে না কেন, তিনি যে মুজাদ্দেদে মিল্লাত, উম্মাহর সংস্কারক।

সুন্নাতের অনুসরণ

সুন্নাতের অনুসরণ হযরতের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যতই ইহতেমামের প্রয়োজন হোক না কেন তিনি সুন্নাত অনুসারেই সকল কাজ সমাধা করতেন। এজন্যে তিনি কুরআন, হাদীস ও হযরত থানভী র.এর রচনাবলী ও অন্যান্য কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন শরয়ী আহকামের সুন্নাতী তরীকা আপন খাতায় নোট করে নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তার পাবন্দী করতেন। অধিকন্তু তিনি অন্যান্যদের দিকনির্দেশনার জন্যে সেসব হাদীস যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীসের কিতাব ও সীরাতের গ্রন্থ থেকে এক স্থানে একত্রিত করেন। যা উসওয়ায়ে রাসূল আকরাম সা. নামে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যা আমাদের জন্যে আলোকবর্তিকা বললে অত্যুক্তি হবে না।

হযরত সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে এক সহজ পদ্ধতি বাতলাতেন। তিনি বলতেন, যে কাজ করা হোক না কেন ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নিয়তে করা হবে। প্রথম দিকে এমন সুন্নাতসমূহের ওপর আমল করা হবে যা আমল করতে

সহজ। এতে সেগুলো অভ্যাসে পরিণত হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে সকল সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক হবে। এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজই সুন্নাত অনুসারে সম্পাদিত হবে।

খোদাভীরুতা

সুন্নাত অনুসারেই হযরত আরেফী র. প্রতিটি কাজে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়াকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বীয় খাদেম ও সম্পর্কিত সকলকে প্রতিটি কাজে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার অভ্যাস করার তালীম দিতেন। হযরতওয়ালা র. নিজেও প্রতিটি কাজ ও চাল চলনে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের খাদেমদের বলতেন, প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'ইয়্যাকা না'বুদু ওইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' পড়ার অভ্যাস কর। বরং প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে একথার স্মরণ কর যে, হে আল্লাহ এখন আমি কী করব? তখন দেখতে পাবে কি থেকে কি হয়ে যাচ্ছে।

স্বভাব-প্রকৃতি

হযরতের স্বভাবে খেদমত ও সেবার মানসিকতা ছিল প্রবল। তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর মজলিসে একথা প্রায়ই বলতেন, এমন এক মহান পদমর্যাদা আমি বাতলে দিচ্ছি যা থেকে আপনাকে কেউ কোনদিন স্খলিত করতে পারবে না, কেউ এর উপর হিংসা রাখতে পারে না, আর তাতে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা, তা হল খেদমতের পদ। সেবক হয়ে যাও, প্রতিটি কাজে অপরের খেদমত করার নিয়ত করে নাও, সকল সমস্যা তো 'মাখদূম' হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। খাদেম হলে না কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়, না কোন বিবাদ। এটি সর্বোৎকৃষ্ট পদমর্যাদা। আল্লাহ তাআলার কাছেও বান্দার দাসত্বই সবচেয়ে প্রিয়।' হযরত ওয়ালা র. কেবল খেদমতের শিক্ষাই দিতেন না, বরং তিনি এর উপর পুরোপুরিভাবে আমলও করতেন। এসম্পর্কিত তাঁর অনেক ঘটনাও রয়েছে।

সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা

সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা হযরতের জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছিল। হযরতের পোশাক-আশাক, চলন-বলন, থাকা-খাওয়া, বরং জীবনের প্রতিটি সেক্টরে প্রতিটি কাজে সরলতা ও পরিচ্ছন্নতার ছাপ ছিল দেদীপ্যমান। পরিচ্ছন্ন স্বভাব, সরল ও খোশপ্রকৃতি তাঁর প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ত। তিনি বলতেন, 'কোন বস্তু যদি বেকায়েদা রাখা হয় তবে হৃদয়ে খুব ব্যথা অনুভূত হয়।' হযরতের কথাবার্তায়ও এই উন্নত প্রকৃতির প্রতিফলন দেখা যেত। কোন শব্দ বা বাক্য শিষ্টাচারের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হলে তাঁর মনে খটকা দেখা দিত। হযরত আরেফী র. এমন শৃঙ্খলা প্রিয়

ছিলেন যে, ঘরে বা বাইরে কোন বস্তু যদি আপন স্থানে কিংবা শৃঙ্খলার সাথে রাখা না হয় তবে তিনি মনে এক ধরনের বিরক্তি ও অস্বস্তি অনুভব করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তা আপন স্থানে যথাযথভাবে শৃঙ্খলার সাথে রাখা না হত ততক্ষণ তাঁর দৃষ্টি বারবার সেদিকে আটকে যেত।

স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা

হযরত আরেফী র. সুন্নাত অনুসারে প্রত্যেকের সাথে স্নেহ মমতা ও মহব্বতের সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর এই মায়া মমতা ও মহব্বতের কারণেই দূর দূরান্ত থেকে সালেকীনরা তাঁর ক্লিনিক ও বাড়িতে এসে ভিড় করত এবং তাঁর কাছে থেকে উপকৃত হত। ঈদুল ফিতরের সময় তিনি তাঁর উপার্জন থেকে মেহমানদারির ব্যবস্থা করতেন যাতে বহু সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করত। তাঁর সাথে যেই সাক্ষাৎ করত তিনি কেবল তার প্রতি মমতা ও মহব্বতই দেখাতেন না, বরং অনেক দুআও করতেন। মন ভাল থাকুক আর না থাকুক তার মায়া মমতায় কোন তারতম্য দেখা যেত না। যেই তাঁর সাথে দেখা করত ভক্ত না হয়ে পারত না। আর প্রত্যেকে একথা মনে করত যে, হযরতওয়ালা র. অন্যদের তুলনায় তাকে সবচেয়ে বেশি ও বিশেষভাবে মহব্বত করেন। তিনি ঘুমানোর পূর্বে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়- স্বজন ছাড়াও সকল মুহিব্বীন ও মুতাআল্লেকীনদের জন্যে দুআ করতেন। তিনি বলতেন, 'যখন আমি দুআ করি তখন আমার সকল মুহিব্বীনদের ছবি ফিল্মের রিলের মত করে আমার সামনে ভেসে ওঠে এবং আমি সকলের জন্যে দুআ করি।' আর একথাও বলতেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের জন্য দুআ না করতাম ঘুমাতাম না।'

ধৈর্য ও সহনশীলতা

হযরত র. এর ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল অপরিসীম। যত সমস্যা সংকটই আসুক না কেন তাঁর ধৈর্যও সহনশীলতার পাহাড়কে টলাতে পারত না। তিনি বলতেন, 'যদি কেউ আমাকে ভাল মন্দ বলে এতে আমার নফসের পরিশুদ্ধি হয়। আর যেসব লোক আমার প্রতি সমুচ্চ ধারণা পোষণ করে বড় বড় উপাধি দিয়ে পত্র লেখে এতে নফস খুশিতে ফুলে ওঠে। যেসব লোক ভালমন্দ বলে তাদের দ্বারা এর কাফফারা হয়ে যায়। হযরতের সুদীর্ঘ জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে মন বিচলিত হত। খান্দানের লোকদের মধ্যে মতানৈক্য, নিকটজনদের অমার্জিত বাচনভঙ্গি ও হযরতের সাথে অসদাচরণ, লেনদেনের ক্ষেত্রে অবিবেচক আচরণ- কিন্তু হযরতের ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণে এসব সমস্যা তাঁর উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না।

রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে গমন

১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে হযরত আরেফী র.এর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে। নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনরা একে একে বিদায় নিয়ে পরপারে পাড়ি জমাতে থাকে। এ বিচ্ছিন্নতা হযরতের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অপার রহমতে হযরতের মনোবল মোটেও টলেনি। মামুলাতসমূহ যথারীতি অব্যাহত থাকে। ক্লিনিকে আসা-যাওয়ার মধ্যে কোন তারতম্য ঘটেনি। সোমবার ও বৃহস্পতিবারের মজলিসগুলোও আপন নিয়মে চলছিল। ১৯৮৬ সালের ২৩ মার্চ হযরত সকালের নাস্তা সেরে ক্লিনিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পেটে ব্যথা অনুভব করেন। এই ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ২৬ মার্চ ২নং নাজেমাবাদে 'আল - মুরতাদা' হাসপাতালে হযরতকে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু হযরতের পেটের ব্যথায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এমন কঠিন অসুখেও হযরত আওয়াল ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে কখনো ছাড়তেন না এবং হযরতকে যারা দেখতে আসতেন তাঁদের জন্যে ও অন্যান্যদের জন্যে প্রাণভরে দুআ করতেন। খাদেমদের আরাম আয়েশের দিকেও লক্ষ্য রাখতেন। হযরতের শরীর রাতের শেষ দিকে আরও খারাপ হয়ে যায়। অবশেষে এ ধরার সকল মায়া-মমতা ত্যাগ করে ইহজীবনের দীর্ঘ ৯০ বছরের বর্ণাঢ্য সফর সাঙ্গ করে ফজরের আযানের সাথে সাথে মৃত্যুদূতের ডাকে সাড়া দিয়ে রফীকে আলার সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন।

রচনাবলী

হযরত আরেফী র. দীনের প্রচার প্রসারে ওয়াজ নসীহতের পাশাপাশি লেখালেখিও নিয়মিত চালিয়ে যান। পূর্ব থেকে লেখার অভ্যাস থাকলেও হযরত থানভী র. এর কাছে বায়আত হওয়ার পর এতে আরো গতি আসে। তিনি হোমিওপ্যাথির উপরও বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করেন। থানভী র. এর শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে সাধারণ্যে বিস্তার করার জন্যেও তিনি কতিপয় বইপুস্তক রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর নাম তুলে ধরা হলঃ

১. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ২. মাআছেরে হাকীমুল উম্মত র. ৩, বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত র. ৪, মাআরেফে হাকীমুল উম্মত র. ৫. ইসলাহুল মুসলিমীন ৬. ফেহরেস্তে তালিফাতে হাকীমুল উম্মত র. ৭. আহকামে মাইয়্যিত, ৮. মামূলাতে ইয়াওমিয়্যা, ৯. জওয়াহেরে হাকীমুল উম্মত র., ১০. সীরত কনফারেন্সোঁ কেলিয়ে লমহায়ে ফিকরিয়া, ১১. ইনতিবাহে খুচুছী ।

মাওলানা তাকী উসমানী

নাম : মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ইবনে হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব র. (প্রধান মুফতী পাকিস্তান, প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলূম করাচী)

জন্ম : ৫ ই শাওয়াল ১৩৬২ হি. মোতাবেক ১৯৪৩ ইংরেজী

শিক্ষা (১) দারুল উলূম করাচী থেকে দরসে নেজামী সমাপ্তি ১৩৭৯ হি. ১৯৬০ ইংরেজীতে।

(২) ১৯৫৮ সালে আরবী পাঞ্জাব বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ।

(৩) বি. এ করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে।

(৪) এল. এল. বি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে (স্টেন)।

(৫) এম. এ আরবী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে (স্টেন)।

অধ্যাপনা : হাদীস ফেকাহ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দারুল উলূম করাচীতে।

সাংবাদিকতা ইদারাতে মাহনামা 'আল বালাগ' এ ১৯৬৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত, ইদারাতে মাহনামা 'আলবালাগ ইন্টার ন্যাশনাল। (ইংরেজী এর ১৯৮৯ থেকে বর্তমানপর্যন্ত।

পদসমূহ :

(১) সহকারী পরিচালক, দারুল উলূম করাচী, ১৯৭৬ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

(২) তত্ত্বাবধায়ক সংকলন ও প্রকাশনা বিভাগ দারুল উলূম করাচী।

(৩) পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট এর আপিল বেন্স এর শরয়ী জজ।

(৪) জিদ্দা আল জামউল ফিকহীল ইসলামী –এর সম্মানিত সদস্য।

(৫) অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং এর ওপর উল্লেখযোগ্য কাজ করার সুবাধে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়া বোর্ড **(Shariah Sapervisosory Boards)** এর সদস্য।

(৬) করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য।

রচনাবলী : রচনা তালিকা কিতাবের কভারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়

বায়তুল ইলম পরিদর্শন

বৃহস্পতিবার দিন নিউ টাউন মাদরাসা হতে আসরের পূর্বে যাই বাইতুল ইলম মাদরাসা ও পাবলিকেশন্স দেখার জন্য। বায়তুল ইলম হতে কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বের হয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখান হতে মেছালী উস্তাদ, মেছালী মা সহ বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ বের হয়েছে। মেছালী উস্তাদ কিতাবখানির লেখক মাওলানা হানিফ আব্দুল মজিদ সাহেব বায়তুল ইলমসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি ঢাকাও এসেছিলেন এবং আমার সাথে তার পরিচয়ও হয়েছিল।

পরবর্তীতে তার লিখিত মেছালী উস্তাদ কিতাবখানি মাদরাসা দারুর রাশাদের মাধ্যমে তরজমা করে লন্ডনের মুফতী সাইফুল ইসলামের আল কাউসার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আদর্শ উস্তাদ নামে প্রকাশ করে সারা বাংলাদেশের দীনী মাদরাসা ও উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই বইয়ের লেখক জনাব হানিফ আব্দুল মজিদ সাহেব বইয়ের তরজমা প্রকাশের মুহূর্তে ফ্যাক্সের সাহায্যে বাণীও দেন। সে সময় হতে খেয়াল ছিল করাচী গেলে মাওলানাকে তার কিতাবের তরজমাকৃত আদর্শ উস্তাদ হাদিয়া করব। ফলে লাহোর থেকে এসেই করাচী যোগাযোগ করতে থাকি। সে হিসেবে আসরের পূর্বেই বায়তুল ইলম পৌঁছে যাই। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ খুবই আপ্যায়ন করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে অনেক ব্যস্ত মানুষ মাওলানা হানিফ সাহেব মাদরাসায় উপস্থিত হতে না পারায় আমি ধরে নেই মাওলানার সাথে মনে হয় আর দেখা হবে না। কারণ পরদিন সকালে আমার ঢাকার ফ্লাইট ছিল। যাহোক মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে অনেক কিতাব হাদিয়া দেন।

মাদানী মসজিদ

বায়তুল ইলমে মাগরিব পড়ে চলে যাই করাচীর তাবলীগী মারকাজ মাদানী মসজিদে। ট্যাক্সীতে বায়তুল ইলম হতে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ। বিশাল জমি নিয়ে মাদানী মসজিদের এলাকা। বিরাট বড় মসজিদ। পিছনে বিরাট খোলা জায়গা। করাচী শহরের উত্তর দিকে সম্ভবত শত বিঘা নিয়ে এ মারকাজের এরিয়া। প্রথমে মক্কী মসজিদ নামে শহরের মেইন কেন্দ্রে মারকাজ প্রতিষ্ঠিত

হয়। সে মারকাজেও হাজিরা দেয়ার সুযোগ হয়েছিল ইতোপূর্বে। করাচী গেলেই বৃহস্পতিবার রাত হাতে পেলে মারকাজ মসজিদে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারি না। তাই এবারও হাজির হলাম। ততক্ষণে বয়ান শুরু হয়ে গেছে। বয়ান শেষ করে ট্যাক্সী নিয়ে মাওলানা নোমান সাহেবের বাসায় রাত যাপন করি।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও সাইয়েদ সুলায়মান নদভী র. -এর মাযার যিয়ারত

জুমার দিন অর্থাৎ সফরের শেষ দিন নিউ টাউন মাদরাসায় মাগরিবের নামায পড়ে চলে যাই পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী এবং বিশিষ্ট আলেমে দীন ও লেখক আল্লামা শিবলীর খাছ শাগরেদ ও হাকীমুল উম্মতের খলীফা হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভী সাহেবের মাযার যিয়ারত করতে। মাজার দুটি কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর মাজার থেকে বেশি দূরে নয়। নিউ টাউন মাদরাসা থেকে ১০/১২ মিনিটের পথ। আল্লামা উসমানী দেওবন্দের বাসিন্দা ছিলেন। হযরত নদভী সাহেবও ভারতের বাসিন্দা। উভয়ই পাকিস্তানে হিজরত করে নতুন স্বাধীন হওয়া দেশটিকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে ছিলেন। মাজারটি বর্তমানে ইসলামিয়া কলেজের কাছে অবস্থিত। হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব পাকিস্তানে হিজরতের পর এই বিরাট জায়গাটি মাদরাসা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ পেয়েছিলেণ। কিন্তু কোন কারণে তিনি জায়গা রাখতে পারেননি। যাহোক, এই দুই মনীষীর কবর যিয়ারত করে কাঁদলাম এবং দুআ করলাম।

মেছালী উস্তাদের লেখকের সাথে কুদরতী সাক্ষাৎ

কবর যিয়ারত করে বের হতেই ইশার আযানের মধুর আওয়াজ ভেসে এল। থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকি মাওলানা হানিফ সাহেবের সাথে দেখা হল না। বড় আফসোস নিয়ে ঢাকা ফিরে যাচ্ছি। অন্তরে অব্যক্ত এক বেদনা অনুভূত হতে লাগল। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণী হল। পাশেই উসমানী মসজিদে গিয়ে ওজু করে ছালাতুল হাজাতের নামায পড়ে এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম মাওলানা হানিফ সাহেবের বাসা কোথায়? তিনি কি এই মসজিদে নামায পড়েন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তিনি মাঝে মাঝে এখানেই নামায পড়েন। বাসা নিকটেই। একটু পরেই তিনি হানিফ সাহেবের ১২/১৩ বছরের ছেলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলে বলল, আব্বা বাসায় আছেন। আশা করি নামাযে আসবেন। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে নামাযের পর সত্যই আমার মনের মানুষ ভাই মাওলানা হানীফ আব্দুল মজিদের সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে

জড়িয়ে ধরলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মেছালী উস্তাদের তরজমা "আদর্শ উস্তাদ" তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি ১০/১৫ মিনিট আমাকে সময় দিলেন।

ঢাকা রওয়ানা

রাতে মাওলানা নোমান সাহেবের বাসায় অবস্থান করি। ঘুমুতে যাবার পূর্বে তার পরিবারের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রাখি। নোমান ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা আমাকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল। বাসার মধ্যে ঈদের আমেজ বিরাজ করছিল। আমার চলে আসার সংবাদ শুনে তারা খুবই মুষড়ে পড়েছিল। বিশেষ করে বড় ছেলে হাম্মাদ, মেজ ছেলে সালমান ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আসতে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই ঢাকার পথে রওয়ানা করি।

ফ্লাইট ছিল ০২.০১২.০৬ শনিবার তারিখ সকাল সাতটায়। আমরা রাত চারটাতেই এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। নোমান ভাই আমার সাথে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসেন। দীর্ঘ দু' সপ্তাহের এ সফর তারই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় পুরো করার তাওফীক হয়।

সকাল সাতটায় ফ্লাইট শুরু হয়। আল্লাহ্ পাকের রহমতে সকাল এগারটায় নিরাপদে ঢাকায় অবতরণ করি। সাথে সাথে পাকিস্তান সফরের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

সফর শুরু করার পূর্ব হতেই সফরনামা লেখার চিন্তাভাবনা মনের মধ্যে উকি ঝুকি মারছিল। সে মোতাবেক কিছু কিছু নোটও করে রেখেছিলাম। তাই সফর থেকে ফিরে এসে আরো কিছু রং তুলি মিশিয়ে ঢাকা থেকে বালাকোটের পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে লেগে যাই।

একনজরে
ঢাকা থেকে বালাকোট

(১৬ নভেম্বর ২০০৬ – ২ ডিসেম্বর ২০০৬)

১৬.১১.২০০৬ বৃহস্পতিবার

১২.৫০ মিনিটে পি আই এ–এর বিমানযোগে ঢাকা থেকে করাচী রওয়ানা। ৩.৩০ মিনিটে অবতরণ। রাতে পাপোশনগরে বন্ধুবর মাওলানা নোমান ভাইয়ের বাসায় অবস্থান।

১৭.১১.২০০৬ শুক্রবার

বাদ ফজর মাওলানা আব্দুল গনী ফুলপুরী র., মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী রহ. এবং মুফতী রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী র. এর কবর যিয়ারত। বেলা ১১টায় বিন্নুরী টাউনে আল্লামা ইউসূফ বিন্নুরী র. এর কবর যিয়ারত। ক্যান্ট রেল স্টেশনে জুমার নামায আদায়। ২.৩০ মিনিটে বোরাক এক্সপ্রেসে রাওয়ালপিন্ডি রওয়ানা।

১৮.১১.২০০৬ শনিবার

বিকাল ৩ টায় পিন্ডি স্টেশনে উপস্থিতি। ৪.৩০ মিনিটে ইসলামাদের ইদারায়ে উলূমে ইসলামীতে হাজিরা।

১৯.১১.২০০৬ রবিবার

সকাল ৯টায় ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান। মুফতী রফী উসমানী, মাওলানা সলিমুল্লাহ খান, মাওলানা হানীফ জলন্ধরী, মাওলানা জাহেদুর রাশেদী, মুফতী আবু লুবাবা প্রমুখ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে মতবিনিময়। ইদারায়ে উলূমে ইসলামীতে রাত্রিযাপন।

২০.১১.২০০৬ সোমবার

ইসলামাদের প্রেসিডেন্ট হাউজ, পার্লামেন্ট হাউজ, ফয়সল মসজিদ, ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন এবং ইসলামী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মাহমুদ আহমদ গাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২১.১১.২০০৬ মঙ্গলবার

বেলা ১১ টায় ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের সঙ্গে বালাকোট অভিমুখে রওয়ানা। মানছেরা, এবোটাবাদ হয়ে

সন্ধ্যায় বালাকোটে হাজিরা। হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.সহ শুহাদায়ে বালাকোটের কবর যিয়ারত। মানছেরায় এসে রাত্রিযাপন।

২২.১১.২০০৬ বুধবার

বেলা ১১টায় পেশোয়ারের আকুড়াখটকের জামেয়া দারুল উলূম হাক্কানিয়া দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা। বাদ আসর দরিয়ায়ে কাবুল ও দরিয়ায়ে সিন্ধের সঙ্গমস্থলে বিশ্রাম ও খানাগ্রহণ। বাদ মাগরিব আকুড়াখটকে দারুল উলূম হাক্কানিয়া পরিদর্শন এবং মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আনোয়ারুল হক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাত ১১টায় ইসলামাবাদে প্রত্যাবর্তন।

২৩.১১.২০০৬ বৃহস্পতিবার

ইসলামাবাদে ইসলামী ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যাম্পাস পরিদর্শন, সকালে ইদারায়ে উলূমে ইসলামীর এসেম্বলী পরিদর্শন, বক্তব্য প্রদান এবং মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ।

২৪.১১.২০০৬ শুক্রবার

সকাল ৭টায় রাওয়ালপিন্ডির ফয়েজাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে গোজরানওয়ালা রওয়ানা। ১২.১৫ মিনিটে মাওলানা জাহেদুর রাশেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও জুমায় বয়ান। বাদ আসর শরীয়া একাডেমীর নতুন জায়গা পরিদর্শন। বাদ মাগরিব শরীয়া একাডেমীতে ফিকরী বৈঠক। বাদ এশা জামিয়া কাসিমিয়ায় বয়ান।

২৫.১১.২০০৬ শনিবার

বাদ ফজর গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা নুসরাতুল উলূম পরিদর্শন এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহেব ও অন্যান্য উস্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়। সকাল ১০টায় লাহোর রওয়ানা হয়ে বেলা ১২টায় লাহোরে উপস্থিতি। রাতে বাগবানপুরা মসজিদে অবস্থান।

২৬.১১.২০০৬ রবিবার

সকালে রায়বেন্ড তাবলীগের মারকাযে হাজিরী। তারপর খানকায়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদে হাজিরা। শাহ নফীসুল হুসাইনী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১২টায় বাদশাহী মসজিদ ও ইকবালের মাজার যিয়ারত। জামিয়া আশরাফিয়া পরিদর্শন। বিকালে লাহোর হতে কারাকোরাম এক্সপ্রেসে করাচী রওয়ানা।

২৭.১১.২০০৬ সোমবার

দুপুর ২.৩০ মিনিটে করাচী হাজিরা। রাতে মাওলানা নোমান ভাইয়ের বাসায় অবস্থান।

২৮.১১.২০০৬ মঙ্গলবার
জামিয়াতুর রশীদ, দারুল উলূম করাচী প্রভৃতি পরিদর্শন।

২৯.১১.২০০৬ বুধবার
খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়ায় গমন, বাদ আসর হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দা.বা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

৩০.১১.২০০৬ বৃহস্পতিবার
মদীনাতুল হিকমত ও হামদর্দ ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন। সাপ্তাহিক যরবে মোমেন এবং রোজনামায়ে ইসলাম অফিস পরিদর্শন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান। বায়তুল ইলম ও মাদানী মসজিদ পরিদর্শন।

০১.১২.২০০৬ শুক্রবার
নিউ টাউন মাদরাসায় অবস্থান। বায়তুল মুকাররমে জুমা, বাদ জুমা আব্দুল গফুর সাহেবের বাসায় দুপুরের আহার। বাদ মাগরিব সায়্যিদ সুলায়মান নদভী র. ও মাওলানা শিব্বির আহমাদ উসমানী র. এর মাজার যিয়ারত। মেছালী উস্তাদের লেখক হানীফ আব্দুল মাজীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নোমান ভাইয়ের বাসায় রাত্রিযাপন।

০২.১২.২০০৬ শনিবার
ভোর ৪ টায় এয়ারপোর্ট অভিমুখে রওয়ানা। সকাল ৭টায় ফ্লাইট এবং বেলা ১১টায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।

- সমাপ্ত -

আল ইরফান পাবলিকেশন্সের একগুচ্ছ নতুন উপহার

- **প্রাচীন প্রদীপ**
  মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান
- **লাহোর থেকে বুখারা**
  মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
- **আলোকিত ভাবনা (প্রবন্ধ সংকলন)**
  মাওলানা লিয়াকত আলী
- **ইসলামের আলোকে উত্তম আখলাক**
  মাওলানা ইরশাদ কাসেমী ভাগলপুরী
- **ইসলামী শিষ্টাচার**
  মাওলানা জুবায়ের আব্দুল মজীদ
- **ঈমানী দাবীর গুরুত্ব**
  সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.
- **কলবে সালীম**
  হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার
- **মিফতাহুল কুরআন**
- **ইসলাহে নফসের প্রয়োজনীয়তা**
- **ওলামায়ে কেরামের প্রতি উদাত্ত আহবান**

জামিয়াতুর রশীদের মুখপত্র

দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী

PAKISTAN
AFGHANISTAN
Islamabad
Punjab
Islamic
Republic
Of
IRAN
Baluchistan
INDIA
Hyderabad
ARABIAN
SEA

জামেয়াতুর রশীদ, করাচী, পাকিস্তান

জামেয়াতুর রশীদ, করাচী, পাকিস্তান
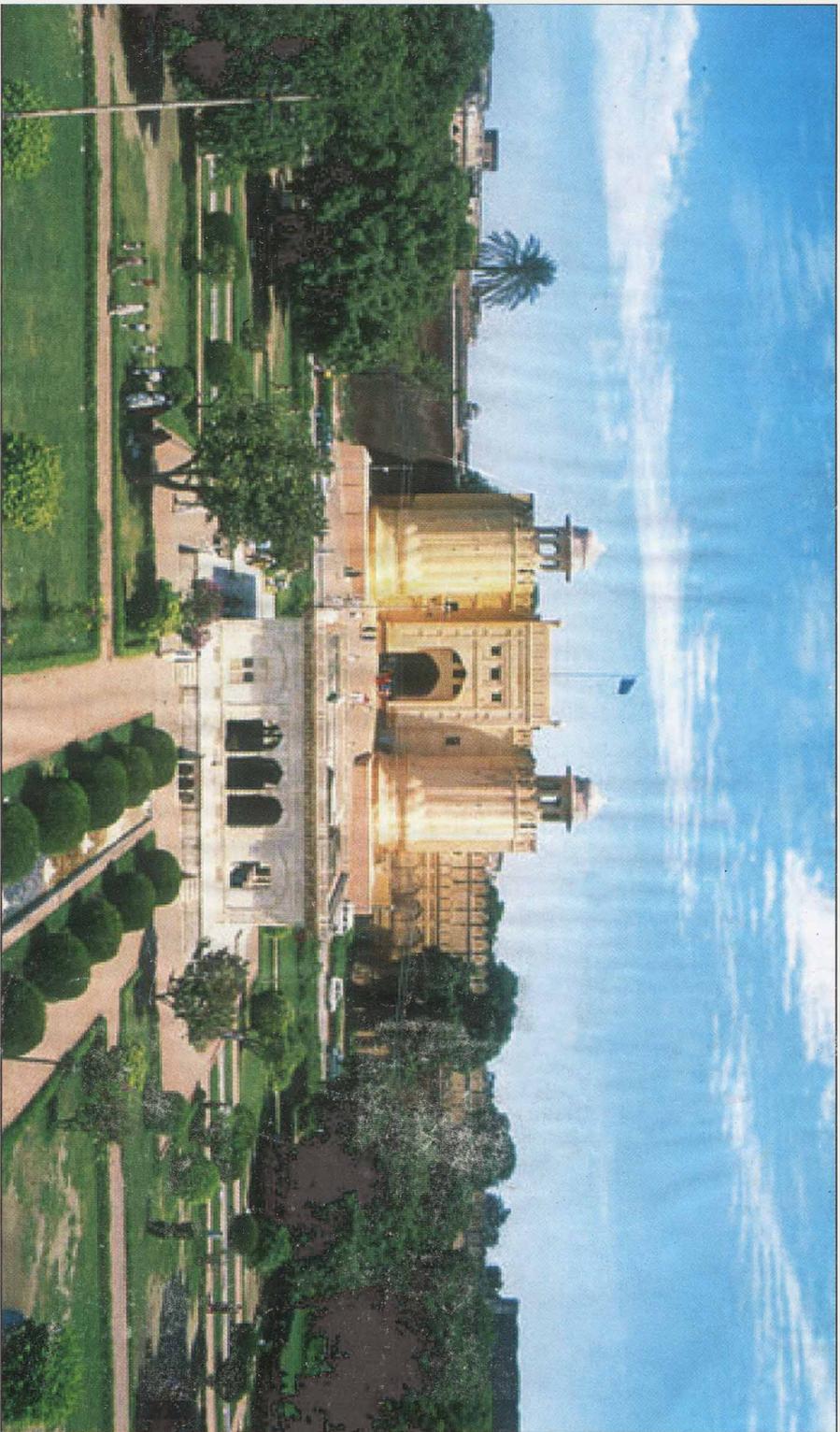
বাদশাহী মসজিদ, লাহোর, পাকিস্তান
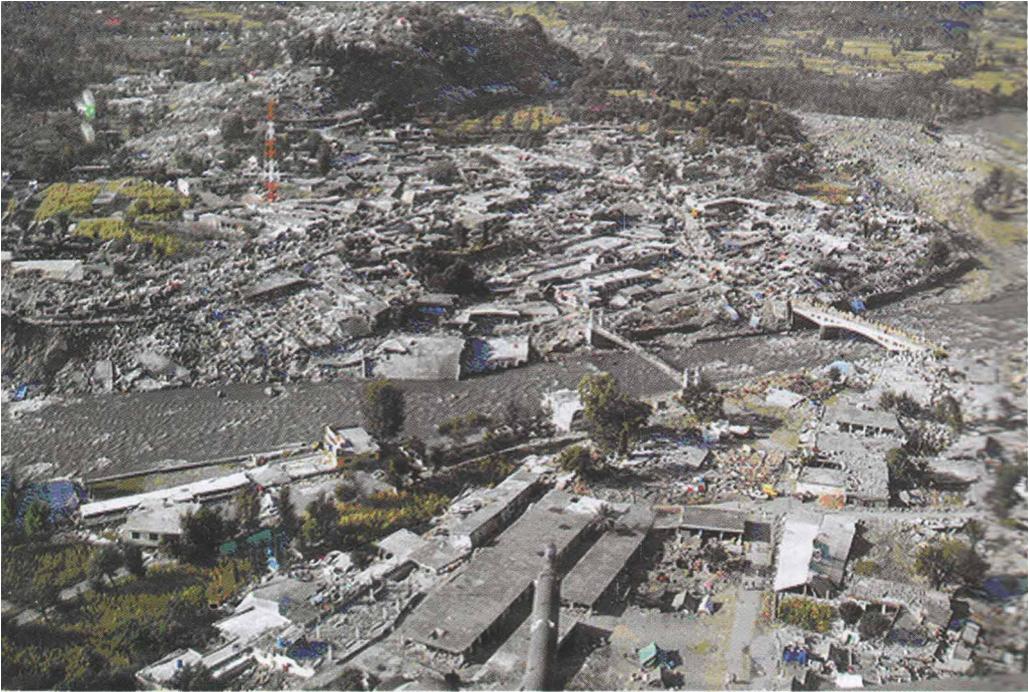
ঐতিহাসিক বালাকোট শহর
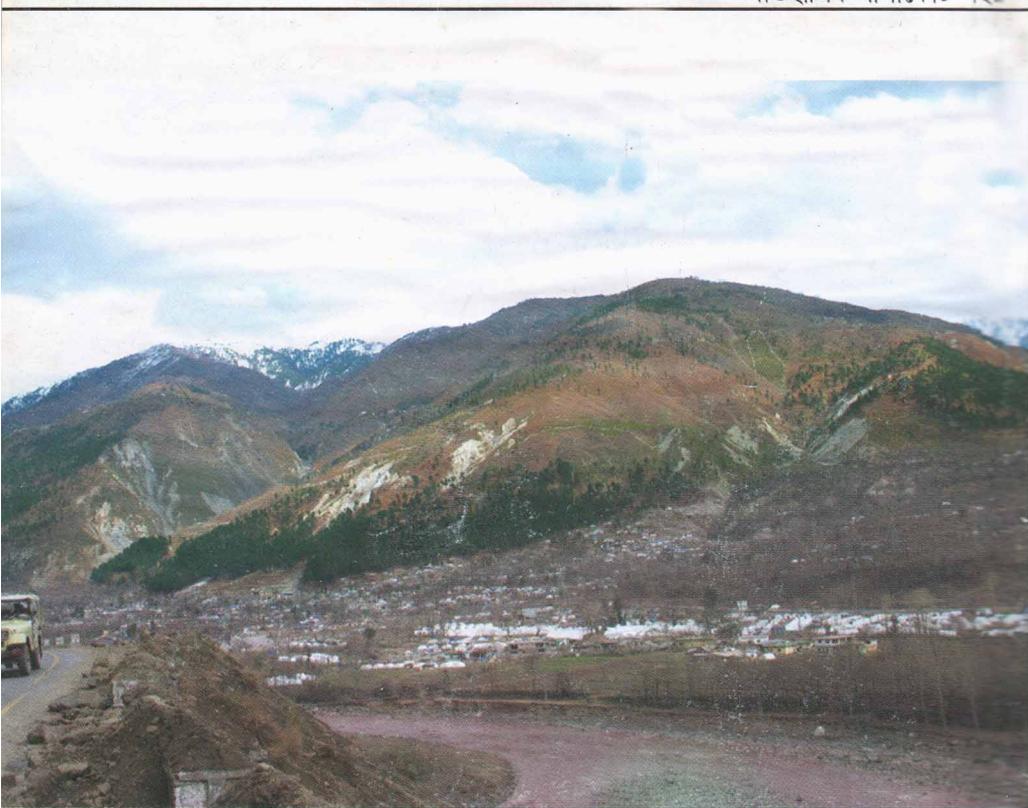
বালাকোটের ঐতিহাসিক পাহাড়

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বিননুরী টাউন

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বিননুরী টাউন

বাদশাহ ফয়সাল মসজিদ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

আল-ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাড়ী-৮৯, মিরপুর, ঢাকা